মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭৩-০৩৪২৩০, ০১৭৫-১৯১৪৭৭

www.amarboi.org

শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
জুন ঃ ২০০০ ইং

৪র্থ প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০৬ ইং
মহররম ঃ ১৪২৭
ফাল্গুন ঃ ১৪১২

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা শহীদুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN— 984-8455-02-7

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা

www.amarboi.org

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির স্বরূপ অন্বেষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের জাতিসমূহের দরবারে একটি বিশেষ জাতির অবস্থান কোথায়, তা চিহ্নিত করা যায় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আলোক সম্পাৎ করে। কারণ শিক্ষা একটি জাতির অবয়ব নির্মাণ করে, সাহিত্যে সে অবয়বের প্রতিফলন ঘটে আর সংস্কৃতি তাকে পূর্ণতা দান করে। এভাবেই একটি জাতির পরিচয় বিধৃত হয় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। তাই যে-কোন জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার সাথে তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য যে, মুসলিম জাতির বেলায়ও কথাটি হুবহু প্রযোজ্য।

দুনিয়ায় সাধারণত বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে এক-একটি জাতির অবয়ব নির্মিত হয়। তাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তাই এসব বৈশিষ্টের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়; এগুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন-চক্র অবর্তিত হয়। ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা উপলব্ধি করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবয়ব ও অভিব্যক্তি দেখেই তাদের জাতিসত্তার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর।

ইসলাম দুনিয়ায় এক মহত্তম আদর্শের উদ্বোধক। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ডের কৃত্রিম ভেদ-রেখার ঊর্ধে এটি এক বিশ্বজনীন চেতনা। এক আল্লাহ্‌র অকৃত্রিম বন্দেগী ও অখন্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি আর এটাই মুসলিম জাতিসত্তার মূল উপাদান। তাই একটি আদর্শবাদী মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ইসলামী চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিতে, তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় ইসলামী ভাবাদর্শের সার-নির্যাস আর তার সংস্কৃতিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ইসলামের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা। একারণে মুসলিম জাতিসত্তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবাদর্শে সমুজ্জ্বল।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম জাতিসত্তার এটাই ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্য আর এ বৈশিষ্টের কারণেই দুনিয়ার জাতিসমূহের দরবারে মুসলিম জাতির অবস্থান ছিল আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর। জ্ঞানচর্চা, জীবন-সাধনা, রাষ্ট্র-শাসন সর্বত্রই মুসলমানদের হাতে ছিল 'আলাদীনের জাদুই চেরাগ'। তাদের নির্মিত নতুন সমাজ ও সভ্যতার স্পর্শে মাত্র চার দশকের মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিরাট অঞ্চলে মানবতার নব-জাগৃতি ঘটেছিল এবং যুগ-যুগান্ত কালের অজ্ঞতার যবনিকা অপসৃত হয়েছিল। কোন বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা অঞ্চলের কারণে নয়, শুধুমাত্র ইসলামের জাদু-স্পর্শেই এই অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হতে পেরেছিল। এমনকি প্রথম তিন দশকের সংক্ষিপ্ত সময়-পরিসরে তৎকালীন দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ এবং রোম ও পারস্যের ন্যায় দু'দুটি পরাশক্তি তাদের পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছিল।

আজ সেই মুসলিম জাতি শুধু নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিই হারায়নি, অমুসলিম জাতিগুলোর কাছে সে করুণার পাত্রেও পরিণত হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে তার আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে বটে; কিন্তু তার আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী বহুলাংশেই লোপ পেয়েছে। কারণ ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে মুসলমানরা আজ বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে খণ্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছে যা তাদের জাতিসত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তারা ইসলামী শিক্ষা-দর্শন পরিহার করে পাশ্চাতের জড়বাদী শিক্ষাদর্শনকে গ্রহণ করেছে; তাদের সাহিত্যে

www.amarboi.org

নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে ভোগবাদী চিন্তা-দর্শনের প্রতিফলন ঘটছে; তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নির্মল সৌন্দর্য-বোধের পরিবর্তে উৎকট নগ্নতা ও অশ্লীলতা ছায়াপাত করছে। এর ফলে আজকের মুসলিম জনগোষ্ঠী নৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ হারিয়ে কার্যত এক বিশৃঙ্খল জনারণ্যে পরিণত হয়েছে।

এই চরম বিপর্যয় থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষার; তার হারানো বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে ফিরিয়ে এনে তাকে নতুনভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার। বলা বাহুল্য যে, এই সুমহান দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র) শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন ষাট, সত্তর ও আশির দশকে। বিগত দিনগুলোতে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে। এক্ষণে সময়ের দাবি অনুধাবন করে আমরা গ্রন্থটিকে তুলে দিচ্ছি বিদগ্ধ পাঠকদের হাতে। গ্রন্থটি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই দুটি স্বতন্ত্র পর্বে রচিত হলেও এর বিষয়-বিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি বিষয়বস্তুর অভিন্নতার কারণে। তবে বর্তমানে প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় এর বিভিন্ন স্থানে কিছু পাদটীকা সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থকার আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে অত্যন্ত বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। সে আলোচনায় যেমন ইসলামের ইতিবাচক দিকটি ফুটে ওঠেছে চমৎকারভাবে তেমনি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির চুলচেরা বিশ্লেষণও স্থান পেয়েছে যথোচিতরূপে। বিশেষত 'আধুনিকতা'র নামে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে মুসলিম জাতিকে একটি মেরুদণ্ডহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করছে এবং তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে, এ সত্যটির বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। গ্রন্থকার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আপন বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন অকাট্য, যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এবং পাঠক-চিত্তকে নাড়া দেয়ার জন্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। সে দিক থেকে বাংলা ভাষায় এটি এক অসামান্য সুখপাঠ্য গ্রন্থ, একথা প্রায় নির্দ্বিধায়ই বলা চলে।

বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বর্তমানে এক নিদারুন বন্ধ্যাত্ব চলছে। এ বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে আজ প্রয়োজন সাহসী লোকদের এক বলিষ্ঠ উদ্যমের—প্রয়োজন ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত একটি গণ-বিস্ফোরণের। কাংক্ষিত সেই গণ-বিস্ফোরণকে সম্ভব করে তোলার লক্ষ্যেই আমরা এই অসামান্য গ্রন্থটি নিয়ে হাজির হয়েছি দেশের সচেতন পাঠকদের কাছে। এদেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের সংগ্রামে নিবেদিত সৈনিকরা এ গ্রন্থ থেকে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হলে আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

বর্তমান মুদ্রণ-ব্যয় দিনদিন হুহু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাপি গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্য উন্নত করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর মূল্যও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকারকে উত্তম প্রতিফল দান করুন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
ঢাকা ঃ ১০ জুন, ২০০০

www.amarboi.org

সূচী

শিক্ষা

শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য ১১
শিক্ষার মূল্যায়ন ১৩
শিক্ষার দর্শন ও লক্ষ্য ১৮
প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সাধারণ ত্রুটি ২৩
আমাদের শিক্ষা সমস্যা ২৯
শিক্ষার মৌল সমস্যা ২৯
জীবন-লক্ষ্যের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ৩০
আমাদের শিক্ষাদর্শন কি হবে ৩১
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস ৩১
পাকিস্তান-উত্তরকালে শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা ৩৩
প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌল সমস্যা ৩৪
শিক্ষার মাধ্যম সমস্যা ৩৫
শিক্ষার পরিবেশ ৩৭
শিক্ষার মূলে নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি ৩৭
শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ৩৮
সহশিক্ষা ৩৯
বড় লোকের শিক্ষা ৪০
মিশনারী শিক্ষার মারাত্মক পরিনাম ৪১
সমস্যার সমাধান ৪২
শিক্ষায় ধর্মের ভূমিকা ৪৫
বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের পর্যালোচনা ৪৬
মানব-মনের মৌল জিজ্ঞাসা ৪৮
মানুষের বৈশিষ্ট্য ৪৯
ধর্মের প্রকৃত রূপ ৫২
বিশ্ব-মুসলিমের বর্তমান অবস্থা ৫৪
কুরআন বিজ্ঞানের মৌল উদ্বোধক ৫৫
মুসলমানদের দায়িত্ব ৫৮
শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোন ৬১
এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা যায় ৬২
ইসলামের শিক্ষা-দর্শন ৬৮
শিক্ষা-দর্শন ও জীবন-দর্শন ৬৮
জীবন-লক্ষ্যের বাস্তবতা ও গুরুত্ব ৬৯
আধুনিক শিক্ষার পরিণতি ৭১
ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষা-দর্শন ৭২

www.amarboi.org

পাশ্চাত্য শিক্ষার সমাজদৃষ্টি ৭৫
ইসলামের জীবন দৃষ্টি ৭৬
জীবন-উদ্দেশ্য ও মানবীয় মহত্ত্ব ৭৯
ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও আত্মা ৭৯
ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকাল ৮০
অখণ্ড মানবতা ও ইসলাম ৮৬
মানবীয় একত্ব ও ব্যাপকতা ৮৭
ইসলামী শিক্ষার বিপ্লবী ভাবধারা ৮৯
আল-কুরআনের শিক্ষা দর্শন ৯৬
কুরআনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ৯৮
ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে কুরআন ৯৯
মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের ঘোষণা ১০১
সামষ্টিক প্রশিক্ষণে কুরআন ১০২
সামাজিক ঐক্য ও একাত্মতা ১০৩
ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা ১০৩
সামাজিক ও সামষ্টিক সহযোগিতা ১০৪
পরামর্শ জীবনের ভিত্তি ১০৪
প্রেম-ভালোবাসা ও সহৃদয়তাই পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ১০৫
ন্যায়পরায়ণতামূলক ধন-বণ্টন ব্যবস্থা ১০৫
চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা ১০৬
সামষ্টিক জবাবদিহি ও দায়িত্ব বহন, পরস্পরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ১০৬
সমাজ সংস্কারের কাজ অব্যাহতভাবে চালাতে হবে ১০৭
আত্মরক্ষার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানও কর্তব্য ১০৭
শত্রুর মুকাবিলায় সদা সতর্ক ও পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত থাকতে হবে ১০৭
নরহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ১০৮
সুখ-স্বচ্ছন্দে ভারসাম্য রক্ষা ১০৮
মদ ও জুয়াখেলা নিষেধ ১০৮
পরিবর্তন ও উন্নয়ন এবং স্থবিরতা প্রতিরোধ ১০৮
চিন্তা-বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা ১০৯
বিশ্বলোক সম্পর্কে কুরআন ১১১
স্রষ্টা সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য ১১৪
আমাদের কাংক্ষিত শিক্ষার স্বরূপ ১১৮
জাতীয় জীবনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা ১২৫
শিক্ষার তাৎপর্য ১২৫
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১২৭
ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বলোক ১২৯
মুসলিম জাতি গঠনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা ১৩০
আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ১৩৪

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষা জাতীয় মুক্তির সোপান ১৩৮
ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিশেষত্ব ১৪৪
ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য তালিক ১৪৭
সামাজিক দায়িত্ববোধ ১৫০
অনুকম্পা ও পরামর্শ গ্রহণ ১৫১
সামাজিক সংহতি ১৫৩
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ক ১৫৪
আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা ১৫৬
মানুষ ও বিশ্বলোক ১৫৮

সাহিত্য

সাহিত্যে আদর্শবাদ ১৬৩
সাহিত্যে প্রগতি ১৭০
সাহিত্যে বাস্তবতা ১৭৪

সংস্কৃতি

সংস্কৃতির গোড়ার কথা ১৮৩
সংস্কৃতির মৌল উপাদান ১৮৭
পরিবার সংস্থা ১৮৯
ধর্ম বিশ্বাস ১৯১
খেলা-খুলা ও আনন্দোৎসব ১৯৩
শিল্প সাধনা ১৯৩
ধর্ম-বোধ ও শিল্প-কলা ১৯৪
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা ১৯৪
সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য ১৯৬
সংস্কৃতির সূচনা ও নানা দৃষ্টিকোণ ২০০
বিশ্বজনীন সংস্কৃতি ২০২
ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা ২০২
মানব জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা ২০৪
সংস্কৃতির পরিবেশ ২০৪
বিকাশমান দুনিয়ার সংস্কৃতি ২০৭
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ২১১
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ২২৯
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা ২৩৬
ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ২৩৬
সংস্কৃতির পাশ্চাত্য মূল্যায়ন ২৩৯
ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ২৩৯
ইসলামী সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি ২৩৯

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য ২৪১
ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ২৪২
মানবতার সম্মান ২৪৪
বিশ্ব-ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা ২৪৫
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ২৪৫
বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ২৪৫
বিশ্ব-মানবের ঐক্য ২৪৬
কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি ২৪৭
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ২৪৭
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের মর্যাদা ২৪৭
ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা ২৫০
সংস্কৃতি ঃ তাৎপর্য ও সংজ্ঞা ২৫০
সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন ২৫৫
সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য ২৫৭
সংস্কৃতি ও ধর্ম ২৫৯
ধর্ম ও শিল্পকলা ২৬৩
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ২৬৪
সংস্কৃতির মূল্যায়ন ২৬৪
সংস্কৃতির মৌল উপাদান ২৬৬
ইসলামী সংস্কৃতি কি? ২৬৮
সংস্কৃতি ও ইসলাম ২৬৯
ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা ২৭০
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ২৭১
চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি ২৮৫
সিনেমা, টেলিভিশন ও নাট্যাভিনয় ২৮৭
ছবি অঙ্কন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ ২৮৯
তাস, দাবাখেলা ও জুয়া ২৯০
নাচ-গান ও বাদ্য-যন্ত্র ২৯০
সুরাপান ২৯৩
সংস্কৃতি ও নৈতিকতা ২৯৫
চরিত্র ও ঈমান ২৯৯
চরিত্র ও আল্লাহ প্রেম ৩০১
আল্লাহর গুণাবলী ও চরিত্র ৩০২
চরিত্র ও ইবাদত ৩০৩
আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব ৩০৪
নৈতিক চরিত্র ও আইন ৩০৪
বিমূর্ত শিল্প ও জাতীয় চরিত্র ৩০৭
ইসলামী দৃষ্টিকোণে আর্ট ৩১০

www.amarboi.org

শিক্ষা

www.amarboi.org

শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য

মানুষের মন নিস্পন্দ বা অনুভূতিহীন দর্পন নয়। দর্পনে ঃ তিমুহূর্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা, অনুভূতি ও প্রকৃতির রঙ-বেরঙের বহিঃপ্রকাশ যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু মানুষের মন সেরূপ নয়। মানব মন কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না। তা প্রতিমুহূর্ত সচেতন ও সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ভাবধারা ও উপাদান-মিশ্রিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের চেতনায় অবস্থাসমূহের এই প্রতিবিম্ব বা প্রকৃতির চিত্র কি স্বতঃই গড়ে ওঠতে থাকে এবং চেতনা নিজ থেকেই কি তাতে যেমন ইচ্ছা রঙ লাগায় কিংবা চেতনা তার এই সুসজ্জিত ও অলংকারিত হওয়ার জন্যে বাইরের প্রেরণার মুখাপেক্ষী? দুনিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, নিছক চেতনার নিজস্বভাবে এ ধরনের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। মানব মন প্রভূত শক্তি ও প্রতিভার উৎস, সন্দেহ নেই। যাচাই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন, বিন্যস্তকরণ ও রূপায়নের বিপুল শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের মনে । তার হৃদয়ানুভূতিকে যতই Objective বলা হোক এবং বিভিন্ন অবস্থা , ঘটনাবলী ও পর্যবেক্ষণ থেকে আহরিত ফল তার পটভূমির প্রতিচ্ছায়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত বলে যতো দাবিই করা হোকনা কেন, সে দাবি নিরর্থক অহমিকা ও অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই না, এটা বলাই বাহুল্য।

কোন জীবন্ত সত্ত্বা মহাশূন্যে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, এ যেমন সত্য, অনুরূপভাবে এ-ও সত্য যে, মানুষের মন আদর্শিক শূন্যতার মধ্যে কাজ করতে পারে না; এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রত্যয় হচ্ছে তার একমাত্র অবলম্বন। তারই সাহায্যে তাকে অগ্রসর হতে হয় জ্ঞানান্বেষণের বিশাল ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। যেসব সুধী নিজেদের চিন্তা-গবেষণায় Objective-এর ওপর গৌরববোধ করেন এবং যাঁরা দাবি করেন যে, তাঁরা অবরোহী চিন্তা-পদ্ধতির (Deductive) আদিম ও প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করে আরোহী চিন্তা-পদ্ধতির (Inductive) আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁদের জ্ঞান-তথ্য ও গবেষণালব্ধ ফলগুলো গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা হলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, তাঁরাও হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দীপ জ্বালিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিশাল ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস করেছেন। এ এমন এক মহাসত্য, দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাবিদরাও তা মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য। এ পর্যায়ে John Gaird লিখিত

www.amarboi.org

"An Introduction to Philosophy of Religion" নামক গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ

চিন্তা-গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের মনের নিভৃত গহনে প্রচ্ছন্ন ধারণাসমূহ থেকেই পথ-নির্দেশ লাভ করতে হয়। কেননা আমরা যা কিছুর সন্ধান করি, তার মূল্য ও গুরুত্ব সে সব ধারণা-বিশ্বাসের নিক্তিতে ওজন করেই অনুমান করা যায় আর সে সব ধারণার ভিত্তিতে রচিত মানদণ্ডেই সে সবের সত্যতা ও যথার্থতা পরীক্ষা ও যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। কোন চিন্তা-গবেষণাই নিজস্ব ধারণা-বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্ক ও নিরপেক্ষ হয়ে পরিচালিত করা কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। নিজের ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেমন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি চিন্তা-গবেষণার ফল গ্রহণ না করাও কারোর সাধ্য নেই।

প্রখ্যাত গ্রন্থকার Bevan তাঁর Symbolism of Belief গ্রন্থে এধরনের মনোভাব প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

আমরা শুধুমাত্র বাস্তবতার মধ্যে জড়িয়ে থাকতে পারিনা। আমরা যখন কোন বাস্তব জীবনের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের কর্ম-ক্ষমতা ও তৎপরতা যাচাই করার জন্যে আমাদের নিজস্ব মৌল ধারণা-বিশ্বাসসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হই। বস্তুত এ এমন একটা সত্য, যার স্বপক্ষে বহু প্রখ্যাত চিন্তাবিদের সমর্থন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ থেকে এ সত্য অতি সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, মূলত অবস্থা ও ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধ অধ্যয়নই হচ্ছে শিক্ষা এবং তাকে কোন ব্যক্তি ও জাতির মৌল চিন্তা-ভাবনা ও মতাদর্শ থেকে কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারেনা। এ কারণেই মৌল বিশ্বাসের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যের দরুন, তাকে স্বীকার করেই বিভিন্ন বিশ্বাস-অনুসারীদের শিক্ষাও বিভিন্ন হতে বাধ্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা হলে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং তার জন্যে বিভিন্ন মৌল বিশ্বাসসম্পন্ন মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অন্যান্য সব রকমের জ্ঞান-শাখাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কেই বলা যেতে পারে, এগুলোর Objectivity সম্পর্কে অনেক দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বিজ্ঞানীদের নিকট সর্ব-সমর্থিত মহাসত্য বলে গৃহীত। কিন্তু সকল প্রকার বিদ্বেষ, হৃদয়াবেগ ও আসক্তির আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করলে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হবে যে, এই মতবাদটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ফসল নয়। এর অনেকগুলো ধারাই ইউরোপীয়দের নিজস্ব অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারপ্রসূত। ধর্মবিমুখ ইউরোপীয়রা একবার যখন নিজেদের

www.amarboi.org

মন-মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এই বিশ্বলোক স্বয়ম্ভু—এর স্রষ্টা বলে কেউ নেই, এ জগত একটি ধরাবাঁধা ও শাশ্বত নিয়মের অধীনে স্বতঃই চলমান ও প্রবহমান, এর কোন পরিচালকও নেই, এই ক্রমবৃদ্ধি, ইচ্ছামূলক গতিশীলতা, অনুভূতি, চেতনা, মন-মানসের উন্মেষ, স্বজ্ঞা (intuition) সব কিছু বস্তুরই উন্নতিলব্ধ বিশেষত্ব, তখন ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ডারউইনী মতবাদ তাদের নিকট হারানো স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তিরূপে বিবেচিত না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কেননা এই মতবাদেই তারা বিশ্বলোক সম্পর্কিত তাদের বিশেষ ধারণা ও দৃষ্টিকোণের বাস্তব ব্যাখ্যা পেয়ে গেছে। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীই এই সত্যকে অকপটে স্বীকার করেছেন। এখানে মাত্র একজন বিজ্ঞানীর অভিমতই উদ্বৃত করা যথেষ্ট হবে।

> Arnold Lunn তাঁর Revolt against Reason গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ঃ ডারউইনবাদ বিজ্ঞান নয়। তা একটি পুরাপুরি ধর্মমত, তাতে যুক্তিসঙ্গত সুসংবদ্ধতার দাবি যতই করা হোক না কেন। আর মানুষের নিজেদের রচিত এই ধর্মমতে যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবাবেগ অধিক প্রবল হয়ে রয়েছে। (পৃষ্ঠা ১৬৭)

শিক্ষার মূল্যায়ন

শিক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা হচ্ছে, তা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন করে। তাই সূক্ষ্ম ও সুকোমল হৃদয়াবেগ পরিমার্জিতকরণের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা অর্জন করতে হবে। কিন্তু অধুনা এই ধারণা নিতান্তই পুরাতন এবং অনেক সেকেলে—আগের বলে বিবেচিত। আধুনিক কালের প্রবণতা হল শিক্ষাকে ব্যবহারোপযোগী বানাতে হবে; ব্যবহারিক মূল্যের দৃষ্টিতে অধিকতর মূল্যবান, এমন শিক্ষা অর্জনই হবে লক্ষ্য। শিক্ষার আলোয় হৃদয়লোককে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তোলা আজ আর লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকেনি। অথচ আজকের দুনিয়ায়ও আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার যা আমাদের মনকে সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্ত করবে, মানসিক রোগের জীবাণু বিনষ্ট করে দেবে এবং মানবতার সকল দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-বঞ্চনা ও লুণ্ঠন বন্ধ করে দেবে; সেই সঙ্গে তা মানবীয় প্রয়োজন পূরণার্থে প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করার, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় খোরাক-পোশাক ও বাসস্থানের ইনসাফপূর্ণ বন্টনের ব্যবস্থা করার, সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-তুফান ও বন্যা-প্লাবনের মাত্রা ক্রমাগত হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-স্ফূর্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করার যোগ্য হবে। এগুলো একান্তই জরুরী। যে শিক্ষার মাধ্যমে এ কাজগুলো সম্ভব তা যে মানবতার পক্ষে খুবই কল্যাণকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু গভীর চিন্তা-বিবেচনা করলে যে কেউই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হবেন যে,

www.amarboi.org

মানব-প্রকৃতি নিহিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি স্বভাবজাত রিপুসমূহের কল্যাণময় ও ভারসাম্যপূর্ণ চরিতার্থতাই লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব করে দেবে। এর কোন একটিকেও নির্মূল করার প্রবণতা কারোর মধ্যেই জাগবে না। কাজেই উচ্চতর শিক্ষার চরম লক্ষ্য যদি শুধু এটুকুই হয়, তাহলে এ শিক্ষা তার আসল তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলবে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানবীয় উন্নতি বিধানে যারা উপস্থিত, তাৎক্ষণিক ও দ্রুত সুফল লাভের উদ্দেশ্যে শ্রম করেছে তাদের তুলনায় যারা জ্ঞানার্জনের জন্যে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করে দিয়েছে তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে—এদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন। কাজেই পূর্বোক্ত ধরনের শিক্ষাই মানুষের কাম্য আর তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞান-উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, মানুষের জ্ঞানগত পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত বেশী লাভ করছে, নিত্য-নতুন কামনা-বাসনা, নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা এবং নানারূপ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার হাহাকার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠছে। অধুনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ধ্বংস ও বিনাশের এমন সব হাতিয়ার উদ্ভাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার দরুন মানবতার অস্তিত্বই কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এটা যে কতবড় মারাত্মক ব্যাপার তা বলে শেষ করা যায় না। পরন্তু একদিকে মানুষ মানবীয় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধানের চেষ্টায় নিয়োজিত, অপরদিকে সে অত্যন্ত তীব্র গতিতে ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। ফলে মানুষ এক স্থায়ী অশান্তি, দুঃখবোধ ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। মানুষ যত তীব্রতা ও আন্তরিকতার সাথে বিশ্ব-প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করেছে, তা আমাদেরকে প্রায় ততটাই ভুলিয়েই দিয়েছে যে, আসলে আমরা কেবল দৈহিক কামনা-বাসনারই অধিকারী নই, "আত্মা" বলতেও একটি জিনিস আমাদের রয়েছে। দেহের জীবন এবং ক্রমবৃদ্ধির জন্যে যেমন খাদ্য অপরিহার্য, মনের পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্যে যেমন প্রয়োজন শিক্ষার, তেমনি আত্মার উন্নতি সাধনের জন্যে দরকার ঈমানের আর ঈমান হচ্ছে কতকগুলো মৌল সত্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয়, যে প্রত্যয় শত প্রতিকূল ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাতেও বিন্দুমাত্র নষ্ট বা দুর্বল হবে না। বস্তুত ঈমান বিনষ্ট হওয়া কঠিনতম দৈহিক রোগ অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক ও বিপজ্জনক। প্রাচীন মানুষের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞগণ একথা মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করেন যে, বহুসংখ্যক প্রাচীন জাতি ও গোত্র কেবলমাত্র এ জন্যেই পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, তারা তাদের নিজস্ব জীবন পদ্ধতির প্রতি ঈমান ও প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিহাসের এ এমন এক শিক্ষা যা কোন সময়ই এবং কারোরই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরূপ ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হওয়া প্রত্যেকটি জাতির জন্যেই

www.amarboi.org

অবাঞ্ছনীয়। আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় সত্তার স্থিতি আমাদের কাম্য হলে মূল মানবীয় মূল্যমান ও মূল্যবোধের ওপর নিজেদের প্রত্যয়কে পুনরুজ্জীবিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে শিক্ষা শুধু আমাদের দৈহিক ও বৈষয়িক জীবন রক্ষা ও উন্নতি বিধানের পথ-প্রদর্শন করে ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহের প্রযুক্তি শিখায়—কেবলমাত্র বুদ্ধি-বৃত্তিক উৎকর্ষই যার একমাত্র অবদান, সে শিক্ষা আমাদের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। তাই জাতীয় শিক্ষাকে আমাদের একান্ত নিজস্ব মানবীয় মূল্যমানের প্রতি ঈমানদার বানাতে হবে। কেননা শুধু ঈমানই আমাদের আত্মাকে সুস্থ, সবল, স্বচ্ছ ও সফল করতে সক্ষম।

বর্তমানে আমরা এক নবতর সামষ্টিক ব্যবস্থার রূপায়নে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সামষ্টিক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কি রূপ পরিগ্রহ করবে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে কোন্ সব মূল্যমান ও মূল্যবোধের চেতনা জাগাতে চাই, তারই ওপর আমাদের বর্তমান সামষ্টিক ব্যবস্থার রূপ-সৌন্দর্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা কি ধরনের মানুষ তৈরী করছি, তারই ওপর শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত জাতীয় লক্ষ্য ও জাতীয় ভবিষ্যত নির্ভর করে। আমাদের সামষ্টিক সংহতি, সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ব্যক্তির পরম সাফল্য ও সার্থকতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য। আমরা চাই সকল প্রকার দুর্নীতি, শোষণ ও চরিত্রহীনতামুক্ত এক আদর্শ সমাজ গড়তে—এমন এক সমাজ গড়তে, যেখানে মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, লুঠতরাজ ইত্যাদি অমানবিক ও অসামাজিক আচার-আচরণ থাকবে না; যেখানে মানুষ তার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত এমন এক পাঠক্রম ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-সূচী রচনা করতে হবে, যা শুধু ভাল ভাল জ্ঞান-তথ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ভরে দেবে না, বরং সেই সঙ্গে আমাদের বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের দেবে বিশ্বলোক, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সুস্থ, সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা-বিশ্বাস, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ, সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, কঠোর শ্রমশীলতা ও সুসংগঠিত বিশ্বস্ততার গুণাবলী। তা এমন সব উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানের নির্ভুল চেতনা জাগিয়ে দেবে, যা শুধু ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ করবেনা, ব্যাপকভাবে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষারও বাস্তব রূপায়নের নিয়ামক হবে। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর সর্বশেষ রাসূলের (স) প্রতি আমাদের যে ঈমান তা-ই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তির ও জাতীয় চেতনার মৌল কেন্দ্র-বিন্দু। এ কথা আজ নতুন করে উপলব্ধি করলেও একে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হবে। এই কেন্দ্রবিন্দুকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি রচিত, তা আল্লাহ-রাসূল তথা ইসলাম-বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং তার দ্বারা আদর্শ ও সুনাগরিকও গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে না।

www.amarboi.org

ব্যক্তির মন-মানস ও মেধার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে শুধু অনুশীলন ও চর্চার নামই শিক্ষা নয়—শিক্ষার উদ্দেশ্যও নয় তা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজ সত্তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ব্যক্তি কোন জনসমষ্টি বা জাতির অংশ হয়েই বাঁচতে পারে। সমাজ ও সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাতীত। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রত্যয় ও আদর্শবাদের দিক দিয়ে তার বংশ-পরিবার ও সমাজ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য; তা নিছক বন্যতা, অসভ্যতা ও পশুত্ব মাত্র। প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সমষ্টির ভিত্তিমূল চূর্ণ বা শিথিল করে যে শিক্ষা, তাকে শিক্ষা না বলে "ডিনামাইট" বলাই যথার্থ। ব্যক্তিকে সমাজ-সমষ্টির একজন উত্তম সদস্যরূপে গড়ে তুলতে হলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই জাতীয় মতাদর্শ তথা ঈমান, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতিবিম্ব রূপে গড়ে তুলতে হবে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শিল্পোন্নত সমাজ ও জাতির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে রচিত। সে শিক্ষায় বৈষয়িক জীবন সত্তার স্থিতি, সুখ-সম্ভোগ ও চাকচিক্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তার মূলে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) লাভের ভাবধারা অত্যন্ত উৎকটভাবে নিহিত। কিন্তু এতদাঞ্চলের চিন্তাবিদগণ তাকে কখনও মনেপ্রাণে গ্রহণ করেননি। ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিসের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণ জেগে ওঠলেও, তার চাকচিক্য চোখকে ঝলসিয়ে দিলেও এবং প্রথম দিকে জনমনে একটা প্রবল মাদকতার সৃষ্টি করলেও এতদ্দেশীয় চিন্তাশীল ও সমাজদরদীদের ভুল ভাঙতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। ইংরেজদের তৈরী শিক্ষাব্যবস্থার মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ হতে অন্তত মুসলমানদের খুব বেশী সময় লাগেনি। এমন কি, কবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমর্থক হয়েও স্পষ্টত অনুভব করেছিলেন যে, এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতদ্দেশীয় পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন। তাই পাশ্চাত্য নিয়ম-নীতির প্রতি দাসসুলভ মনোভাব গ্রহণকে আকণ্ঠ বিষপান তুল্য মনে করতে হবে। শিক্ষা যাদের জন্যে, শিক্ষাকে তাদেরই ঈমান, বিশ্বাস, মন-মানস, মূল্যমান, মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধ এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অতএব শিক্ষা তা-ই গ্রহণযোগ্য, যা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও মূলনীতি সমন্বিত ভাবধারার ভিত্তিতে রচিত।

শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধন। যে ব্যক্তি তার সমাজ-সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন, সে কার্যত অস্তিত্বহীন। ব্যক্তি কেবল তখনই প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে, যখন সে সমাজ-সমষ্টির উদ্দেশ্যাবলীকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করবে এবং নিজের সত্তা দিয়ে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটাবে। এই জন্যে ব্যক্তির মন-মানসকে সামষ্টিক ও সামগ্রিক শিক্ষা- প্রশিক্ষণে সমুদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। যে

www.amarboi.org

সব মতাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষার্থীর মনে ও চরিত্রে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তার মূল্যায়ন করে জানা যেতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থা তার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য লাভ করেছে। বৈষয়িক জীবনে কে কতটা সাফল্য লাভ করেছে কিংবা কে কতটা উচ্চতর চাকুরী লাভ করতে ও কতবেশী অর্থোপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তা কোন শিক্ষা ব্যবস্থারই সফলতা প্রমাণের মানদণ্ড হতে পারে না। কেননা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পশুজগতেই শোভন—মানব জগতে নয়।

www.amarboi.org

শিক্ষার দর্শন ও লক্ষ্য

এ দুনিয়ায় সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্যে মানুষকে নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সে কাজগুলোকে যথাযথরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সঠিক কর্মনীতি, নির্ভুল কর্মপন্থা, প্রক্রিয়া-প্রণালী ও ধরন-ধারণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি লাভ করা মানুষের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। এ সব বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল না হয়ে কোন কাজ হাতে নেয়ার পরিণাম যেমন সময় ও সামর্থের অপচয়, তেমনি কাজেরও ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। মূলত জ্ঞানই মানুষকে এ পর্যায়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। জ্ঞানের আলোকেই মানুষ সমর্থ হতে পারে জীবন সাধনার সব ক'টি স্তর পূর্ণ সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে। পক্ষান্তরে জ্ঞান অনায়ত্ত থাকলে মানুষ নিঃসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে এবং নিরুদ্দেশের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াতে বাধ্য হয়। তাই জ্ঞানই মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে মানুষের জীবন-পথকে আলোকিত করে তোলে। তখন সেই আলোকোজ্জ্বল পথে মনযিলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির পক্ষেই সহজ হয়ে থাকে। বস্তুত এ জ্ঞানের অবর্তমানতাই মানবতার ললাটে লাঞ্ছনার কলঙ্ক টিকা এঁকে দেয় তার কাঁধে, স্থবিরতা, অকর্মন্যতা, অমানবিকতা ও পাশবিকতার লজ্জাকর অপবাদ চেপে বসে এবং তার উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুত দুনিয়ায় সুন্দর ও সার্থক জীবন যাপনের জন্যে অন্তত দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন একান্তই অপরিহার্য। একটি হল ঃ মানুষকে জানতে হবে তার জীবনের লক্ষ্য কি—কর্তব্য ও দায়িত্ব কি? .... কোথায় তাকে যেতে হবে এবং সেজন্যে কি কি কাজ কিভাবে ও কি পন্থায় করতে হবে। আর দ্বিতীয় হল ঃ মানুষকে তার অবস্থান ও মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং আত্মিক ও বৈষয়িক প্রয়োজন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও নিঃসন্দেহ অবগতি অর্জন করতে হবে। মানুষকে তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ যাচাই করে মনযিলের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। দুর্গম ও বন্ধুর জীবন-পথে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে হবে। নিজের যাবতীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং দোষ-ত্রুটি ও বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে ক্রমশ তা দূর করার জন্যে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর এসব দিক দিয়ে সঠিক ফল লাভের জন্যে নির্ভুল জ্ঞান লাভ একান্তই অপরিহার্য। বস্তুত মানুষের চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব যতই নির্দোষ ও নির্মল হোক না কেন—কর্মের প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা যতই প্রবল হোকনা কেন, নির্ভুল জ্ঞানের পথ-নির্দেশ না পেলে তার সব কিছুরই ব্যর্থতা অবধারিত।

www.amarboi.org

শিক্ষা সম্পর্কে নানারূপ চিন্তা-দর্শন তথা মতাদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে শিক্ষার অঙ্গনে। এ পর্যায়ে মৌলিক প্রশ্ন হল ঃ শিক্ষা হবে কোন্ মতাদর্শ-ভিত্তিক? শিক্ষার মূল দর্শন কি হবে?

শিক্ষা-বিজ্ঞানী Sir Percy Nun তাঁর Education, its data and first principles নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ২

> শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ঃ মানুষের স্ব-ব্যক্তিত্বের স্বাধীন লালন ও বিকাশসাধন। শিক্ষা কোন লক্ষ্যের জন্যে হওয়া উচিত নয়। কেননা যত ব্যক্তি, তত লক্ষ্য।

অপর একশ্রেণীর চিন্তাবিদের মত হল, শিক্ষা বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে হতে হবে। কেননা প্রতিটি সমাজই তার জাতীয় ও সামগ্রিক উদ্দেশ্যের উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী ব্যক্তি গঠনের জন্যে সচেষ্ট হয়ে থাকে খুব স্বাভাবিকভাবে। সেজন্যে জাতির সামনে একটা সুস্পষ্ট জাতীয় ও সামগ্রিক লক্ষ্য উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত থাকা আবশ্যক। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলোর সামনেও সুনির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য রয়েছে। এজন্যে সেসব সমাজ নিজ নিজ লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলার উপযোগী ব্যক্তি গঠনের জন্যে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেছে। এসব সমাজের যুবকদেরকে কোন্ বিশেষ ভঙ্গিতে ও পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে, তা তাদের পাঠ্যতালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই সব ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে জাতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষা' গ্রন্থে 'শিক্ষার নেতিবাচক দর্শন' পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

> বর্তমান যুগে শিক্ষার তিনটি পৃথক দর্শন বা মতবাদ রয়েছে। এ তিনওটি মতাদর্শের সমর্থকও রয়েছে সমাজে। এদের প্রথম মতাদর্শীদের ধারণা হল, উন্নতির সুযোগ-সুবিধা লাভ ও সে পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় মতাদর্শীরা বলেন, সমাজের ব্যক্তিদেরকে সংস্কৃতিবান করে তাদের সমগ্র যোগ্যতা-প্রতিভাকে চূড়ান্ত মানে উন্নীত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তৃতীয় মতাদর্শীদের বক্তব্য হল, শিক্ষা পর্যায়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চিন্তাকোণ পরিহার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করা কর্তব্য এবং সমাজের লোকদেরকে কল্যাণকর প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা আবশ্যক।

পরে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এ তিনও প্রকারের দর্শন-অনুরূপ শিক্ষা এখন কোথাও দেয়া হচ্ছে না; বরং যে শিক্ষা বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত, তাতে কম-বেশী এ তিন প্রকারের দৃষ্টিকোণই প্রভাবশীল হয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে যেসব লোক শিক্ষাকে সামাজিক সংগঠন ও ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেছে, তারা ধর্মকে 'রাজনৈতিক' ও 'অরাজনৈতিক' এই দুভাগে ভাগ করে নিয়েছে—যেমন খৃস্টধর্মকে 'অরাজনৈতিক ধর্ম' বলে মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে

www.amarboi.org

কনফুসীয়ন্‌বাদ, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রকে তারা মনে করেছে 'রাজনৈতিক ধর্ম'। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও নাগরিকের মাঝেও পার্থক্য করা হয়েছে। কেননা 'নাগরিক' বললে রাজনৈতিক ব্যক্তি বুঝায় আর 'ব্যক্তি' বললে একান্তই ব্যক্তির চরিত্র, কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্বের গঠন বুঝায়। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাহলে তাকে 'ভালো মানুষ' রূপে গড়ে তোলা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর তাকে যদি 'রাষ্ট্রের একজন 'উত্তম নাগরিক' রূপে তৈরী হতে হয়, তাহলে তাকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে করে সে নাগরিকত্বের অপরিহার্য গুণাবলীতে ভূষিত হতে পারবে। দার্শনিক রাসেল ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে 'ভালো নাগরিক' হিসেবে গড়ে তোলা পসন্দ করেন না। তিনি বলেন, সমস্ত পশ্চিমা জাতি যীশুর ভক্ত; কাজেই সমাজের লোকদেরকে তেমনি ভাবধারায়ই গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এ যুগ অতীত। এখন এ ধরনের মনোভাবের লোক পাওয়া গেলে বৃটেনের পুলিস তাকে সন্দেহ করবে এবং সৈনিক হয়ে ও যুদ্ধে যেতে নারাজ হলে আমেরিকা তাকে নাগরিকত্ব দিতেই অস্বীকার করবে। বস্তুত উপযুক্ত নাগরিকত্ব লাভকে শিক্ষার লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করা এবং কেবলমাত্র ব্যক্তি-চরিত্র উন্নত করে গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা লাভ করা—এর কোনটিই মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দৃষ্টিতে যথার্থ নয়। এর একটি মাত্র দিককে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করা হলে অন্য দিক দিয়ে মানুষ তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হবে এবং মানুষের জন্যে যে সার্বিকতা ও পরিপূর্ণতা আবশ্যক, সেদিক দিয়ে সে ব্যর্থ হবে।

স্যার পার্সী নান বলেছেন, শিক্ষার তিনটি লক্ষ্য হতে পারে ঃ

১. ব্যক্তি চরিত্রের পুনর্গঠন

২. পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ

৩. ভালো দেহে ভালো মন বিনির্মাণ

স্যার পার্সী এ তিনওটির পর্যালোচনা করে বলেছেন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ

লোকেরা যে উদ্দেশে শিক্ষা লাভের জন্যে আসে, সেই উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত কল্যাণকে উৎকর্ষ দান।

শিক্ষা একটা সামাজিক কর্মপদ্ধতি, যার সাহায্যে একটি সামাজিক ইউনিট স্বীয় অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও বিকাশমানতাকে স্থিতিশীল করতে পারে।

শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ হচ্ছে তা, যা জাতিত্ববাদ ও কর্মবাদের পরিবর্তে মূল্যমানের আদর্শিক দর্শন থেকে দানা বেঁধে ওঠে। সততা, সত্যবাদিতা, সৌন্দর্য ও সদাচারকে আধ্যাত্মিক জগতের শৃংখলা বিধানের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় শামিল করে দেয়া হয়েছে। মানুষ তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারে তখন, যদি সে এ নিরেট তত্ত্বসমূহের সন্ধান করে ও তা আয়ত্ত করে নেয়।

www.amarboi.org

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত মনে হয়, সত্যিকারভাবে শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তা দুনিয়ার শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা এখনো নির্ভুলভাবে স্থির করতে পারেন নি। উপরন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের মাঝে প্রবল মতবিরোধও রয়েছে এবং এ কারণে মূল শিক্ষার ব্যাপারটিই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক যুগে শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণই অধিক প্রভাবশালী। এ কারণে বর্তমানে শিক্ষার নিজস্ব কোন তাৎপর্য নেই—নেই কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে শিক্ষা নিছক রাজনৈতিক মতাদর্শের বাহন মাত্র। কিন্তু ইসলামের শিক্ষাদর্শন এ থেকে ভিন্নতর এবং একেবারেই আলাদা।

ইসলামী শিক্ষাদর্শনের প্রধান বিষয় হল মানুষের ব্যক্তি-সত্তার উন্নয়ন। অতএব মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-সচেতনতা, আত্মানুভূতি এবং দায়িত্ব ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলাই হবে তার জন্যে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি তার স্ব-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হয়ে, স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ-গরিমায় পূর্ণত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সমষ্টির জন্যেও এক অনন্য 'শক্তি' হয়ে দেখা দেবে, সামাজিক জীবনধারা ও জীবনমানকে উন্নত ও বিকশিত করে তুলবে—ব্যক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মূলে এই লক্ষ্যই হবে প্রবল।

ইসলামী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার দুটি দিক অবিচ্ছিন্ন

১. একদিক দিয়ে তা শুধু ব্যক্তির সংশোধন ও সংগঠন।

২. কিন্তু অপর দিক দিয়ে তা-ই সামাজিক সংশোধন, সামাজিক পুনর্গঠন ও সার্বিক কল্যাণ বিধান।

ইসলামী শিক্ষাদর্শন অনুসারে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল আল্লাহ্র প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাকে জাগ্রত ও তেজস্বী করে তোলা। এ পর্যায়ে রাসেলের কথাটি যথার্থ। তিনি বলেছেন ঃ ইসলাম শুরু থেকেই একটি 'রাজনৈতিক ধর্মমত'। আমরা বলবো ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন—জীবন বিধান। জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের ওপর তার প্রভাব অপরিহার্য। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং তার সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনক্ষেত্র—এ দু'য়েরই যুগপৎ সংশোধন ও পুনর্গঠনের দাবিদার হচ্ছে এই দ্বীন। এ দ্বীন মানুষের সামনে এক সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে। উদ্দেশ্যহীন জীবন দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য—পশুতুল্য। এ কারণে জীবন-লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূরক নয় যে শিক্ষা, ইসলাম তার প্রবর্তনের বিরোধী শুধু নয়, তা বরদাশত করতেও প্রস্তুত নয়। কুরআন মজীদ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এ ভাষায় ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ –

www.amarboi.org

আল্লাহ জ্বিন্ ও মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই দাসত্ব ও আনুগত্য করবে। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা—একান্তভাবে তাঁর দাস ও আদেশানুগামী হয়ে জীবন যাপন করাই হল ব্যক্তি-মানুষ ও সামাজিক মানুষের চরম লক্ষ্য।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে জনসমাজকে সম্বোধন করে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

তোমরা অতি উত্তম লোকসমষ্টি। মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা ন্যায়ের আদেশ দেবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

অর্থাৎ মানবতার কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধই হল ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টিগত মানুষের জীবন-লক্ষ্য।

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্তির রাজনৈতিক মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ –

এই লোকেরা এমন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে আর ন্যায়ের আদেশ দেবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। (সূরা হজ্ব ঃ ৪১)

এ ক'টি আয়াত থেকে ইসলামী শিক্ষাদর্শনের এক উজ্জ্বল দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্ব একই সাথে জানা যাচ্ছে এ আয়াত ক'টি থেকে। আর তা হল, মানুষ যেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক দিয়েই গোটা মানবতা ও বিশ্বলোকের পক্ষে কল্যাণের নিমিত্ত ও বাহন হয়ে গড়ে উঠতে পারে। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা। বস্তুত যে শিক্ষা বা যে বিদ্যার কোন প্রতিফলন হয় না ব্যক্তির চরিত্রে, কর্মে এবং যা মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্বোধক হয় না, তা ইসলামের দৃষ্টিতে 'শিক্ষা' নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। নবী করীম (স) এ ধরনের শিক্ষা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চেয়েছেন। বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَيَنْفَعُ (مشكواة -٢١٦)

হে আল্লাহ! যে জ্ঞান ও বিদ্যা কোন কল্যাণ দেয় না, আমি তোমার নিকট তা থেকে পানাহ্ চাই।

ইসলামী শিক্ষাদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা এক উন্নত জীবন-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থীর সামনে প্রতিভাত করে তোলে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত শিক্ষার সর্ব পর্যায়ে ও সর্ব স্তরে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে থাকে। ইসলাম এমন ব্যক্তিদের সন্ধান করে, যারা ব্যক্তিগতভাবে এ বিরাট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগতভাবে তারা হবে উন্নত গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ, আদর্শবাদী মানুষ, জনদরদী ও সার্বিক কল্যাণকামী মানুষ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক। কেননা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই জন্যে ক্ষতিকর এবং মারাত্মক। আল্লামা ইকবাল বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা ও অকল্যাণকারিতাকে সুস্পষ্ট করে তুলবার জন্যে বলেছেন :

اور یہ اهل کلیسا کا نظلم تعلیم
ایك سازش هے فقظ دین ومروت کے خلاف

গীর্জার কর্তাদের প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বীন ও মনুষত্বের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র বই আর কিছু নয়।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সাধারণ ত্রুটি

শিক্ষা অর্থ জানা, বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা। অজানাকে জানা, অবোধ্যকে বুঝা আর অশেখাকে শেখা। বস্তুত শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে। শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষা মানুষের জন্যে অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কথা হল : আমাদের জানতে হবে নিজেকে, জানতে হবে গোটা ভূমণ্ডলকে এবং জানতে হবে মহাকাশকে। বুঝতে হবে বহির্বিশ্বকে, জানতে হবে সৃষ্টির রহস্যকে। সৃষ্টির অন্তরালে যদি কোন মহাসত্য লুকিয়ে থেকে থাকে, তবে তাকেও বুঝতে হবে। এভাবেই শিক্ষার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

সব মানুষেরই মনের কোণে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন এসে উঁকি মারে—সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে। এ সব প্রশ্নকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। মানুষ স্বভাবতই ভাবে—আমি কে? আমার পরিচয় কি? আমি এখানে কেমন করে এলাম? মানুষ আরো চিন্তা করে—আমার কি কর্তব্য? কি-ইবা করণীয়

www.amarboi.org

আছে? আর এখানে থাকব কদ্দিন? চিরকালের জন্যে, না ক্ষণিকের জন্যে? তারপর এখান থেকে কোথায় যাব? সে যাওয়া কি শেষ যাওয়া—চূড়ান্তভাবে বিলীন হওয়া, না তারপরও কোন জীবন আছে—আছে সুখ বা দুঃখের প্রশ্ন?

এসব মৌল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব আমাকে জানতে হবে। এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আমাকে বের করতে হবেই। তবেই হবে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শিক্ষা। এ প্রশ্নগুলোকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই আমাদের হতে পারে না সঠিক শিক্ষা—পূর্ণ শিক্ষা। এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া হয় যে শিক্ষায়, তাকে আর যা-ই হোক শিক্ষা বলা যায় না। তাকে বড় জোর কারিগরি প্রশিক্ষণ বলা যেতে পারে। তাই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা দৃষ্ট হচ্ছে। একটা বিরাট ফাঁক দেখা যাচ্ছে শিক্ষার সর্বস্তরে, এ জন্যেই শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষাই প্রবল হয়ে উঠছে আমাদের জীবনে।

একটা নিরুদ্দেশের পানে ছুটে চলছি আমরা। আমাদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু এ-ই যেন শেষ। সমস্ত জীবের—বরং সমস্ত বস্তুরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। কিন্তু মানুষের জীবন-চক্রের কি শুধু এই পরিণতি? তবে মানুষ ও অন্য জীবে পার্থক্য কোথায়? মানুষ ও ইতর জীবের পরিণতি যদি একই হয়ে থাকে, তবে এ দুয়ের এ সুস্পষ্ট পার্থক্যের ফল দাঁড়াবে কোথায়?

মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বড় করে দেখে পাশ্চাত্যদর্শন আমাদেরকে শিক্ষা দিল—মানুষ জন্তু-জানোয়ারের একটি পরিবর্তিত স্তর বৈ আর কিছু নয়। সমগ্র জীব-জগতে বেঁচে থাকার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। যার শক্তি আছে সে-ই টিকে থাকবে, অর্থাৎ যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন! সবল দুর্বলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, এটাই নাকি নিয়তি। তাই ভোগের সংসারে বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার জন্য যত ইচ্ছা ভোগবিলাস করে যাও।

পক্ষান্তরে আরেকটি দল মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মবাদের দিকে চরমভাবে ঝুঁকে পড়েছে। তারা মানুষের দেহের দাবির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। তারা বলে, সংসার ঝামেলার স্থান; কাজেই এখান থেকে পালাও।

এ দুটি প্রান্তিক দলের কেউই আসল মানুষের সন্ধান পায়নি। মানুষ তো শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টির নাম নয়। আবার আত্মাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। দেহ হচ্ছে আত্মার বাহন আর আত্মা দেহের সহিস। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহটি দান করেছেন এ সৃষ্টিকে উপভোগ করার জন্যে। দেহের তাগিদেই সৃষ্টিকে তন্নতন্ন করে নানা রহস্য উদঘাটন করতে পারবে মানুষ। আবার দেহের পবিত্রতার জন্য আত্মাকেও সে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখবে।

ইসলামী শিক্ষাদর্শন মানব মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। শুধু উত্তরের জন্যেই উত্তর দেয়া হয়নি; সত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত

www.amarboi.org

করেছে। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনকে অতি সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করে সামঞ্জস্য বিধানের একটা সুষ্ঠু ও সঠিক চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলাম বলে, এ সৃষ্টিলোক কোন আকস্মিক বস্তু নয়, বরং সুপরিকল্পিত। এর পেছনে একজন শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এটির অস্তিত্ব দান করেছেন। সৃষ্টির সেরা মানবগোষ্ঠি। মানুষের উপকারের জন্যে এ সারা বিশ্ব। সৃষ্টিরাজিকে ব্যবহার করতে হবে—কাজে লাগাতে হবে। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ সৃষ্টিকে বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে ব্যবহার করতে পারে।

মানুষ তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে কিংবা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এ সৃষ্টিলোক নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কিংবা কারিগরি শিল্পের উন্নতি বিধান করতে পারে।

ইসলাম বলছে ঃ ইহকালই শেষ নয়, বরং অনন্ত জীবনের সূচনা মাত্র। পরকাল সত্য ও অনিবার্য। পরকালের পাথেয় ও সম্বল এ জগত থেকেই আহরণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে এখানে যে যত কাজ করবে সে তত বেশী লাভবান হবে পরকালে।

জীবন-দর্শন ও জীবন-লক্ষ্যকে নানাভাগে বিভক্ত করা চলবে না। একই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে একই জীবন-লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহকে রাজী করার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানকে ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে বাস্তবায়িত করে যেতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ একটি নৈতিক জীব। নৈতিকতাই তার বৈশিষ্ট্য। তাই তার জ্ঞানের বিকাশের সাথে থাকবে নীতিবন্ধন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অনেক বিষয়েই জ্ঞান আহরণ করতে হবে—জানতে হবে অনেক কিছু। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কোথাও নৈতিকতাকে হারালে বা ভুলে গেলে চলবেনা।

সমাজে শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে তাকে রাজনীতি চর্চা করতে হবে। তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে তাকে অর্থনীতির চর্চা করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনে অসংখ্য শাস্ত্র তার অধ্যয়ণ ও অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু সব কিছু আলোচনা ও চর্চা হতে হবে ঐ একই জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার প্রথম শ্রেণী হতে শেষ পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো এবং শেখানো হয়, তার প্রায় সবটুকুই ইসলাম-বিমুখ অনুর্বর মস্তিষ্কের ফসল। তাতে ইসলামের জীবন দর্শন আদৌ প্রতিফলিত হয়না। সত্য বলতে কি, তাতে প্রতিটি ছাত্রের মন-মগজ অনৈসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকে।

বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করা যাক। অ-তে অজগর, আ-তে আনারস ইত্যাদি। অজগর একটি হিংস্র বিষধর জন্তু। এতে করে সরলমতি কচি শিশুর মনে নিশ্চয়ই কোন

www.amarboi.org

মহৎ ভাবের উন্মেষ ঘটবেনা; বরং তার মনে হিংস্র মনোভাবের উন্মেষ ঘটবে। আনারস লোভনীয় খাদ্য-বস্তু। লোভ-লালসার পাশব বৃত্তি জাগিয়ে তোলাই হবে শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে যদি অ-তে অযু এবং আ-তে আল্লাহ পড়ানো হত, তাহলে শিশুর মনে এক পবিত্রতার ছাপ দেয়া সম্ভব হত। আর ইসলাম এ ধরনের পূত-পবিত্র মনোবৃত্তি সৃষ্টিরই প্রয়াস পায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

"লেখা পড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই"—এ শিক্ষা মানুষকে বিলাস-ব্যসনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুধে পানি মেশানো অংকের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে ভেজাল ও ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা শিক্ষা দেয়া হয়না নাকি![১] সুদকষা অংকের মাধ্যমে সুদকে একটি লাভজনক ও হালাল বস্তু হিসেবে পেশ করা হয়না নাকি?[২] দুধে পানি মেশানোর ঐ অংক এবং সুদকষা অংককে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করলে ঐ দুটি অংকের ভাষা ও ভাবকে এমনিভাবে প্রকাশ করা যায়, যাতে করে ঐ দুটি কাজকে দুর্নীতি হিসেবে ছেলেদের মনে জাগিয়ে দেয়া সম্ভব। যেমন ধরুন, গোয়ালা দুধের সাথে পানি মিশিয়ে যে অন্যায় করল তাতে সে ক্রেতাকে কতখানি ঠকালো? মহাজন সুদী কারবারে যে লাভবান হয় তাতে সে কিভাবে অন্যায় শোষণ করে—এমনি ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে অংকগুলো সাজানো যেতে পারে। আর একেই বলে সাধারণ শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়।

প্রতিটি বিষয় আলোচনা কালে যদি নৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকে, যদি সেগুলো নৈতিকতার রসে সিঞ্চিত না হয়, তবে শুধু আলাদাভাবে দ্বীনিয়াত বা ইসলামিয়াতের লেজুড় জুড়ে দিলেই সাধারণ শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হয়ে যায় না; তা বরং কাকের পুচ্ছে ময়ূরের পালক জুড়ে দেয়ার মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের সংমিশ্রণে হিতে বিপরীত ফলই হয়ে থাকে। এর ফলে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পায়না; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে দেখানো হয় এ বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের কোন প্রয়োজন নেই। এগুলোকে বাদ দিয়েও আমরা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীকে এ কথাই শিখিয়ে দেয়া হয় ঃ আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতের কোন অস্তিত্ব নেই আর থাকলেও তাদের কোন প্রভাব মানব জীবনে নেই। মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকারী। আল্লাহকে যদি একান্তই মানতে হয়, তবে তাকে আকাশ-রাজ্যেই স্থান দাও, জমিনে তাঁর কোন প্রভুত্ব নেই।

---

১. সাধারণত ক্লাসে অংক দেয়া হয় ঃ এক গোয়ালা ১ সের দুধে আধাসের পানি মিশিয়ে বিক্রি করলে সে অতিরিক্ত কত লাভ করল? এর প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

২. অংক করানো হয়; শতকরা ৬ টাকা সুদ হারে লগ্নি করা হলে হাজার টাকায় কত সুদ হবে? এখানে সে দিকেরই ইংগিত।

www.amarboi.org

ঐ একই শিক্ষার্থী যখন ইসলামের সবক নেয় তখন সে জানতে পায়, এ আকাশ-পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র আইনে চলছে আর মানুষকেও তাই সেই আল্লাহ্‌র কানুনেই চলতে হবে।

সাতটি পিরিয়ডের ছয়টি পিরিয়ডেই সে যে বাস্তব শিক্ষা পেল তা আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রভাবমুক্ত। আর মাত্র একটি পিরিয়ডে সে শিখে খোদাকে উপাস্য ও প্রভু হিসেবে জীবনে মেনে চলতে হবে। তাই পরস্পর-বিরোধী এ দুটি দর্শনের সংঘর্ষে থিওরী পর্যায়ের নামমাত্র ইসলামী শিক্ষারই হার মানতে হয়। বর্তমানে ধর্ম শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার যে গালভরা বুলি শুনতে পাওয়া যায় তা এমনিভাবেই অর্থহীন— শুধু অর্থহীনই নয়, মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় শিক্ষার্থীর জীবনে।

দীর্ঘ ষোলটি বছর ধরে একজন শিক্ষার্থী দেখা ও শেখার মাধ্যমে বুঝে নিল যে, ব্যাংক ব্যতীত দুনিয়া চলেনা আর সুদ ব্যতীত ব্যাংকও চলে না। অতএব সুদ ব্যতীত দুনিয়া অচল। প্রচলিত অর্থনীতি এ ধরনের চিন্তাধারারই সৃষ্টি করে। এই শিক্ষার্থীকে যখন ইসলামিয়াতে শিখান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন, তখন সে দিশেহারা হয়ে যায়। সে ভাবে, আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ ঠিক হয়নি (নাউযুবিল্লাহ)। আর যদি ঠিকও হয়ে থাকে তবে এ যুগের জন্যে নয়। হয়তো চৌদ্দশ বছর পূর্বের যামানায় এটা কার্যকর হয়ে থাকবে। এখন এ আদেশ অচল।

আপনি দেখতে পেলেন, প্রচলিত লেজুড়-সর্বস্ব ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীর মন-মগজে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঐ শিক্ষার্থীকে যদি ইসলামের অর্থনীতি পড়িয়ে দেয়া হতো—যদি বুঝিয়ে দেয়া হতো সুদকে বাদ দিয়েও অর্থনৈতিক লেনদেন সম্ভব আর সে লেনদেন বর্তমান পদ্ধতি হতে বহুতর উন্নত ফল দান করবে, তাহলে সে বেঈমানের ন্যায় ঐরূপ উদ্ভট কথা বলতে পারতনা কিছুতেই।

আমাদের দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা যদিও একদিক দিয়ে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তবুও বড়ই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ শিক্ষা জাতির পথ-নির্দেশ করতে সক্ষম হচ্ছেনা; জীবন পরিক্রমাকে পারছেনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এ শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামকে অত্যন্ত পঙ্গু ও খোঁড়া হিসেবে পেশ করছে। ইসলাম যে সামগ্রিক জীবন-বিধান এবং যুগ-সমস্যার একমাত্র সমাধান—এ কথা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে—মাদ্রাসা হতে পাশ করে যারা বেরুচ্ছে, তারা জাতির নেতৃত্বদানে অক্ষমতা প্রদর্শন করছে। তাই আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পরিচয় পাচ্ছি না তাদের মধ্যে—না তাদের জ্ঞানে, না তাদের কর্মজীবনে।

তাই আমাদের শিক্ষা-সমস্যার একমাত্র সমাধান হল এই যে, প্রচলিত দুটি শিক্ষাব্যবস্থাকে একত্রিত করে এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যেখানে

www.amarboi.org

একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের শিক্ষার্থীরা চলতি দুনিয়ার সর্বস্তরে নিজেদের আসন গেড়ে বসতে পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শ যে ইসলাম, শিক্ষা সংস্কারের নামে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ইংরেজ আমাদের দেশে কতকগুলো কেরাণী তৈরী করতে চেয়েছিল। তারা আরো চেয়েছিল—এ দেশের লোকেরা বংশ পরিচয়ে মুসলমান থাকে থাকুক; কিন্তু মন-মানসে ও চিন্তাধারায় তারা যেন অমুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেছিল, তাতে তারা সফল হয়েছিল।

তারা এখন নেই সত্য; কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা আজো বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে। আমরা রাজনৈতিক গোলামী হতে মুক্ত; কিন্তু মানসিক গোলামী হতে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমরা আজও ইংরেজের চোখ দিয়ে জগত ও জীবনকে দেখছি। ইংরেজের মগজ দিয়ে এগুলোকে বুঝতে ও জীবনের আচরণ স্থির করতে চেষ্টা করছি। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!

এ পর্যায়ে শেষ কথা হল ঃ আমরা যারা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে পারছিনা, তাদের জন্যে একমাত্র উপায় হল এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে তাকে কার্যকর করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেলে আমাদের এই বাস-ভূমিতে সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা মোটেই অসম্ভব হবে বলে মনে করিনা।

www.amarboi.org

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

সাধারণ মানবিক দৃষ্টিতে এবং বিশেষভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রতিভার স্ফুরণ, ক্রমবিকাশ দান এবং সূক্ষ্ম মানবীয় ভাবধারা—আবেগ উচ্ছ্বাসের—সুষ্ঠুতা ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের একমাত্র উপায় শিক্ষা। মানুষ তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও স্বভাবগত শক্তি-প্রতিভার দিক দিয়ে নিতান্ত পাশবতার পর্যায়ে অবস্থিত। তাকে মনুষ্যত্ব ও মানবতার উন্নত মর্যাদায় তুলে আনতে হলে শিক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় তার করায়ত্ত নয়। মানুষ যতক্ষণ জানতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে না পারবে যে সে মানুষ—মানুষ হিসেবে তার মাঝে অমুক অমুক মানবীয় গুণের সমাবেশ ঘটা আবশ্যক এবং তাকে অমুক অমুক দায়িত্ব পালন করতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকারভাবে মানুষের মতো জীবন যাপন করতে পারবেনা—পারবেনা মানুষের মতো আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র গ্রহণ করতে। তাই মানব সভ্যতার শুরু থেকেই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, শিক্ষাকে মানুষের জন্যে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে এবং এর অপরিহার্যতা সম্পর্কে মানব সমাজ চিরকালই ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে। বস্তুত শিক্ষা দুনিয়ার মানব সমাজের জন্যে একটি মৌলিক ব্যাপার। শিক্ষা সমস্যা তাই দুনিয়ার সকল জাতির পক্ষেই সর্বাধিক জটিল সমস্যা। এ সমস্যার আশু সমাধান হওয়া প্রতিটি জাতির জন্যেই একান্ত জরুরী। কেননা এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় জীবনের অন্য কোন সমস্যারই একবিন্দু সমাধান লাভ করা সম্ভব নয়। তবে আমার দৃষ্টিতে শিক্ষার সাধারণ ও মৌল সমস্যাই সর্বপ্রথম বিবেচ্য।

শিক্ষার মৌল সমস্যা

শিক্ষার সাধারণ ও মৌল সমস্যা হল শিক্ষাদর্শনের সমস্যা। কেননা মূলগতভাবে শিক্ষা ও জীবন পরস্পর-বিজড়িত—অবিচ্ছিন্ন। কোন জনসমষ্টির শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি সেই জনসমষ্টিরই জীবন-দর্শন ও জীবন পদ্ধতিরই নামান্তর। অন্য কথায়, জীবন-দর্শন ও শিক্ষাদর্শন মৌলিকভাবেই এক। শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে দুনিয়ার চিন্তাবিদদের মাঝে যে মতবিরোধ, তা আসলে জীবন-দর্শন পর্যায়ের মতবিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক জাতিই তার বংশধরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেই পন্থা ও পদ্ধতিতেই দিয়ে থাকে, যা তার জীবন-লক্ষ্য অর্জনে এবং তার পূর্ণতা বিধানে পুরোপুরি কার্যকর; যে পথে চললে শিক্ষার্থীর জীবনকে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ থেকে

www.amarboi.org

সাফল্যমণ্ডিত বলা যাবে। যে জাতির জীবন-উদ্দেশই হচ্ছে নিছক বস্তুগত, ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর, তার চলমান জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ ও উন্নতি বিধান, তার শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী, বই-পুস্তক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তার গোটা পরিবেশই হবে ক্ষয়িষ্ণু ও সীমাবদ্ধ জীবন-দৃষ্টির তৃপ্তি বিধানকারী।

পক্ষান্তরে কোন জাতির দৃষ্টিতে এ ক্ষয়িষ্ণু জীবন যদি শুধু একটি 'চলার পথ'—একটা 'অসীলা' মাত্র হয় আর চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনের সাফল্যই যদি হয় মনযিলে মক্‌সুদ, তাহলে তার গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি সামান্য অনুষ্ঠানই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে যে, এর মূলে রয়েছে পরকালের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং পরকালীন কল্যাণ লাভই এর চরমতম লক্ষ্য। অনুরূপভাবে কোন জাতির লক্ষ্য যদি নিছক দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশদান হয়, তাহলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাও হবে তারই প্রতীক। বস্তুত জাতীয়তাবাদী, স্বাদেশিকতাবাদী, বস্তুবাদী কিংবা বৈরাগ্যবাদী নির্বিশেষে সকল সমাজ ও জাতি সত্তাই নিজস্ব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় তাদের নিজস্ব জীবন-দর্শন, জীবন-লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণ। সেই সঙ্গে তাদের জীবন-দর্শনের ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুল এবং পূর্ণ-অপূর্ণ হওয়া সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্য বিষয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি দেখেই। এক কথায়, মানুষের স্বভাব-চরিত্র, জীবন-ধারা এবং তার ইচ্ছামূলক কার্যাদির পথ নির্ধারিত হয় তার জীবন-লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই।

জীবন-লক্ষ্যের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

শিক্ষা হল আসলে জীবন-গঠনের প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। মতভেদ দেখা দিয়েছে শুধু জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে। মানব জীবনের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি স্থায়ী ও দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপার; মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লালন-পালন এবং চিন্তা-বিশ্বাসের ক্রমবিকাশ লাভ একে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরে এই ইচ্ছা-বাসনা, অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও আবেগ-উচ্ছাস থেকেই বাস্তব চরিত্রের নির্ঝর উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতে একথা বলায় কোন ভুল নেই যে, এই মানসিক ভাবধারাই হচ্ছে মানুষের সব চিন্তা-বিশ্বাস ও আবেগ-উচ্ছাসের মূল উৎস; তার যাবতীয় কাজকর্ম, তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা পরিচালিত হয় এ জিনিসকে কেন্দ্র করেই।

মানুষের বাহ্যিক নৈতিকতায় তার অন্তর্নিহিত ধারণা ও বিশ্বাসগত ভাবধারার অমোঘ প্রভাব এবং সেসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদরাও স্বীকার করেন। কেননা এ জিনিসই মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতার নিয়ামক। মানুষের গোটা মানসিক ও শারীরিক শক্তিই একান্তভাবে এ জিনিসের পরিপূরণ ও বাস্তবায়নে

www.amarboi.org

নিয়োজিত হয়; মানুষ এজন্যে নিজের প্রাণ ও জীবন পর্যন্ত কুরবান করতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়ার সব দৃঢ়তম সংগঠন ও সংস্থার পিছনে এহেন চুম্বক শক্তিই কাজ করছে। তাই এ জিনিসটি যাতে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে এবং জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য মুতাবেক কাজ করে, তার ব্যবস্থা করা প্রতিটি জাতি ও জাতীয় সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব রূপে গণ্য।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মজবুত যে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানব জীবনের চরমতম বস্তুগত লক্ষ্য ও বৈষয়িক উন্নতি লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। কেবল বৈষয়িক উদ্দেশ্যই নয়, যে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে চান আপনি, আপনার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুরূপ ফলদায়ক করে গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই আপনার থাকতে পারে না।

আমরা যেহেতু আমাদের শিক্ষাগত সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাচ্ছি তাই বলবো ঃ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও অনুরূপ প্রস্তুতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে; তা না হলে স্বাধীনতার তাৎপর্য এবং আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনক্রমেই অর্জিত হতে পারে না। আমরা যদি কলা গাছ রোপন করে আম ফল পেতে চাই, তাহলে তা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। বিগত বছরগুলোতে আমরা সেই নির্বুদ্ধিতাই করে আসছি—করে যাচ্ছি নির্লিপ্তভাবে। আমরা ভেবেও দেখিনা—দেখতে চাইনা যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি; আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে আমরা ভাসিয়ে দিচ্ছি কোন্ গড্ডালিকা প্রবাহে।

আমাদের শিক্ষাদর্শন কি হবে

আমাদের শিক্ষাদর্শন কি হবে? এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব এ-ই হতে পারে যে, আমাদের শিক্ষাদর্শন হবে তা-ই যা এখানকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন এবং রাষ্ট্রীয় দর্শন। আর এতদাঞ্চলের বৃহত্তর জনগণের জীবন-দর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন কি, এ পর্যায়ে কোন কোন মহল বিতর্ক তুলতে চাইলেও একথাই চূড়ান্ত—এবং এছাড়া অন্য কোন কথাই হতে পারেনা—যে, ইসলামই হচ্ছে এখানকার জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রদর্শন।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

১৯৪৭ সনের প্রথম স্বাধীনতা লাভের পর এতদাঞ্চলের জাতি ও রাষ্ট্র যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তন্মধ্যে এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল প্রধান—যার মৌলিক সমাধান হওয়া অপরিহার্য ছিল সর্বপ্রথম। কেননা একটা আদর্শবাদী দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষা সমস্যাই হয় জীবন মরণের সমস্যা। বিশেষ করে এ কারণে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে এতদাঞ্চলের জনগণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা লাভ করেছিল, তার প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ছিল তাদেরই প্রাক্তন প্রভু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। তারা এ দেশে যে-শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে তিনটি কথা

www.amarboi.org

মৌলিকভাবে মনে রাখাতে হবে। একটি হল এই যে, ইংরেজ ছিল তখন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার অগ্রণী। একটি বস্তুবাদী সাম্রাজ্যবাদী জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনমূলক হবে; নিতান্ত বৈষয়িক ও উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ এবং নীতিহীন ভোগবাদ ও স্বার্থবাদই হবে সে শিক্ষাব্যবস্থার মৌল দৃষ্টিকোণ। এটি খুবই স্বাভাবিক কথা—এর ব্যতিক্রম ধারণামাত্র করা যেতে পারেনা। আর দ্বিতীয় কথা হল, ইংরেজ ছিল এদেশের বিজয়ী প্রভু, মালিক-মুখ্‌তার। সেই প্রভুরা এ তদঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করেছিল, তারা ছিল তাদের বিজিত গোলাম। গোলাম জাতির জন্যে এমন শিক্ষাব্যবস্থা তারা স্বভাবতই চালু করতে পারেনা, যা এ গোলামদেরকে প্রভু বানিয়ে দিতে পারে কিংবা প্রভু হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে পারে। অন্য কথায়, গোলাম জাতিকে আরো গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষাই তারা দিতে চেয়েছে, প্রভু বা স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা নিশ্চয়ই দিতে চায়নি। আর তৃতীয়ত, একথাও উপেক্ষণীয় নয় যে, ইংরেজরা ছিল কট্টর খৃস্টান; তারা এই বিশাল অঞ্চলের রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল মুসলমানদের কাছ থেকে। আর এ রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় তারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল কেবলমাত্র মুসলমানদের তরফ থেকেই। এ কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী এবং মুসলমানদের ঘোরতর দুশমন। তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিল, মুসলমানদের জিহাদী শক্তির উৎস যে জীবন-দর্শন ও যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তাকে নিঃশেষে খতম না করা পর্যন্ত এই লোকদের ওপর ইংরেজ শাসনের মজবুত বুনিয়াদ কায়েম হতে পারে না।

তাই একথা পরিষ্কার যে, ইংরেজের প্রবর্তিত সে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশ ও জনগণের জন্যে কোন দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিল না। দেশ-বিভাগের পর তা এখানে একদিনের তরেও চালু থাকা উচিত ছিল না; বরং অনতিবিলম্বে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বদল করে এদেশের জনগণের উপযোগী একটি আদর্শ-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এ জাতির দুর্ভাগ্যই এখানে যে, এদেশে তা করা হয়নি। পাকিস্তান উত্তর কালে শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা নিশ্চিত ও নিষ্কন্টক করার জন্যেই দিনরাত ব্যতিব্যস্ত ছিল। মুসলিম জাতির আদর্শিক ভবিষ্যত নির্মাণের জন্যে অপরিহার্য ছিল যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, তার প্রতি একবিন্দু দৃষ্টি নিক্ষেপের ফুরসতও তাদের হয়নি কিংবা বলা যায়, ইংরেজের নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধনেরই প্রয়োজন বোধ করেননি তারা এবং তা করতেও চাননি। প্রয়োজন মনে করেননি এ কারণে যে, শাসনযন্ত্রের সাথে জড়িত সব লোকই ছিল ইংরেজের অনুরূপ জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট ও আস্থাবান। ফলে স্বাধীন দেশ ও জনগণের বেলায় যে তার ব্যতিক্রম কিছু হওয়া দরকার, তার চেতনাটুকু তাদের মনে জাগেনি। তারা একাজ করতে চাননি এজন্যে যে, তারা স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম নাগরিকদের উপযোগী এবং তাদের আদর্শিক চেতনার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু করা হলে

www.amarboi.org

তা শাসকদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে। এ কারণে একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, তারা ইচ্ছে করেই এ দেশের মুসলিম জনগণকে গোলাম বানানোর উপযোগী, অধিকতর গোলামী চেতনা সৃষ্টিকারী এবং ইসলামের প্রতি চরম অবিশ্বাস সঞ্চারকারী সম্পূর্ণ গায়র-ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই বলবত করে রেখেছিলেন। তাই বলতে চাই, এ জাতির ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছিল সেই প্রথম দিনই, যেদিন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তিত করার অপরিহার্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি।

পাকিস্তান-উত্তরকালে শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা

পাকিস্তান-উত্তর যুগে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যে যে কোন চেষ্টাই হয়নি, তা অবশ্য বলা হচ্ছেনা। এ পর্যায়ে যা চেষ্টা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে সর্বপ্রথম একটি নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান কায়েমের চার বছর পর ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে নিখিল পাকিস্তান-ভিত্তিক এক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় এ্যাড্ভাইজারী বোর্ড, কাউন্সিল অব টেক্‌নিকাল এডুকেশন এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড-এর এক যুক্ত অধিবেশন হয়। এরপর '৫২ সনের জানুয়ারী মাসে কমার্শিয়াল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। '৫৫ সনে প্রথম রচিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। '৫৬ সনে লাহোরে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড একটি কমিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি পেশ করে। '৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন পূর্বপাক (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকার শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। '৫৯ সনে তৎকালীন সামরিক সরকার সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনের দৃষ্টিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা রচনার লক্ষ্যে একটি 'শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি কথা বলাই যথেষ্ট এবং তা এই যে, ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা-উত্তর যুগের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিকতার প্রবল প্রাধান্য অপরিবর্তিতই রয়েছে। ইংরেজের স্থলাভিষিক্ত শাসকরা কেবল বিদেশী প্রভুদের পদাংকই অনুসরণ করেছে হরফে হরফে। একবিন্দু এদিক ওদিক তাকানোকেও তারা বিদেশী প্রভুর আনুগত্য ও অন্ধ অনুসরণের ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়েছে। বস্তুত এরূপ কূপমণ্ডুকতা নিতান্ত গোলামদের পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি যা কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট কথা এই যে, তা পূর্বাপেক্ষা

৩—

www.amarboi.org

অধিক মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছে এ জাতির পক্ষে। দ্বীন-ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের দৃষ্টিতে এ রিপোর্ট হচ্ছে চরম কলঙ্কজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। মুসলিম জাতির নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদেরকে ইসলামী ঈমান-আকীদার প্রতি অবিশ্বাসী, ইসলামী আমল ও আখলাকের প্রতি বিদ্রোহী এবং তাদের জীবনকে উৎকট ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারক-বাহক বানিয়ে দেবার জন্যে এর মতো বড় হাতিয়ার স্বয়ং বিদেশী ইংরেজও প্রয়োগ করেনি—প্রয়োগ করতে সাহস পায়নি, যা করেছে আমাদের এই স্বজাতীয় লোকেরা। যেখানে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব ছিল, সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেই দাবি করা হল যে, আদর্শ জাতি গঠনই এ সরকারের লক্ষ্য। অথচ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা-ও আদৌ যথার্থ নয়। তার পরিবর্তে বরং নাচ-গান শিক্ষা করাকেই কার্যত অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মতো ধোঁকাবাজি ইতিহাসে কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌল সমস্যা

যতদূর চিন্তা করতে পেরেছি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল সমস্যাই হচ্ছে তার আদর্শবাদের সমস্যা—তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। স্বাধীন বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থান এবং স্বাধীনতা অর্জনকারী জনগণ দাবি করে যে, এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুরাপুরি ইসলামের জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন এখানে আদর্শবাদী নাগরিক গড়ে উঠতে পারে, সাধারণভাবে জাতির জনগণ এবং বিশেষভাবে শাসক, পরিচালক ও কর্মকর্তারা যেন ইসলামী চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারক হতে পারেন, যেন এই দেশ আদর্শ ও বাস্তব তথা কথা ও কাজ—উভয় দিক দিয়েই পুরাপুরি ইসলামী হয়ে ওঠে। দেশবাসীর এটা শুধু কামনা নয়, বরং একথা নিশ্চিত যে, এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে রাজী নয়। এ কারণেই পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরে দেখা গেছে, দেশের শাসকগণ সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী কাজ করতে গিয়েও ইসলামেরই দোহাই দিয়েছেন—অন্তত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ কাজ ইসলাম বিরোধী নয়।[১]

অতএব আমাদের শিক্ষার এ মৌল সমস্যার সমাধান হতে হবে সর্বাগ্রে—সর্বপ্রথম। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। একথা

---

১. এ ব্যাপারে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ক্ষমতাভোগী শাসকদের স্ব-বিরোধী আচরণও বিশেষ তাৎপর্যবহ। তাঁরা শাসন-প্রশাসনে ধর্মহীন ভূমিকা গ্রহণ করলেও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে নিজেদেরকে ধার্মিক রূপে জাহির করতে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেননি।—সম্পাদক

www.amarboi.org

আমরা—দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দেশবাসী—যতো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব, ততই মঙ্গল।

শিক্ষার মাধ্যম সমস্যা

শিক্ষার ব্যাপারে দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে, তা হল শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Instruction) সমস্যা। শিক্ষা পর্যায়ে দুটো প্রশ্ন মৌলিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল, কি শেখান হবে? আর দ্বিতীয়টি হল, কোন্ ভাষায় শেখান হবে? কি শেখান হবে। এ পর্যায়ে আমরা এ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছি, তা হল ঃ শেখান হবে স্বাধীন দেশের সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা উন্নত, সুসভ্য ও আধুনিক মানুষ হিসেবে বসবাস করার জন্যে একান্ত জরুরী; কিন্তু তা সবই শেখান হবে ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য হলঃ জনগণকে এ জ্ঞান শেখাতে হবে জনগণেরই নিজস্ব ভাষায়—আমরা যাকে বলি মাতৃভাষা। মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় চিন্তা করে—করে মত-বিনিময় ও চিন্তার আদান-প্রদান, তাকেই হতে হবে তার শিক্ষার মাধ্যম; তাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখাতে হবে সেই ভাষায়। অন্যথায় তা আর যা-ই হোক প্রকৃত শিক্ষা হবে না। তা এমন শিক্ষা কিছুতেই হতে পারেনা, যা শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করবে, যা তাদের মাঝে আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করবে। আর শিক্ষা যদি তা-ই করতে না পারল তাহলে তা গলায় উচ্চতর ডিগ্রীর তকমা ঝোলাতে পারে বটে; কিন্তু 'শিক্ষিত মানুষ' গড়তে পারবে না। দুনিয়ায় এমন কোন সভ্য দেশের কথা আমার জানা নেই, যেখানে জাতির সন্তান-সন্ততিকে তার মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়না; শিক্ষা দেয়া হয় বিদেশী—বিজাতীয় ভাষায়। বর্তমানে দুনিয়ায় যত উন্নত জাতি রয়েছে, তাদের সবক'টি সম্পর্কেই একথা বলা যায় যে, তাদের উন্নতির মূলে রয়েছে জাতীয় আদর্শমূলক শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষা দেয়ার রেওয়াজ কেবল সে জাতির মধ্যেই হতে পারে—হয়ে থাকে, যে জাতি অপর কোন জাতির গোলাম। যেমন, বৃটিশ ভারতের প্রভু-জাতি তাদের নিজস্ব ভাষায়ই শিক্ষা দিয়েছে এ গোলাম দেশের শিক্ষার্থীদেরকে, বাধ্য করেছে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজো কি ইংরেজ এ দেশের প্রভু?.... তা অবশ্য নয়। কিন্তু তা না হলে কি হবে, ইংরেজের গোলামদের কুক্ষিগত হয়ে আছে এদেশের শাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটার সুদীর্ঘ কাল পরও এ জাতির মাথার ওপর সওয়ার হয়ে আছে ইংরেজের প্রেতাত্মা। তাই এ জাতি যতোই কামনা করুক না কেন মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করতে, ইংরেজের এ গোলামরা এবং তাদের এ প্রেতাত্মারা ইংরেজী ভাষার গোলামী ছাড়তে রাজী নয় একবিন্দুও। মনে হচ্ছে,

www.amarboi.org

ইংরেজের এ প্রেতাত্মারা যদ্দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন এ দেশবাসীর বুকের ওপর থেকে সরে যাবে না বিজাতীয় শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষার বৈদেশিক মাধ্যমের এ জগদ্দল পাথর।[১]

দুর্ভাগ্য কেবল এখানেই নয়, দুর্ভাগ্য এখানেও যে, এ দেশের মাদ্রাসাগুলোতে—বিশেষত দেওবন্দী ধারার মাদ্রাসাগুলোতে প্রায় প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হল উর্দূ।[২] অথচ উর্দূ এখানকার লোকদের মাতৃভাষা নয়। তার ফলে আরবী কিতাবকে উর্দূতে তরজমা করে শিক্ষা দেয়া হয় এ মাদ্রাসাগুলোতে। এভাবে প্রতি বছর এসব মাদ্রাসা থেকে শত শত লোক সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে বের হয়েও আসে; কিন্তু সত্যি কথা এই যে, প্রকৃত জ্ঞান এবং শিক্ষা নিয়ে খুব কম লোকই বের হতে পারছে; খুব কম লোকের জ্ঞানই এ দেশবাসীর কোন কাজে লাগছে। ফলে এক-একজন হয়তো 'বিদ্যার জাহাজ' হয়ে আছেন, কিন্তু সে জাহাজ মাল খালাস করার বন্দর খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও; সে মাল বিলি-বন্টন করার স্থানীয় মাধ্যমও নেই কারোর হাতে। এভাবে ব্যর্থতায় গুমরে মরছে এ জাতির সব শিক্ষা—কুরআন-হাদীসের ইলম। গুদামের মাল গুদামেই পচে যাচ্ছে।

ইংরেজের এ দেশী গোলামদের মুখে প্রায়শ শোনা যায়, ইংরেজীকে মাধ্যম না বানালে জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষাদানের কাজই সমাধা হতে পারেনা। তারা বোধ হয় মনে করে, দুনিয়ার সব উন্নত দেশেই বুঝি শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজীকেই চালু করা হয়েছে; ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে বুঝি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই শেখা বা শেখানো যায়না। কিন্তু এটা যে চরম নির্বুদ্ধিতা ও নিকৃষ্ট গোলামী মনোবৃত্তির লজ্জাকর অভিব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে কি ইংরেজীর মাধ্যমেই লেখাপড়া ও বিজ্ঞান চর্চা করা হচ্ছে? না এ সব দেশ কি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইংরেজের চেয়ে কোন অংশেই পিছনে রয়েছে? বস্তুত চীন ও জাপান যে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ফলেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে দুনিয়ার সর্বোন্নত জাতিগুলোর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা কি ইংরেজের এ দেশীয় গোলামদের জানা নেই?....এ পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা এই যে, আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষাই যদ্দিন মাতৃভাষার মাধ্যমে দেবার ব্যবস্থা চালু না হবে, তদ্দিন এদেশের কোন প্রকৃত উন্নতির ধারণাই করা যায়না। যদি কিছু হয়ও তবে তা

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে অনেক গালভরা বুলি কপচানো হয়েছে; কিন্তু এব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে কোন সরকারই আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসেনি। তার ফলে স্বাধীনতার দুই যুগ পরেও বিষয়টি এখন পর্যন্ত অমীমাংসিতই রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রচারকে অব্যাহত রাখারই প্রয়াস চলাছে সর্বপ্রযত্নে।—সম্পাদক

২. ইদানীং এ অবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে এবং বাংলাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার একটা নীরব প্রয়াস চলছে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

হবে কৃত্রিম—তা হবে ভাসাভাসা ও ভিত্তিহীন। আর এ ভাসাভাসা ও ভিত্তিহীন উন্নতি কোন জাতিকেই যথার্থভাবে উন্নত করতে পারেনা। কাজেই শিক্ষার মাধ্যম সমস্যা হল এমন একটি সমস্যা, যার আশু সমাধান হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষার ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকর ও প্রভাবশালী হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষার পরিবেশ বলতে বুঝায় শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের মূলে কার্যকর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ছাত্র-শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি। এদেশের 'জাতীয় শিক্ষা' (National Education) ব্যবস্থার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া হয়, তার কোন একটির সাথেও এদেশের শিক্ষার্থীদের মনের সংযোগ বা অন্তরের গভীরতর সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কেননা তার সবই ইসলামের বিপরীত—ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন; ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও তার নেই কোন সামঞ্জস্য। ফলে মুসলিম যুব-সমাজকে এ শিক্ষা দেয়া এক ধরনের গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে নিঃশব্দ 'নরহত্যা'। হত্যাকাণ্ডে দেহ ধ্বংস হয় আর এ শিক্ষায় ঘটে মানব-মন তথা মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। অতএব এ কাজ নরহত্যার চাইতেও মারাত্মক। মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত নির্মল ভাবধারা এ শিক্ষা থেকে কোন রস আহরণ করতে পারে না। এ শিক্ষায় জাগে না তাদের মন-মগজ ও স্বভাব-প্রকৃতিতে আনন্দ-শিহরণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আবেগের উত্তাল তরঙ্গ। বরং এ শিক্ষা মানুষের অপমৃত্যু ঘটায়, যেমন ঘটায় বিষাক্ত সাপের ছোবল। আর মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটার পরিণাম হল মানব দেহে এক হিংস্র পশুকে জাগিয়ে তোলা ফলে শিক্ষাগার নামক কারখানা থেকে যারা দলে দলে বের হয়ে আসে তারা শিক্ষিত মানুষ নয়, ডিগ্রীর তক্মাধারী একশ্রেণীর জীব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয় নির্বাচনকালে আদৌ চিন্তা করা হয়না যে, এ শিক্ষা মানুষের জন্যে, মানুষকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেবার জন্যে, পশু বানাবার জন্যে নয়। ফলে পাশবিক শক্তিরই বিকাশ সম্ভব হয় এর মাধ্যমে।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বলা যায়, সেখানে কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর যা কিছুই পড়ানো হয়, তাকে এক কথায় 'বস্তা পঁচা জিনিস' বললেও অত্যুক্তি হবেনা। সেখানে কুরআন-হাদীস পড়ানো হয় ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার উৎস হিসেবে নয়; পড়ানো হয় এভাবে, যেন এসব প্রাচীনকালের আরবী সাহিত্য গ্রন্থ। এ শিক্ষার সবচাইতে বড় ত্রুটি হল, এখানে প্রাচীন কালের লেখা বড় বড় দুর্বোধ্য কিতাব পড়ানো হয়, কোন বিষয়ের জ্ঞান শেখান হয়না। কেননা বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এখানকার শিক্ষক সাহেবানদের।

শিক্ষার মূলে নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে যারাই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে আসে

www.amarboi.org

তাদের সামনে জ্ঞান শেখার চাইতেও বড় লক্ষ্য থাকে ডিগ্রী লাভ। এ জন্যে সারা বছর ধরে ছাত্রদের এক দিকে নজর থাকে ক্লাশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপস্থিতির দিকে, অন্যদিকে নজর থাকে মোটামুটিভাবে পাশ করার দিকে—যাতে পাশ করা সহজ এবং নিশ্চিত হয়, এমন কি সেজন্যে কোন হীনতম পন্থা গ্রহণেও কুণ্ঠাবোধ করা হয়না। মেধাবী ও বৃত্তিধারীরাও সহজে পাশ করার লোভে পরীক্ষার হলে নকল করে, একথা শুনলে আজকের দিনে কারোর বিস্ময়ের উদ্রেক হয়না। আর শিক্ষকদের মনেও জাতির ভবিষ্যত এই শিক্ষার্থীদেরকে সত্যিকার জ্ঞান শেখানোর দিকে কোন লক্ষ্যই থাকেনা বলা চলে।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে মাসান্তর বেতন গুণে নেয়ার দিকেই সাধারণত তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ঠিক তেমনি, যেমন মাছ শিকারী বক্ তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে মাছের গতিবিধির ওপর। এক কথায় শিক্ষার নামে এখানকার সবই হচ্ছে নিতান্ত অর্থনৈতিক ব্যাপার। এখানে উচ্চ ডিগ্রী লাভের লক্ষ্য ঃ বাজারে চড়াদামে বিক্রী হওয়ার 'যোগ্য পণ্য' রূপে নিজকে গড়ে তোলা, যেন বিপুল টাকা-পয়সা লাভ করে দুনিয়ার সুখভোগ করা যায় স্বচ্ছন্দে। তার ফলে আজ সমাজে সত্যিকার বিদ্যান ও জ্ঞানবান ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় নেই বলা যায়। আর কিছু থাকলেও তা দিন দিনই ফুরিয়ে যাচ্ছে। যে সব বিদ্যান ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তাদের শূন্য স্থান পূরণ হতে দেখা যাচ্ছেনা। তার পরিবর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডিগ্রীধারী লোকদের প্রাচুর্য। এরই ফলে দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা পর্বত-প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সাধারণ ও নিম্নমানের শূণ্য পদের চাকুরীর জন্যে জমে ওঠে উচ্চ ডিগ্রীধারী অসংখ্য প্রার্থীর ভিড়।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক

শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যথোপযোগী সম্পর্ক গড়ে ওঠার ওপর চিরদিনই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্ক সঠিক এবং সুষ্ঠু না হলে সত্যিকার জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ সম্ভব নয়। তাদের মাঝে বর্তমানে যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিগ্রী লাভ এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মাসান্তর টাকা গোণা, তাই শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে বলতে গেলে লেন-দেনের সম্পর্কই হচ্ছে প্রবল। তাদের মাঝে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠছেনা, যা সত্যিকার জ্ঞান লাভের জন্যে অপরিহার্য। তাই আজ পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে তৃতীয় শ্রেণীতে ঠেলে দিতে শিক্ষকরা এবং প্রত্যাশিত ফলের জন্যে শিক্ষকের মাথা ভেঙে দিতে ছাত্ররা কোন অন্যায় বোধ করছে না।

অধিকন্তু ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে হওয়া উচিত পবিত্র, আন্তরিক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন—একই জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণকারী বন্ধু ও সারথী হওয়ার মতো, সেখানে পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, দলাদলি ও চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার অমানবিক ভাবধারাই প্রবল ও প্রকট হতে দেখা যায়। এ কারণে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাস দখলের জন্যে ইদানীং ছাত্রে ছাত্রে মারামারি ও খুন-খারাবী হওয়া এক নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যে মনস্তাত্ত্বিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে, তাতে আর যা-ই হোক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

সহশিক্ষা

দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে, এর মতো মারাত্মক জিনিস বোধহয় আর কিছু নেই। মুসলমানরা নৈতিক চেতনাসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী। তাদের সমাজে সহশিক্ষার প্রচলন যে কেমন করে সম্ভব হচ্ছে, তা কিছুতেই বোধগম্য নয়। সহশিক্ষা মানে, ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই একই বিষয় একই কক্ষে পাশাপাশি বসিয়ে শেখানো হচ্ছে। এ পর্যায়ে প্রথম কথা হল ঃ ছেলে ও মেয়ে জন্মগতভাবেই স্বতন্ত্র দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং ভাবধারার ধারক হয়ে থাকে। জীবনের পরিণত স্তরে স্বাভাবিক দায়িত্ব বোধের তাগিদেই তারা স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র গ্রহণে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে কোন মিলই থাকে না ছেলে ও মেয়ের জীবনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়কে ঠিক একই বিষয় একই ধারায় শিক্ষা দেয়ার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তা ভাষায় প্রকাশ করা চলেনা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিদ্যা—এ ধরনের সব বিষয়েই যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যেই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ হয়না কখনো। কাজেই একই কক্ষে বসিয়ে, একই ভঙ্গিতে একই বই পড়ানো ও একই দৃষ্টিকোন দিয়ে একই বিষয় ছেলে ও মেয়েকে শিক্ষা দেয়ার মানে হল ছেলে ও মেয়েকে মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন করে তোলা। আর এটা যে স্বভাব ও প্রকৃতির শুধু বিপরীতই নয়, মানবতার পক্ষে মারাত্মকও, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারেনা।[১] এর ফলে যে ছেলেরা মেয়েলী স্বভাব-প্রকৃতির ধারক হবে—পৌরুষ হারিয়ে ফেলবে আর মেয়েরা পুরুষোচিত মন-মেজাজ লাভ করবে, হারিয়ে ফেলবে সব নারীসুলভ কমনীয়তা, তা বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও অনায়াসে বোঝা যায়। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বর্তমান উচ্ছৃংখলতার মূলে প্রধানত এ কারণই নিহিত।

দ্বিতীয়ত ছেলে ও মেয়েকে একই কক্ষে বসিয়ে শেখানোর পরিণাম হল, হয় ছেলে ও মেয়েদের স্বাভাবিক যৌনবোধকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়া এবং মানব সমাজে ক্লীব লিঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটানো, না হয় যৌনবোধের উস্কানি সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনচর্চা ও যৌন

---

১. তাজ্জবের ব্যাপার যে, ইদানীং কিছু কিছু মাদ্রাসায়ও সহশিক্ষা চালু করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড যে কর্তৃপক্ষীয় ইঙ্গিতেই করা হচ্ছে, তা বুঝতে কারো বেগ পেতে হয় না। কিন্তু পরিনাম কত ভয়াবহ, সময় থাকতেই তা সংশ্লিষ্ট সকলের ভেবে দেখা উচিত।—সম্পাদক

www.amarboi.org

পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি—যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধনই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে। আর মানবাকৃতির এ জীবগুলো এক নতুন পশু শ্রেণীর রূপ ধরে সমাজে পাশবিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। মনে রাখতে হবে, এ সহশিক্ষা নীতি মুসলিম জাতি কোনদিনই গ্রহণ করেনি, তারা তা চালুও করেনি। আমাদের নীতিহীন ও চরিত্রহীন ইংরেজ প্রভুরাই এ গোলাম জাতির চরিত্র ধ্বংস করার কুমতলবে এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে সম্পূর্ণ চরিত্রহীন রূপে গড়ে তোলার চক্রান্ত হিসেবে এ দেশে এ সহশিক্ষার প্রচলন করেছিল। আর সে বিদেশী প্রভুদের অন্ধ গোলামরা মুসলিম জাতির মাথার ওপর এ অভিশাপ চাপিয়ে রেখেছে নিজেদেরই চরিত্রহীনতার কারণে; নিজেদের বিকৃত যৌন পরিতৃপ্তির অবাধ সুযোগের দ্বার চির-উন্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে। বস্তুত এ সহশিক্ষা নীতিতে সত্যিকার জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছেনা কিছুই, বরং সমাজের যুবক-যুবতীদের পশুত্বের নিম্নতম পংকে ডুবে যাবার উৎসাহই দেয়া হচ্ছে সর্বতোভাবে। মোমবাতির অগ্রভাগের সূতায় দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে অগ্নিসংযোগ করলে মোমবাতি গলে গলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে পজিটিভ ও নেগেটিভ দুটি তার এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়ে সুইজের সাহায্যে আলোর বন্যা সৃষ্টি করে, সেই তাব দুটিই মাঝ পথে আবরণমুক্ত হয়ে পরস্পর মিলিত হলে সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে দেয়। সহশিক্ষা তেমনি আমাদের সমাজে ও পরিবারে গুরুতর ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা হয়ত তা-ই চান। অন্যথায় ইংরেজের চাপিয়ে দেয়া পাশ্চাত্য নোংরামীর এ অভিশাপকে এখনো এ স্বাধীন মুসলিম জাতির মাথার ওপর চাপিয়ে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে কি?

বড় লোকের শিক্ষা

বর্তমানে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা গরীব লোকদের আর্থিক সামর্থের সম্পূর্ণ বাইরে—অনেক দূরে চলে গেছে। এখনকার পাঠ্য বই-পুস্তক, কাগজ-কালি-কলম ইত্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে। তদুপরি মাসিক ছাত্র বেতনের পরিমাণও আকাশ-ছোঁয়া। কাজেই আমি বলব, এখনকার শিক্ষা একান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে বড় লোকদের ছেলেমেয়ের জন্যে। গরীবদের ছেলেমেয়ের জন্যে শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষার দুয়ার তাদের সামনে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্তাব্যক্তিদের বোধহয় তা-ই কাম্য। বেশী লোক লেখাপড়া জানলে কর্ম-সংস্থান তথা চাকুরী দেবার দায়িত্ব বাড়বে আর এ শিক্ষিত যুবকদের চাকুরী দিতে না পারলে সরকার বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠবে। সর্বোপরি তাতে এখনকার শাসকদের তথাকথিত উন্নয়ণ কর্মকাণ্ডে সস্তা মূল্যের শ্রমিক-মজুরের অনটন দেখা দেবে, কল-কারখানার চাকা ঘুরবেনা এবং দেশী-বিদেশী পুঁজিদারদের শোষণের মাত্রা কমে যাবে। কাজেই শিক্ষাকে এতো বেশী ব্যয়-সাপেক্ষ করে দেয়া হয়েছে যেন গরীবরা

www.amarboi.org

লেখাপড়ার কথা চিন্তাই করতে সাহস না পায়। তারা এসব বাজে চিন্তা (?) না করে বরং নিম্নতম মজুরীতে আত্ম-বিক্রয়ে বাধ্য হয়ে যেন সোজা মজুর মার্কেটে উপস্থিত হয়—মনে হচ্ছে কর্তাদের এই হল শিক্ষা নীতি। সরকার দেশে যে অসংখ্য পাবলিক স্কুল কায়েম করেছেন, তা আদৌ পাবলিক নয়; কারণ সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। তবু এইসব স্কুলকে পাবলিক স্কুল নাম দেয়ার উদ্দেশ্য জনগণকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

মিশনারী শিক্ষার মারাত্মক পরিণাম

এই পর্যায়ে দেশে জালের মতো ছড়িয়ে পড়া ব্যাপক খৃস্টান মিশনারী স্কুল-কলেজগুলোর উল্লেখ করাও অপরিহার্য। মিশনারী শিক্ষা হল এই মুসলমান দেশের মুসলমান পিতামাতার ছেলে-মেয়েকে তাদেরই বাপ-মা'র টাকায় এবং সরকারী ঔদাসীন্যের সুযোগে খৃস্টান বানিয়ে দেয়ার শিক্ষা। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছুই নেই। আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে উটপাখির ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। বাইরে প্রবল ঝড় উঠেছে, সব ঘরবাড়ি সংসার মিস্‌মার করে দিচ্ছে; কিন্তু মহামান্য উটপাখি সাহেব বালির পাহাড়ে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন—মনে করছেন কোথাও কিছু হচ্ছে না, সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। কিন্তু আমি বলতে চাই, এ মিশনারী শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুনিয়ার মুসলিম জাতিগুলোকে খৃস্টান সভ্যতা ও সংস্কৃতির খপ্পরে ঠেলে দিচ্ছে এবং সমাজে মুসলিম-খৃস্টান দ্বন্দের পথ উন্মুক্ত করছে।[১] আফ্রিকা ও এশিয়ার কতকগুলো মুসলিম দেশকে তা-ই আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এদেশেও যে একদিন অনুরূপ কোন অঘটন ঘটবেনা, তা শুধু মূর্খ আর পাগলই মনে করতে পারে, কোন সচেতন মুসলমানই এ ব্যাপারে একবিন্দু গাফিলতিতে পড়ে থাকতে পারেনা। কিন্তু দেশের কর্তাদের নিকট বোধহয় এ ব্যাপারটির কোনই গুরুত্ব নেই। তাঁরা বোধহয় দেশের ক্ষতি হতে দিতে রাজী, কিন্তু রাজী নয় পাশ্চাত্য প্রভুদের বিরাগভাজন হতে। তাই মিশনারীদের অবাধে তৎপরতা চালানোর সুযোগই শুধু দেয়া হয়নি, জমি জায়গা, দালান-প্রাসাদ এবং বিপুল অর্থও উদার হস্তে দেয়া হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানকে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পদে পদে ইসলামকে অপমান করা হচ্ছে, ঈমান ও আকীদার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত খৃস্টানী আকীদা-বিশ্বাস মুসলমান ছেলেমেয়েদের মন-মগজে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখানে ইসলামী আচার-আচরণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি আদৌ বরদাশত করা হয়না। এক কথায় মুসলিম বংশধরদের এখানে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। অথচ কর্তাদের চোখে এর মারাত্মক কুফল আদৌ ধরা পড়ছেনা। বোধহয় চূড়ান্ত ধ্বংসের আগে এদের নাকে ও কানে পানি ঢুকবেনা। তাই এ

১. পৃথিবীর বৃহত্তর মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া ও সুদানের সাম্প্রতিক মুসলিম-খৃষ্টান সংঘাত এ ভয়াবহ বিপদেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করছে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

ব্যাপারে দেশের মুসলিম জনগণের কর্তব্য হচ্ছে তাদের করণীয় নির্ধারণ করা। অন্যথায় এ জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

সমস্যার সমাধান

এ দীর্ঘ আলোচনায় এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান মাত্র কয়েকটি বড় বড় সমস্যার শুধু উল্লেখ এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। রচনার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় প্রতিটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। এসব সমস্যার বিস্তৃত সমাধানও পেশ করা যায়নি। তা পেশ করতে হলে এর আলোচনা আরো দীর্ঘ হবে। সে কারণে সমাধান পর্যায়ে অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করে এ আলোচনার ইতি টানতে চাই।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যেসব সমস্যার কথা এখানে বলা হল, সেগুলোর একমাত্র সমাধান এই যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন-দর্শন ও শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে নতুন করে ঢেলে একটি পূর্ণাঙ্গ ও এককেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে, যেখানে ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সেখান থেকে তৈরী হবে যেমন দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানসম্পন্ন পারদর্শী ব্যক্তিগণ, তেমনি বের হবে ইসলামী আদর্শবাদী ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, রসায়নবিদ, ভূগোলবিদ, খগোলবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, বিচারপতি. আইনবিদ, আদর্শ শাসক, চরিত্রবান প্রশাসক, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আর তা-ই হবে দেশের জাতীয় শিক্ষা। এই একই ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে এক অখণ্ড ইসলামী জাতি। বর্তমানে দেশে মৌলিকভাবে দুই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রয়েছে ঃ একটি হচ্ছে দ্বীনী শিক্ষা আর অপরটি বৈষয়িক শিক্ষা। ফলে সমাজে দু ধরনের লোক তৈরি হচ্ছে ঃ এক শ্রেণীকে বলা হয় 'মোল্লা'—যারা হয়তবা শরী'আতী বিদ্যা মোটামুটি জানে; কিন্তু জানেনা বৈষয়িক কোন জ্ঞান। আধুনিক চিন্তা-মতবাদের সাথে তাদের নেই কোন পরিচয়। তারা বুঝেনা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ও সেগুলোর সমাধান। দুনিয়ার কোন খবরই রাখেনা তারা, অথচ নিজেদের তারা মনে করে ধর্মবিদ, ধার্মিক এবং অন্যদের মনে করে দুনিয়াদার—ফাসিক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। তারা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানেনা। ফলে দ্বীন ও ধর্মের প্রতি তাদের মনে থাকে অজ্ঞতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ফলে সাধারণভাবেই তারা ইসলামী আদর্শবাদী জীবন যাপনে হয় অক্ষম। একটা জাতির শিক্ষিত জনগণের এরূপ

১. সম্প্রতি এর সাথে নতুন উপসর্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের নামে পাশ্চাত্য মদদপুষ্ট কিছু কিছু এনজিও'র। স্বাধীন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা বিস্তার বলতে তেমন কিছুই হচ্ছেনা। তবে গ্রামের কোমলমতি ছেলেমেয়েদেরকে ইসলাম বিমুখ করার একটা সচেতন প্রয়াস এতে সুস্পষ্টতই লক্ষ্যনীয়।—সম্পাদক

www.amarboi.org

দুই বিপরীত ভাবধারায় গড়ে ওঠা জাতির ঐক্যের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। বর্তমানে আমাদের এ-ও একটি অতি বড় সমস্যা। এর আশু সমাধান একান্ত জরুরী আর এ সমস্যার সঠিক সমাধান হচ্ছে, বর্তমান শিক্ষার পরিবর্তে এ যুগে ইসলামী জীবন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়বার উপযোগী এক পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তার প্রবর্তন। কিন্তু এ কাজ বড়োই দুরূহ—বড়োই কষ্টসাধ্য এ কাজ যার-তার দ্বারা সম্ভব হবেনা। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী ও চালু করার জন্যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

এরূপ শিক্ষা কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই ফলপ্রদ হতে পারে; তাহলেই সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় মূলগতভাবে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েকে একই মৌল শিক্ষা দেয়া হলেও তাদের পরবর্তী দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাতে সহশিক্ষার কোন ধারণা পর্যন্ত থাকবেনা। সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন ছেলে ও মেয়েদের জন্যে আলাদা আলাদা হবে, তেমনি আলাদা আলাদা হবে শিক্ষার পরিবেশ, টেকনিক ও পদ্ধতি। আলাদা হবে শিক্ষক ও শিক্ষায়তন। এ শিক্ষা যাতে করে সমাজের সব পুরুষ ও নারী সহজেই পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের। সমাজের কেউই মৌল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না—কোন কারণেই না। গরীব ও ধনীর মাঝে এক্ষেত্রে কোন পার্থক্যই হতে দেয়া চলবেনা। সর্বোপরি, এ রাষ্ট্রের কোন অংশেই এ আদর্শ শিক্ষার বিপরীত কোন শিক্ষাই চালু থাকতে পারবে না। খৃস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে বটে; কিন্তু থাকবেনা মুসলিম ছেলেমেয়েদের হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার মত শিক্ষা দেয়ার কোন সুযোগ। এরূপ করা সম্ভব হলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারবে। এ শিক্ষা হবে অত্যন্ত পবিত্র; এরূপ শিক্ষালাভ হবে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। জ্ঞান-অর্জনের লক্ষ্য হবে আত্মিক উন্নয়ন, কেবল বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যে কেউ জ্ঞান শিখবেনা, শেখাবার কাজ করবেনা। তাই এখানে যেমন ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অতীব পবিত্র, তেমনি মধুর হবে ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কও।

কিন্তু দেশে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা কি করে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর হতে পারে? হতে পারে কি ভাবে তা বুঝবার জন্যে আমাদের এবং আপনাদের লক্ষ্য দিতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান বর্তমান সমস্যাবলীর মূল কারণের দিকে; কেন এ সমস্যার সৃষ্টি হল এবং কেমন করে হল তা বুঝতে হবে সর্বাগ্রে। আমার মতে এ সমস্যা সৃষ্টির মৌল কারণ একটিই। মুসলমানদের ওপর ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী এবং পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন ও বস্তুবাদী কৃষ্টি সভ্যতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী ও অনুগত এক

www.amarboi.org

গায়র-ইসলামী নেতৃত্বের চেপে বসাই হল এসব সমস্যার মূল কারণ। এ কারণেই এসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে আর এ কারণ যদ্দিন বর্তমান থাকবে, তদ্দিন শুধু শিক্ষার কেন, কোন সমস্যারই একবিন্দু সমাধান হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সমস্যাগুলোর সমাধান বর্তমান সেকুলার নেতৃত্ব দ্বারা সম্ভব হবে বলে যারা মনে করে, আমার মতে তারা 'আহাম্মকের স্বর্গে' বাস করে। আমি বলবো, আমার দৃষ্টিতে দেশের সর্বপ্রকার সমস্যার স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান সম্ভব হবে সেদিন, যেদিন বর্তমান ফাসিক নেতৃত্বের অবসান হবে এবং কায়েম হবে এক ইসলামী আদর্শবাদী যোগ্য নেতৃত্ব। তাই যারাই শিক্ষা-সমস্যা সহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান পেতে ইচ্ছুক, তাদের সামনে দেশে ইসলামী নেতৃত্ব কায়েমের জন্যে সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আর সেজন্যে এ দেশের মুসলিম জনগণের মনে ইসলামী শিক্ষার দর্শন এবং তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ জাগাতে হবে—তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ইসলামী আদর্শবাদ ও ইসলামী আদর্শে গণ-সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। এজন্যে কাজ করতে হবে আমাদের—আপনাদের, দেশের সাধারণ মানুষের এবং শিক্ষক ও ছাত্রসহ সব নাগরিকদের। আমি অন্তর দিয়ে কামনা করছি এরূপ এক গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠার ।

www.amarboi.org

শিক্ষায় ধর্মের ভূমিকা

শিক্ষায় ধর্মের ভূমিকা কি? ধর্মের আদৌ কোন ভূমিকা আছে কিনা এবং বাস্তবিকই কোন ভূমিকা থাকতে হবে কিনা, এ সব প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে এই কথার ওপর যে, 'শিক্ষা' এবং 'ধর্ম ' বলতে আমরা কি বুঝি। 'শিক্ষা' ও 'ধর্ম' সম্পর্কে বর্তমানে এমন কিছু ধারণা দুনিয়ার এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে, যার দৃষ্টিতে এই ধরনের কোন ভূমিকার প্রশ্নই ওঠেনা। সত্যি কথা হচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের এরূপ কোন ভূমিকা থাকার অপরিহার্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার এবং যতটুকু ভূমিকা এখনও রয়েছে তাকেও সম্পূর্ণ নিঃশেষ ও নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে এরূপ ধারণা বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই ধারণাকে যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যুক্তির পর যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই শ্রেণীর লোকদের মনোভাব হচ্ছে, শিক্ষার অঙ্গন থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করতে হবে, ধর্মের গোঁড়ামী বা কুসংস্কারের জঞ্জাল থেকে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে, শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ধর্মবিবর্জিত; কেননা তাদের মতে ধর্মমত শিক্ষাকে একদেশদর্শী, সংকীর্ণচেতা, সেকেলে এবং অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত (Super natural) জগত সংক্রান্ত বিষয়াদি দ্বারা ভারাক্রান্ত করে দেয়। অথচ শিক্ষাকে হতে হবে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ, ব্যবহারিক এবং লৌকিক জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানে সহায়ক। অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত বিষয়াদির জ্ঞান নিত-নৈমিত্তিক জীবন সমস্যার সমাধানে মানুষকে কিছুমাত্র পথ দেখাতে পারেনা। কিভাবে মাটির গভীর তলা খুঁড়ে তেল, কয়লা, গ্যাস কিংবা অন্যান্য খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও উত্তোলন করতে হবে, কিভাবে সমুদ্র গর্ভে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা আহরণ করতে হবে, কেমন করে চাঁদে বা মংগল গ্রহে গমনের রকেট নির্মাণ করতে হবে, কেমন করে আণবিক বোমা তৈরী করতে হবে এবং শক্তিশালী শত্রু পক্ষকে দমন বা খতম করার জন্যে নতুন নতুন মারণাস্ত্র নির্মাণ করতে হবে, ধর্ম তা মানুষকে শিখাতে পারেনা; বরং অনেক সময় ধর্মমত মানুষকে এইসব কাজ থেকে বিরতই রাখতে চায়। তাহলে ধর্মকে শিক্ষার ক্ষেত্রে টেনে আনাই ভুল; টেনে আনা হলে বরং জীবনের বিকাশ, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে চরম পশ্চাপদতাকেই মেনে নিতে হবে। অথচ মানব জীবন বিকাশমান, ক্রম-উন্নয়নমুখী ও প্রচণ্ড গতিশীল। ধর্মের প্রভাবমুক্ত শিক্ষাই এই জীবনের সাথে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্ম প্রভাবিত শিক্ষা মানুষকে নিতান্তই কূপমণ্ডুক বানিয়ে দেয়। আধুনিক গতিশীল জগতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, জীবনে বেঁচে

www.amarboi.org

থাকা ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও তা সম্পূর্ণ অসম্ভব করে তোলে। এইরূপ অবস্থা স্বীকার করে নেয়া কোন বুদ্ধিমান জাতির পক্ষেই সমীচীন নয়।

বস্তুত শিক্ষা ও ধর্ম-সম্পর্কিত এই ধারণাই বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা এরূপ ধারণা ও মনোভাবের ওপরই গড়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা থাকার কথাই হাস্যকর। একারণেই বর্তমান দুনিয়ার মুসলিম জাতিকে এই বলে উপহাস করা হয় যে, দুনিয়া কোথা থেকে কোথায় চলে গেল আর এরা এখনও 'ধর্ম ধর্ম' করে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। এরা বর্তমান দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলারই অযোগ্য। আজ হোক আর কাল হোক, এরা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এক কথায় বলা চলে, এই যা কিছু বললাম তা পুরোপুরি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই কথা। বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এই বস্তুবাদেই বিশ্বাসী। তারা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ধর্মকে বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত নয়। অবশ্য বস্তুবাদী এই দৃষ্টিকোণ ও মনোভঙ্গি আজকের নতুন ব্যাপার নয়। প্রায় ৮-৯ শত বৎসর পূর্বেই এই দৃষ্টিকোণ জেগে উঠেছে এবং বিগত শতাব্দীসমূহের মধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। বর্তমান কালের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলে রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকা উচিত কিনা, সে বিষয় বিচার-বিবেচনার পূর্বে এই মৌল দৃষ্টিকোণটির পর্যালোচনা এবং সুস্থ চিন্তার মানদণ্ডে এর যাচাই-পরখ হওয়া একান্তই আবশ্যক। এই বিচার-বিবেচনা ও যাচাই-পরখে যদি এ দৃষ্টিকোণ ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলেই শিক্ষা তথা জীবন-পরিসরে ধর্মের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা সুস্পষ্ট করে বলা সম্ভব হতে পারে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের পর্যালোচনা

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের মর্মমূলে নিহিত রয়েছে বিশ্বলোক ও মানুষ সম্পর্কিত বস্তুবাদী ধারণা। দুনিয়ার মানুষের মনে জেগে ওঠা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশ্বলোক কি স্বয়ম্ভূ, না এর কোন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে? এরই আনুসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশ্বলোক কি কোন স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত না আপনা-আপনি চলমান? মানুষ কি 'বস্তুর'ই ক্রমবিকাশের ফসল, না তার সৃষ্টিকর্তা কেউ আছেন এবং মানুষ তাঁর আনুগত্য করে চলতে বাধ্য?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের দু'রকম জবাব দেয়া হয়েছে। একটি জবাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তাকেই উড়িয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, বস্তুর ক্রমবিকাশের ফসলই এই বিশ্ব-চরাচর এবং এর মধ্যকার সব সৃষ্টবস্তু (موجودات) উদ্ভিদ, জীব-জন্তু, প্রাণীকুল ও মানুষ স্বতঃই অস্তিত্বমান হয়ে উঠেছে।

www.amarboi.org

এই বিশ্বলোকের পরিচালক কেউ নেই—কাউকে তেমন থাকতে হবে, তাও নিষ্প্রয়োজন। কাজেই মানুষকে এখানে স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। কোন স্রষ্টা নেই বলে কাউকে মেনে চলারও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। মানুষের পরিণতি বলতে বুঝায় তার জীবন অবসান অর্থাৎ মৃত্যু। মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। অতএব এই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি-সমৃদ্ধি অর্জনই দুনিয়ায় মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পূর্ণ সাফল্যের সাথে উত্তরণ যে শিক্ষার সহায়তায় সম্ভব, এখানে মানুষের জন্য তা-ই হতে পারে একমাত্র কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা।

শিক্ষা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত বস্তুবাদী দর্শনের যৌক্তিক (مَنْطَقِى) পরিণতি; কিন্তু অনাবিল দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে বিচার করলে এই দর্শনটাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।'

আধুনিক বিজ্ঞান 'বস্তু'র যে বিশ্লেষণ দিয়েছে, তাতে সে তার 'বস্তুত্ব'ই হারিয়ে ফেলেছে। এ কালে বস্তুর প্রাক্‌কালীন রূপ হচ্ছে 'শক্তি' (Energy)। আর এই 'শক্তি'র যে পরিচিতি সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা গেছে, তা হচ্ছে এমন শক্তি, যার সঠিক পরিচয় কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নামে। তাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়েই বলতে চাই, আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসরীরাও নিজেদেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছে আল্লাহ্‌র শক্তিকে স্বীকার করে নিতে। বস্তুত এই বিশ্বলোক যে স্বয়ম্ভু নয়, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তারই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মানুষ মহান স্রষ্টার এক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি—এখানে তাঁরই আনুগত্য করে চলাই তার একমাত্র কর্তব্য, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই এই সত্য ভাস্বর হয়ে উঠেছে । তাতে কুরআনের এ ঘোষণারই বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে ঃ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا —'আর আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে, তারা সবাই তাঁরই আনুগত্য করে চলেছে'। যদিও এদের মন-মগজ থেকে আল্লাহ-অস্বীকৃতির ভাবধারা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ এখনও একবিন্দু কমে যায়নি।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শুধু শিক্ষাই নয়, মানব জীবনের কোন একটি ব্যাপারেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে না। আর আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়ার পর যে শিক্ষা-দর্শন তৈরী করা যেতে পারে তা হল সেই শিক্ষা, যার মাধ্যমে গভীর, সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করা যাবে মহান আল্লাহ্‌র সীমাহীন কুদরত, কুরআনে বিধৃত তাঁর সুমহান গুণাবলীর বাস্তব রূপ, তাঁর মৌলিক সৃষ্টি-উদ্দেশ্য, তার সৃষ্ট বস্তু ও মানুষের জীবন-লক্ষ্য, দায়-দায়িত্ব ও ব্যবহারিক গুণাবলী; সেই সঙ্গে জানা যাবে কোন্ জিনিসের কিরূপ ব্যবহার ও প্রয়োগে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি এবং কোন্ ধরনের জীবন যাপনে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও অকল্যাণ নিহিত। যে শিক্ষা আদতেই মানুষকে মৌলিক বিষয়ে

www.amarboi.org

সুশিক্ষিত ও পুরোপুরি ওয়াকিফহাল বানায় না, সে শিক্ষা জন্তুর জন্যে গ্রহণীয় হলেও মানুষের জন্যে নয় কিংবা সে শিক্ষা জন্তু বানানোর জন্যে উপযোগী হলেও মানুষ বানানোর জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশলের দরুন জন্তু ও মানুষ একই প্রজাতিভুক্ত নয়; একই রকমের জীবন-লক্ষ্য, দায়-দায়িত্ব ও পরিণাম-পরিণতিও নয় উভয়ের। এই দুই সৃষ্টির (مَخْلُوْق) শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষণীয় বিষয় কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে না। বিশেষত জীব-জন্তুর জন্যে বাইরে থেকে কোন শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে না। অথচ মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যে শিক্ষা একান্তই অপরিহার্য এবং সে শিক্ষা তাকে বাইরে থেকেই অর্জন করতে হবে। বর্তমান কালে মানুষের জন্যে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, তাতে মানুষকে একটা জীবমাত্র ধরে নেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র জীব হিসেবে সফল জীবন যাপনের উপযুক্ত বানানোই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য।[১]

মানব-মনের মৌল জিজ্ঞাসা

কিন্তু মানুষ প্রথমত জীব হলেও মানুষ ও জীব মূলত এক ও অভিন্ন নয়। বস্তুগত দিক দিয়ে এক হলেও মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্নতর সৃষ্টি—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা। মানুষের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন প্রকট, জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে সে সব প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, হাস্যকরও বটে।

মানুষের মনে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনটি মৌলিক প্রশ্ন জেগে ওঠে। প্রথম প্রশ্ন ঃ আমি যে বিশাল বিশ্বলোকে জন্ম নিয়েছি ও বেঁচে আছি, এর স্রষ্টা কে? কি উদ্দেশ্যে তিনি এই বিশ্বলোক ও এর মধ্যকার এই অসংখ্য জীব-জন্তু ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? কেননা উদ্দেশ্যহীন কোন কাজই সম্পন্ন হতে পারে না। মহান স্রষ্টার এই মহতী সৃষ্টিকর্ম কোনরূপ উদ্দেশ্য ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে, একথা কল্পনাও করা অসম্ভব।

মানব মনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এই বিশ্বলোকে আমার 'অবস্থানটা' কি? আমি নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টায় এখানে জন্মাইনি। স্রষ্টাই নিজ ইচ্ছা ও শক্তিতে আমাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন? স্রষ্টার সাথে আমার সম্পর্ক কি? তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য কি? পৃথিবীতে আমারই মতো আরও যে অসংখ্য মানুষ বাস করছে, তাদের সঙ্গেই বা আমার সম্পর্ক কি? তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? প্রতিনিয়ত—প্রতিমুহূর্ত অসংখ্য বস্তু-সামগ্রীকে আমি আমার প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করছি; কিন্তু কি মনোভাব নিয়ে, কি পন্থা ও পদ্ধতিতে এবং কি উদ্দেশ্যে আমি এসব ব্যবহার করব? এই দুনিয়ায় সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্যে আমার প্রয়োজন একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের। সেই জীবন বিধান আমাকে কে দেবে? তা কি আমি নিজেই রচনা করব, না দুনিয়ার অন্য কোন মানুষ তা আমাকে রচনা করে দিবে? না দিবেন সেই মহান স্রষ্টা, যিনি নিজ ইচ্ছা ও

১. Huxley : Man in The Modem World. দ্রষ্টব্য

www.amarboi.org

অনুগ্রহে আমাকে এখানে জীবন যাপন করার ও এইসব দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন?

আর তৃতীয় প্রশ্ন হল, মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি কি? মানুষ মরে গেলেই কি তার জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়, না তার পরও জীবনের কোন পর্যায় রয়েছে? থাকলে সেই পর্যায়ে আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের সাথে আমার এই জীবনের কি সম্পর্ক?

এ তিন-তিনটি প্রশ্নই অত্যন্ত মৌলিক। এ প্রশ্নত্রয়ের সুস্পষ্ট জবাবের ওপরই এ দুনিয়ায় মানুষের সুষ্ঠু এই জীবন নির্ভরশীল। এগুলোর জবাব ছাড়া মানুষের জীবন সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। ইতিবাচক হোক কি নেতিবাচক, অস্পষ্ট হোক কি সুস্পষ্ট, সর্বপ্রথম এই প্রশ্নগুলোর জবাব ঠিক করেই সমুখে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। আর সত্যি কথা হচ্ছে, এ প্রশ্নগুলোর নির্ভুল জবাব দিতে পারে একমাত্র ধর্মই। অতএব শিক্ষার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা আছে শুধু তা-ই নয়, ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন যথার্থ শিক্ষার কল্পনাই করা যেতে পারেনা।

বস্তুবাদ মানব-মনের উপরোক্ত তিনটি মৌলিক প্রশ্নের কোনটিরই সঠিক ও নির্ভুল জবাব দিতে পারেনি। তবে প্রশ্নত্রয়ের মধ্যে শুধু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়েই সে মাথা ঘামিয়েছে এবং অন্য দুটি প্রশ্নকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাবে বস্তুবাদ মানুষের মন-মগজ তৈরী করতে চেয়েছে আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। উপস্থিত যা যে রকম রয়েছে, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে মানুষের মানস-প্রবণতাকে এবং একান্তভাবে নির্ভর করেছে মানুষের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি চিন্তাশক্তির ওপর। মানুষ এই দুনিয়ায় আছে এবং দুনিয়ার এসব দ্রব্য-সামগ্রী, শক্তি-সামর্থ্য ও উপকরণাদি ব্যবহার করতে পারছে, বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এটাই যথেষ্ট। কিন্তু সে নিজে কোত্থেকে, কিভাবে, কার অনুগ্রহে এবং কেন এই দুনিয়ায় এসেছে, দুনিয়ার বস্তুসমূহ ভোগ-ব্যবহার করার এই সুযোগ কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে আর এর চূড়ান্ত লক্ষ্যই বা কি? বস্তুবাদ এসব প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে রাখতে চেয়েছে। এসব বিষয়ে নির্ভুল ধারণা দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই সে বোধ করেনি। ফলে এই শিক্ষাকে 'শিক্ষা' না বলে চরম মূর্খতা বলাই সমীচীন।

মানুষের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক শিক্ষা মানুষকে নিতান্ত একটি জীব হিসেবেই গড়ে তুলতে চাইছে। আর জীব-জন্তুর বেলায় কোন নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠতে পারেনা বিধায় মানবীয় শিক্ষাকেও সম্পূর্ণ নৈতিকতা-বিবর্জিত করে রাখা হয়েছে। অথচ মানুষ সম্পর্কে পরম সত্য হচ্ছে, মানুষ নৈতিক জীব—নৈতিকতাই তার আসল সম্পদ। নৈতিক জীব বলেই মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

www.amarboi.org

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

নিশ্চয়ই আমরা মানব সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমরা তাকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবন-উপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৭০)

মানব-সত্তা এক সঙ্গে বস্তুগত ও নির্বস্তুক শক্তির সমন্বয়। একটি ছাড়া অন্যটির বাস্তবতা অসম্ভব— অকল্পণীয়। বস্তুগত দিক দিয়ে মানুষ ও পশুর মধ্যে আকার-আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন আর কোনই পার্থক্য নেই। বস্তুগত বিচারে অন্যান্য জীবের ওপর অধিক কোন মর্যাদাও তার নেই। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সর্বোপরি তার মধ্যে রয়েছে নির্বস্তুক শক্তি 'রূহ'। এদিক দিয়েই সে মানুষ আর এখানেই মানুষের নৈতিকতার প্রশ্ন। অতএব মানুষের এই নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে তার জন্যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই রচনা করা যেতে পারেনা। মানব সত্তায় বস্তু জগতের প্রতিনিধিত্ব করে তার দেহ এবং বস্তু শক্তির প্রতিনিধি হচ্ছে তার মন। এই কারণে শিক্ষাদর্শনে মানসবৃত্তির পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ সাধনের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (Plato) মতে ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মনকে (A sound mind in a sound body) বিকশিত করে তোলা। প্লেটোর মতে, 'মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শুধু শিক্ষার কাজ নয়। মনের মধ্যে সুপ্ত যে গুণগুলো আছে, তার বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।' অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর মতে ঃ শিক্ষার অর্থ মানুষের সহজ বৃত্তিকে, বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোলা, যাতে সে মহত ও সুন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মধ্যেই তার পূর্ণ সুখ নিহিত। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে মানব প্রকৃতির যে আদর্শ, তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে শিক্ষাকে[১]। এই প্রেক্ষিতেই উল্লেখ করতে হয় যে, নিতান্ত বস্তুবাদী শিক্ষা-দার্শনিকরা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

Man is more than a hardworker or a skillful artisan; what is more he has wide duties to discharge and higher aspiration to fullfil'[2]

মানুষ একজন পরিশ্রমী কর্মী বা একজন দক্ষ কারিগরের চেয়েও অনেক বেশী। এর থেকে বড় কথা তাকে বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদন করতে এবং উচ্চতর আশাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

---

১. (Bertrand Russell : On Education, P—19)

2. P, Gisbert; Fundamentals of Sociology, P—220

www.amarboi.org

দার্শনিক ডিউই (Dewey) সেই সব কর্মীদের মনোভাবকে 'অনুদার ও নৈতিকতা-বিরোধী' (Illiberal and Immoral) বলে অভিহিত করেছেন, যারা কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজন পূরণে রোজগার করে। তিনি বলেছেন, জীবনের বৃহত্তর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হওয়া হীন দাসত্বের লক্ষণ।

দার্শনিকদের এসব উক্তিতে যে 'মনে'র কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তার যে অর্থই করুন, সেই মনই যে মানব-সত্তার সার নির্যাস এবং সেই মনের খোরাক জোগানোর জন্যেই যে ধর্মের অপরিহার্য প্রয়োজন, তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা। মনের মধ্যে সুপ্ত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন যে নিছক বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভবপর নয় তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কারিগরিত্বের চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে মানব সত্তা, তা এই ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষ। নৈতিক আদর্শ তথা ধার্মিক জীবন যাপন করাই তার বৃহত্তর কর্তব্য। মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করা এবং পরকালে তাঁর সন্তুষ্টি লাভই যে তার উচ্চতর আশা এবং এ উদ্দেশ্য পূরণার্থে নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করাই যে সে আশা পরিপূরণের একমাত্র উপায়, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বস্তুত মানব মনের পিপাসা অপরিসীম। তার প্রসারতা বিপুল, ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি গভীরতর ও ঐকান্তিক বিশ্বাসমূলক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে মানুষেরই মন। তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা, যাঁর নিকট নিজেকে পুরোপুরি সোপর্দ করে দিয়েই মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে এবং মানবজীবনের চরম ও পরম সাফল্য কেবলমাত্র এই উপায়েই অর্জিত হতে পারে। আর এ জন্যেই মানবীয় শিক্ষায় ধর্মের বিশেষ ভূমিকা অনিবার্যভাবে থাকতে হবে। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষার মৌল প্রেরণা ও উৎসও হতে হবে এই ধর্মকে। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমতের ভিত্তিতেই গড়তে হবে শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা।

কিন্তু এটি কোন ধর্ম? যে ধর্ম মানুষের কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিসরে গ্রহণ করা হচ্ছে, যে ধর্ম মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে একটা নামমাত্র সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ব্যক্তিগতভাবে কিছু পূজা-পাঠের আয়োজন করেই কর্তব্য সমাধা করে, যে ধর্মকে লেনিন 'আফিম' বলে উপহাস করেছে, সেই ধর্ম আমাদের সামনে নেই। সে ধর্মের কথা আমরা এখানে বলছিনা। কেননা সে ধর্মের সাথে শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও থাকার কথা নয়। এ ধরনের ধর্মে 'পাঠ' থাকতে পারে; কিন্তু 'শিক্ষা' থাকবার কোন প্রয়োজন পড়েনা। এই ধরনের ধর্ম মানব মনের মৌল জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতে পারেনা। এখানে বলা হচ্ছে সেই 'ধর্মের' কথা, যা একদিকে স্রষ্টার সঙ্গে এবং অপরদিকে সমগ্র সৃষ্টিলোকের সঙ্গে যুগপৎ মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই সম্পর্ককে বাস্তবভাবে রক্ষা ও লালন করার জন্যে মহান স্রষ্টা সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধান দিয়েছেন।

www.amarboi.org

তাঁর (আল্লাহ্‌র) নাযিল করা দ্বীন-ইসলামই সেই ধর্ম। এই ধর্মই মানব মনের প্রকৃতি-নিহিত ও উপরোদ্ধৃত প্রশ্নত্রয়ের সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে। আমরা বলব, এই ধর্মের ভিত্তিতেই গড়তে হবে মানবীয় শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা। এরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ ধার্মিক হতে পারেনা আর এহেন ধর্মের বাস্তব অনুসারী না হলে মানুষ পারেনা নিছক জীবত্বের পর্যায় থেকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে। তাই যে মানুষ মনুষ্যত্বই পেলনা, তার সম্পর্কে শিক্ষার কথা বলে কোন লাভই হতে পারেনা।

ধর্মের প্রকৃত রূপ

বস্তুত শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেই ধর্ম যা মানব-মনের উপরোদ্ধৃত প্রশ্নত্রয়ের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব দিতে এবং সেই জবাবের মৌল ভিত্তির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রচনা করতে সক্ষম; সেই সঙ্গে বাস্তবভাবে গড়ে তুলতে পারে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন—জীবনের সবদিক ও বিভাগ আর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে উক্ত জবাবের ভিত্তিতে। সর্বোপরি সেই একই জবাবের বলিষ্ঠ ভাবধারা জীবনের সর্বদিকে সংক্রমিত করতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা ও দর্শন এই সামগ্রিকতা হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে মারাত্মক ধরনের একদেশদর্শিতা। এরই ফলে উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য বিশেষজ্ঞের (Specialist); এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে তারই ভিত্তিতে গোটা জীবন-প্রাসাদ রচনা করতে চেয়েছে। ফলে জীবনে দেখা দিয়েছে চরম ভারসাম্যহীনতা। এসব বিশেষজ্ঞ মানব-জীবনের এক একটি দিকই শুধু দেখেছে; জীবনের অন্যান্য সব দিক রয়ে গেছে তাদের চোখের আড়ালে। এক-একজন বিশেষজ্ঞ কেবল নিজের বিষয়টিকেই আবশ্যকীয় জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয় বলে অভিহিত করেছে এবং সেই একটি দিক দিয়েই সমগ্র জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে দাবি করেছে। ফলে জীবনের সব কিছুই হয়ে গেছে আপেক্ষিক। এক্ষণে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, ধর্ম-বিশ্বাস, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সবকিছুই আপেক্ষিক। এ আপেক্ষিক তত্ত্ব-ভিত্তিক সমাজ দর্শন মানুষের জীবনে কোন কল্যাণই আনতে পারেনি; বরং তা জীবনের ভারসাম্যই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। অথচ মানবজীবনে যে মতাদর্শ বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা হচ্ছে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-দর্শন, যাতে বিশ্ব-দর্শন থেকে শুরু করে মানব-প্রকৃতি, নৈতিকতা, সমাজ-জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, মন-মানস সব কিছু সম্পর্কেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে। মানুষের জীবনকে একটা অবিভক্ত ও অবিভাজ্য একক হিসেবে গ্রহণ করা ও বিবেচনা করা হবে। বিংশ শতকে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম সাধারণ জনমনে স্থান পেয়েছিল শুধু এই কারণে যে, সে নিজেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজদর্শন ও জীবনব্যবস্থা হিসেবেই পেশ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়

www.amarboi.org

বিশ্বযুদ্ধের পর তার আবেদন দুর্বল ও আবেগহীন হয়ে পড়েছে শুধু এই কারণে যে, এই সময়ের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত জিঘাংসা সাধারণ্যে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, তা ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-দর্শন নয় আদপেই। কেননা তা মানব-মনের প্রকৃতিনিহিত প্রশ্নত্রয়ের জবাবটি নিতান্ত এলামেল করে নেতিবাচকভাবে দিয়েছে। মানব-প্রকৃতি সে জবাবে কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হতে পারেনি। তাতে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ প্রখ্যাত ইতিহাস-দার্শনিক টয়েনবি'র মতে ঃ The greatest need of our times is a rebirth of the belief in the super-natural—অর্থাৎ 'আমাদের একালের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল অতি-প্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাসের পুনর্জীবন'। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা যে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক রোগে আক্রান্ত ও জর্জরিত তার অধিকাংশই হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি থেকে উদ্ভূত। আধুনিক বিশ্ব চরমভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনায় নিমজ্জিত। এই অবস্থায় একালের বিশ্বমানবের জন্যে একটি বিপ্লবী বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসভিত্তিক জীবন-বিধানের একান্তই আবশ্যক। তাই এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর দেয়া জীবন-বিধান দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী Jung বলেছেন ঃ

> আমি হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছি। সকলের মধ্যেই আমি আল্লাহ ও ধর্মবিশ্বাসের আকুল পিপাসা লক্ষ্য করেছি।

এই কারণে তিনি যে বই লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন Modern Man in Search of Soul—'আধুনিক মানুষ তার আত্মার সন্ধানে আকুল'। একজন দুজন নয়, শত শত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী আজ একই কথা বলছেন। তাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের মানুষকে, যদি মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করবার সুযোগ নিতে হয়, মুসলমানকে যদি বাস করতে হয় প্রকৃত মুসলিম হিসেবে, তাহলে মানুষকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে, যার মাধ্যমে তারা তাদের আত্মাকে ফিরে পাবে। সেই সঙ্গে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস অর্জিত হবে, মানুষ জানতে পারবে মহান আল্লাহ সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্যে কি বিধান দিয়েছেন এবং সেই বিধান পুরামাত্রায় পালন করার ও সামষ্টিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল তাগিদও তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু এরূপ শিক্ষা কে দিতে পারে? বর্তমান দুনিয়ায় 'ধর্ম' নামে পরিচিত খৃস্টান ইয়াহুদী বা হিন্দুধর্ম তা পারেনা; তা দিতে পারে একমাত্র দ্বীন-ইসলাম। এই দ্বীন ভিত্তিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত আজকের মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শুধু হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। তারা এর সন্ধান পাচ্ছে না। এই সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব ইসলামে বিশ্বাসী জন-সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহের। দূর অতীতে এরাই যেমন একদিন বিশ্বের মানুষকে এইরূপ জ্ঞান-আলোকে ধন্য করেছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে

www.amarboi.org

মুক্তি দিয়েছিল তদানীন্তন ইউরোপকে, তেমনি আজকের মানুষকেও বিরাজমান দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া তাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আফসোস! আজকের মুসলিম সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ দুনিয়াকে সেই জ্ঞান-আলোকে উদ্ভাসিত করার পরিবর্তে এক্ষণে নিজেরাই শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতের অন্ধকারে হাতড়ে মরছে।

বিশ্ব-মুসলিমের বর্তমান অবস্থা

পূর্বেই বলেছি, বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান দ্বীন-ইসলাম-ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের বিপুল অংশ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষা লাভ করছে বটে, কিন্তু জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। তারা জানতে পারছেনা ইসলামের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির মূল সূত্রগুলো। দ্বীন-ইসলাম আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-সমস্যার কি সমাধান দেয় ও কিভাবে সমাধান করতে চায়, সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মূর্খ থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে যে সব দেশ বৃটেন, ফ্রান্স বা এই ধরনের কোন খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে, সে সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও গোলামদের উপযোগী রয়ে গেছে, যেমন ছিল তাদের গোলামী যুগে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সে সব দেশে সম্পূর্ণ গায়র-ইসলামী শিক্ষা চালু করেছিল। সে শিক্ষা মানুষকে হয় খৃস্টান বানিয়েছে, না হয় ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী ও নৈতিক চেতনাহীন বানিয়েছে। এখনও তা-ই চলছে।

অপর দিকে বহু মুসলিম দেশ ও জাতি এই আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষাকেও সম্পূর্ণ পরিহার করেছে এবং তারা ইউরোপের নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মবিবর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্বিত চর্বন করছে। এভাবে তারা ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগী ও নৈতিক চরিত্রহীন। এহেন নৈতিকতা-বিবর্জিত বহু মুসলিম দেশ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকার অপচয় করতে বাধ্য হচ্ছে এই কারণে যে, যে সব দায়িত্বশীল কর্মকর্তার ওপর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব অর্পিত, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিপরায়ন বলে তারাই বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগই আত্মসাত করছে। এর ফলে শুধু যে উন্নয়ন প্রকল্পই ব্যর্থ হচ্ছে তা-ই নয় গোটা জাতিই দুর্নীতির গভীর পংকে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির নির্বিচার অনুসরণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের ধর্মশিক্ষা বিবর্জিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যুবক-যুবতীদের জন্যে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং তার ফলে এসব দেশের ভবিষ্যত বংশধররা চরম নৈতিক কদর্যতায় লিপ্ত হয়ে চরিত্রহীনতার ব্যাপক প্রসার ঘটাচ্ছে। অথচ এই সাধারণ বোধটুকুও তাদের হচ্ছে না যে, বিদ্যুৎবাহী তার বাল্‌বের সংযোগস্থলের বাইরে কোন এক স্থানে আবরণমুক্ত হলে ঘরকে আলোকোজ্জ্বল করার পরিবর্তে সেখানে

www.amarboi.org

আগুন জালিয়ে দেবে ও সবকিছু ভস্ম করে ফেলবে। এটা যেমন বিজ্ঞানসম্মত কথা, তেমনি এ-ও অকাট্য যুক্তির কথা যে, বিবাহিত জীবনের বাইরে নারী-পুরুষ বা যুবক-যুবতীর অবাধ মিলনের সুযোগ থাকলে তা গোটা সমাজ ও জাতিকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তা ছাড়া এসব দেশে ছেলে ও মেয়েদের একই রকমের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ফলে নারী ও পুরুষ তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা ভুলে যাচ্ছে। মেয়েরা সেখানে পুরুষালী স্বভাব-চরিত্রের ধারক হয়ে নারীসুলভ কোমলতা হারাচ্ছে।[১] এর ফলে পারিবারিক জীবনে চরম ভাঙন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ নারী ও পুরুষ জন্মগতভাবেই ভিন্ন ধরনের প্রকৃতি ও যোগ্যতা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী হয়ে জন্মলাভ করে। কিন্তু তাদেরকে সেই স্বভাবগত কাজের উপযুক্ত বানাবার মতো শিক্ষা দেয়া হয়না। ফলে একই ধরনের কর্মক্ষেত্রে তথা অফিস-কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষকে একত্রে নিযুক্ত করে নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যার ফলে এসব দেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বহু সংখ্যক মুসলিম দেশেই আজ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় অত্যন্ত প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কুরআন বিজ্ঞানের মৌল উদ্বোধক

একালের মুসলমানদের মধ্যে এই মারাত্মক ভুল ধারণা প্রবল হয়ে আছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ নিতান্তই সংকীর্ণ ধর্মীয় শিক্ষার বাহন মাত্র; তা পড়লে 'মোল্লা' হওয়া যায়, বিজ্ঞানী হওয়া যায়না। এ ধারণা যে কতবড় ভুল তা একথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হার্বার্ট স্পেন্সার-এর ন্যায় বিজ্ঞানী-দার্শনিকও বলেছেন ঃ 'ধর্মই মূলত মানুষকে বস্তুবিজ্ঞান বা প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে'। আর কুরআন মজীদ তো প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা ও অনুধাবনের খোলাখুলি নির্দেশ দিয়েছে। কাজেই কুরআনকে যদি নির্ভুলভাবে ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে লব্ধজ্ঞানের বদৌলতে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী তৈরী হতে পারে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা তানতাবীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ — وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ -

---

১. অধুনা কলেজ-ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে অনেক ছাত্রীকেই ছেলেদের মতো জীনসের প্যান্ট-শার্ট পরে এবং মাথার চুল ছোট করে কেটে যত্র যত্র ঘুরাফিরা করতে দেখা যায়। এ থেকেই সহশিক্ষার পরিণতিটা সহজে উপলব্ধি করা যায়। অথচ রাসূলে করীম (স) এধরনের অনুকরণকে তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন।—সম্পাদক

www.amarboi.org

তুমি কি দেখছ না যে, আল্লাহ্ উর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তার সাহায্যে আমরা নানা বর্ণের ফল-মূল উৎপাদন করছি? পাহাড়গুলোর মধ্যে রয়েছে সাদা, লাল ও গাঢ় কালো বর্ণ। অনুরূপভাবে মানুষ, জীব-জন্তু ও গৃহপালিত পশুগুলোর বর্ণও নানা রকমের। (সূরা ফাতির ঃ ২৭ ও ২৮)

এর পরই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا–

আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্য থেকে কেবল জ্ঞানবান লোকেরাই আল্লাহকে ভয় করে। (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

বস্তুত প্রকৃতি-জ্ঞানই মানুষকে সত্যিকার বিজ্ঞানী বানায়। এই প্রকৃতি জ্ঞানই মানুষকে পানি, গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, ফুল-ফল, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য ও বিভিন্ন বর্ণ ও রঙ সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্য বানায়। আর দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত সম্পর্কে সম্যক অবহিত করতে পারে। স্পেন্সর যে বলেছেন, 'প্রকৃতিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ইবাদত-বিশেষ' তা একবিন্দু মিথ্যা নয়। এই দ্রব্য-গুণ পরিচিতি লাভ করেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতে বাধ্য হয় ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

হে আমাদের রব্ব! তুমি এগুলোর কিছুই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা থেকে পবিত্র। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (আলে-ইমরান ঃ ১৯১)

এই প্রেক্ষিতেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ –

(আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে) এক ঘন্টা চিন্তা গবেষণা করা এক বছর বন্দেগী করার চেয়ে উত্তম।

একদা তিনি ইরশাদ করেন ঃ

আজ রাত্রে আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে লোক সে আয়াতটি পড়লো কিন্তু তাতে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলোনা, সে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ –

www.amarboi.org

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, রাত্র-দিনের আবর্তন এবং জনকল্যাণমূলক দ্রব্যাদিসহ নদী-সমুদ্রে চলমান নৌকা-জাহাজ (এই সবের মধ্যে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ নিহিত)।

হার্বার্ট স্পেন্সরের এই কথাও সত্য যে, 'বিজ্ঞান ধর্মকে শক্তিশালী করে এবং ধর্ম শক্তিশালী করে বিজ্ঞানকে'।

ইমাম গাজ্জালী বলেছেন ঃ ধর্ম হচ্ছে সব রোগের ঔষধ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে খাদ্য। ওষুধ খাদ্য অ-নির্ভর নয়, খাদ্যও নয় ওষুধ অ-নির্ভর।'

কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী হিকমাহ্ (حكمت) শিক্ষা দেয়াও রাসূলে করীমের (স)-এর দায়িত্ব। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ – وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ –

আল্লাহ মুমিন লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন এভাবে যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট আল্লাহ্র নিদর্শনাদি একের পর এক পেশ করছে এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করছে আর সেই সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে কিতাব এবং গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান—যদিও পূর্বে এরা সকলেই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৪)

ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ

وَالْحِكْمَةُ اَصْلُه الْحَقُّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ فَالْحِكْمَةُ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْرِفَةُ الْاَشْيَاءِ وَاِيْجَادِهَا عَلٰى غَايَةِ الْاَحْكَامِ وَمِنَ الْاِنْسَانُ مَعْرِفَةِ الْمَوْجُوْدَاتٍ وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ –

'হিকমত' অর্থ, বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে সঠিকভাবে জানা। অতএব আল্লাহ্র হিকমত বলতে বুঝায় বস্তু সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান ও পরম সুষ্ঠুভাবে দ্রব্যাদির উদ্ভাবন ও উৎপাদন করা। আর মানুষের হিকমত অর্থ, বিশ্বলোকে বিরাজমান দ্রব্যাদি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন এবং সেসবকে কল্যাণময় কাজে প্রয়োগ।

www.amarboi.org

মুসলমানদের দায়িত্ব

মানুষের প্রাথমিক জ্ঞান-উৎস পঞ্চেন্দ্রিয়। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র সৃষ্ট মনই এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানসমূহকে পরস্পর সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে, তারপর এই জ্ঞানসম্পদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং সে সবের সীমা নির্ধারণ ও পরিচিতি প্রকাশ করে, অতঃপর সেগুলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে সাজিয়ে রাখে। তারপর এগুলোর কারণ 'সন্ধান' করে। অতঃপর এ সবের কার্যকরতার (عمل) সাদৃশ্য অনুসন্ধান (تحقيق) করে। শেষ পর্যায়ে যে জ্ঞান মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়, তা-ই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি হল জ্ঞান-মাধ্যম; কিন্তু এই জ্ঞান-মাধ্যমও সর্বোতভাবে নির্ভুল হয়না—নির্ভুল হয়না এর মাধ্যমে পাওয়া বিজ্ঞান-তত্ত্ব। কেবল মহান আল্লাহ্র দেয়া জ্ঞানই হতে পারে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভুল-নির্ভুল পরখের মানদণ্ড। দুঃখের বিষয় সেই মানদণ্ড থেকে আজকের মানুষ বঞ্চিত। দুনিয়ার মুসলমানদের নিকট এই মানদণ্ড যথাযথভাবে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তারা এটিকে উপেক্ষা করে অকেজো করে রেখেছে। নিজেদের নিকট সংরক্ষিত এই মহামূল্য সম্পদকে তারা এক কানা কড়িও মূল্য দেয় না। ফলে তারাও মূল্য-জ্ঞান (Sense of values) হারিয়ে ফেলেছে। এই মূল্য-জ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম সমাজও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবেনা। তাই আজকের মুসলমানদের নিকট এই প্রশ্ন নয় যে, তাদের শিক্ষায় ধর্মের কোন ভূমিকা আছে কিনা বা থাকবে কিনা। তাদের নিকট আজ একটি মাত্র কথা, তাদের ধর্মের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত না করা হলে এই দুনিয়ায় তাদের টিকে থাকাই সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও শূন্যতা দেখে দুনিয়ার মানুষ, বিশেষত চিন্তাশীল মুসলমানরা হাহাকার করে উঠছে, তার পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র দ্বীন-ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এই শিক্ষা হতে হবে একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায় অবধি। কেননা ছোট বয়স থেকেই দ্বীন-ভিত্তিক শিক্ষা না দিলে বড় হয়ে দ্বীন-ভিত্তিক শিক্ষার কোন গুরুত্বই শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবে না। বস্তুত আমরা যদি চাই আমাদের পরবর্তী বংশধররাও দ্বীনদার হোক, দ্বীনী যিন্দেগী যাপনকারী মুসলিম রূপে গড়ে ওঠা অব্যাহত থাকুক, তাহলে এ ছাড়া কোন উপায় হতে পারেনা। কেননা ঃ

اَلْعِلْمُ فِى الصِّغْرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ-

অতএব মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীন-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিশেষভাবে নিজেদের জনগণকে এবং সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।

সাধারণত বিজ্ঞান ও নৈতিকতাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী জিনিস মনে করা হয়। বলা হয়, নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণকে উন্নত করতে পারে বটে;

www.amarboi.org

কিন্তু এ্যাটম (আণবিক) বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পারেনা। বর্তমান এ্যাটমিক (আণবিক) যুগে এ্যাটম বোমার প্রয়োজন, নৈতিকতার নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা বর্ষণকারী বিমানের প্রয়োজন। নৈতিকতা তার প্রতিরোধ করতে পারেনা।

কিন্তু এ ধারণা ভিত্তিহীন। এ্যাটম যদি শক্তি হয়, তা হলে নৈতিকতাও একটি শক্তি। তবে এর মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রভাবশালী, তা নির্ভর করে এক ।ার ওপর যে, এ দুটির মাঝে কোনটি স্থায়ী মূল্যমানের অধিকারী আর কোন্‌টি ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষণস্থায়ী ও পরিবেশসৃষ্ট। আণবিক বোমার কথা শুনলেই ভয়ের সঞ্চার হয়; কিন্তু নৈতিকতার শক্তিকে অনুভব ও পরিমাপ করা হয়না। আসলে নৈতিকতাই এ্যাটম বোমা নির্মাণকারী ও বিস্ফোণকারীদেরকে বদলে দিতে পারে। যে হিংস্র মনোভাব হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে, নৈতিকতা সেই মনোভাবকেই নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের মনোভাব বদলে দাও—এ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, অন্তত তা মানব-বিধ্বংসী কর্মে ব্যবহৃত হবে না। বস্তুত নাস্তিকতা ও অনৈতিকতাই বিজ্ঞানের এই উন্নতি সাধন করে দেয়নি, এ্যাটমিক বোমাও বানিয়ে দেয়নি, বিজ্ঞানের এই উন্নতি ও, অগ্রগতি মূলত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বাভাবিক গতিরই পরিণতি। তবে বিজ্ঞানকে মানব বিধ্বংসী কাজে ব্যবহার একান্তই ধর্মহীন ও নৈতিকতাহীন বিজ্ঞান চর্চার অনিবার্য পরিণতি।

নৈতিকতা এ্যাটম বোমা বানাতে পারে কিনা, প্রশ্ন তা নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, নৈতিক শিক্ষা এ্যাটম বোমা নির্মাণকারীদের আল্লাহ্‌নুগত বানাতে পারে কিনা? নৈতিক শিক্ষা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেই মানব-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, এতে কি কোন সন্দেহ আছে?[১] এ্যাটম বোমা আদৌ নির্মাণ করা হবে কিনা সে প্রশ্ন না তুলে আমি বলব, এ্যাটমও বিশ্বপ্রকৃতি নিহিত একটি শক্তি। তা মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও জীবন-মান উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে না কেন? যদি তা করতে হয়, তাহলে নৈতিক চেতনা-উদ্বোধক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। বস্তুগত ও প্রকৃতি-নিহিত শক্তিসমূহকে বানাতে হবে আল্লাহর বান্দাহ ও আনুগত। শরী'আতের কানুন (Ethical law) হচ্ছে আল্লাহর কথা আর প্রাকৃতিক বিধান (Natural law) আল্লাহ্‌র কাজ (فعل)। আমরা মুসলমানরা যদি আল্লাহ্‌র কথাকে গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আল্লাহ্‌র 'কাজ'টাকে গ্রহণ করতে আমরা কুণ্ঠিত হবো কেন? যারা আল্লাহ্‌র কথাকে বুঝেছে, তাদেরই তো উচিত আল্লাহ্‌র কাজকেও অনুধাবন করা আর তা কার্যত সম্ভবপর হতে পারে দ্বীন-ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে। তারই ফলে সম্ভব হবে আল্লাহ্‌র দেয়া যাবতীয় শক্তি ও সম্পদকে সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে

---

১. নৈতিক শিক্ষা ছাড়া এ্যাটম বোমা তৈরী করা কিংবা আনবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার পরিণাম কত ভয়াবহ, ১৯৪৫ সানে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় মার্কিনীদের আনবিক ধ্বংসলীলাই তার আকাট্য প্রমাণ।—সম্পাদক

www.amarboi.org

হবে, যার ফলে তৈরী হবে দ্বীন-বিশ্বাসী দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, চিকিৎসাবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিল্পোক্তা, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি, লেখক তথা জাতীয় জীবনের সর্বদিকের প্রয়োজনীয় ও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। দ্বীন-ভিত্তিক ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে অবিলম্বে এধরনের লোক তৈরীর কাজ শুরু না করা হলে আমার খুবই আশংকা হচ্ছে, সেদিন দূরে নয়, যখন আধুনিক মানুষ ইসলামকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

এ একটি কঠিন ও দুরূহ কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সঠিক পন্থায় গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই কাজে অগ্রসর হলে এবং সব কটি ইসলামী দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রবর্তন করা হলে ব্যর্থতার কোন আশংকা আছে বলে আমি মনে করিনা।

www.amarboi.org

শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামের শিক্ষা দর্শন বা শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা বা দৃষ্টিকোণ কি, তার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে প্রথমেই মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ও দৃষ্টিকোণকে মৌলিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। এ পর্যায়ে আমার বক্তব্য হল ঃ

মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য জীবজন্তু ও বস্তুর ন্যায় একটি সৃষ্টি হলেও সে একটা বিশেষ সৃষ্টি। জন্ম, বৃদ্ধি, (Growth) খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান গ্রহণ করে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার দিক দিয়ে মানুষ অন্যান্য জীবের মতো হলেও সে ঐ সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অধিকারী। মানুষ মাটি বা প্রস্তরের ন্যায় নির্জীব, নিষ্প্রাণ বা স্থবির নয়। মানুষ প্রাণবান, সচেতন ও চলৎশক্তিসম্পন্নও বটে। এখানেই শেষ নয়, সাধারণ জীব-জন্তু ও প্রাণীকুল থেকে মানুষ এই দিক দিয়েও ভিন্নতর যে, মানুষের রয়েছে চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি ও বাকশক্তি—আছে মনের কথা প্রকাশ করার ভাষা। সে ভাষা যেমন মুখে ব্যবহৃত হয়, তেমনি হয় লেখনীর দ্বারা। এই কারণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্ন কেবল মানুষের বেলায়ই আসে, অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তেমন প্রশ্ন ওঠতেই পারে না। সর্বোপরি মানুষের রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্য বোধ। এই বোধ মানুষের স্বভাবগত—জন্মগত। কিন্তু সাধারণ জীব-জন্তু এই বোধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

মানুষের চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে। এ কারণেই তার মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে কঠিন জিজ্ঞাসা—নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বলোক সম্পর্কে।

বিশ্বলোক সম্পর্কিত প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশ্বলোক কি কোন বাস্তব সত্য, না সম্পূর্ণ অলীক ও অস্তিত্বহীন ছায়ামাত্র? যদি সত্য ও বাস্তব হয়, তাহলে এই বিশ্বলোক কি স্বয়ম্ভু, না এর কোন স্রষ্টা আছে ঃ স্রষ্টা থাকলে সে কি এক ও অনন্য, না একাধিক—বহুসংখ্যক? এবং স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কই-বা কি?

মানুষের নিজের সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন জাগে, তা মোটামুটি তিন পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের প্রশ্ন তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে—সে কে? সে কি দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তু-বস্তুর মতই কিছু, না ঐ সব থেকে তার কোন স্বাতন্ত্র্য আছে? সে নিজের বিবেচনায়ই যখন সর্বক্ষেত্রে নিজের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখতে পায়, তখন এর কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুনিয়ায়

www.amarboi.org

তাকে যে জীবন দেয়া হয়েছে, সেই জীবনটাকে সে কোন কাজে, কোন ক্ষেত্রে এবং কিভাবে ও কি পদ্ধতিতে অতিবাহিত করবে? তার আশে-পাশে অবস্থিত অসীম ও অশেষ প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদ ও উপকরণকে নিজের ও অন্যান্য মানুষের কল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করবে? কোন্ অধিকারে ও কোন্ মৌল দৃষ্টিকোণ নিয়ে এবং কোন উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যবহার করবে? আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তার জীবনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কি এই দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে যাবে? না মৃত্যুর পরও তার কোন জের চলবে? যদি তা চলেই তাহলে তার সাথে এই জীবনের ও জীবনব্যাপী কর্মধারার কি সম্পর্ক? বস্তুত এ সব প্রশ্ন কোন জীব-জন্তুর মনে জাগে না। তাদের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন কখনই ওঠে না। তাই তাদের প্রসঙ্গে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। এই সব প্রশ্ন জাগে কেবল মানুষের মনে—মানুষের ক্ষেত্রে। অতএব, মানুষের পক্ষে এই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া একান্তই অপরিহার্য। কেননা এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব না পেলে এই দুনিয়ায় মানুষের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এসব প্রশ্ন মানব মন থেকে কখনই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। মানুষ যতদিন 'মানুষ' থাকছে এই প্রশ্নসমূহ ততদিন তার মনে চির-জাগরুক হয়েই থাকবে।

কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ কোথায় পাবে? এ জবাব সে পেতে পারে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অতএব, জ্ঞানার্জন মানুষের জন্যে অপরিহার্য। জ্ঞানার্জনের জন্যে যে যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তা স্বভাবগতভাবে কেবল মানুষেরই রয়েছে। মানব-প্রকৃতি নিহিত সেই যোগ্যতাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে হবে এই জ্ঞান অর্জনের জন্যে।

এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, মানুষকে মৌলিকভাবে জানতে হবে ঃ

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্মের নিয়ম-ধারা এবং সৃষ্টিলোকে সদা কার্যকর নিয়মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষত্ব।

২. বিশ্বলোক ও বিশ্বলৌকিক বস্তুনিচয়ের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব এবং মানুষের কল্যাণে সে সবের প্রয়োগের নির্ভুল পদ্ধতি।

৩. এ দুনিয়ায় মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, জীবন যাপন পদ্ধতি এবং পরকালীন জবাবদিহির ধারণা ও পরিণাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা যায়

স্রষ্টার (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলীর তত্ত্ব ও বাস্তবতা, বিশ্বলোকে সদা কার্যকর নিয়ম, বস্তুর গুণাবলী ও মানুষের কল্যাণে তার প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং সর্বোপরি নিজের বিশেষত্ব, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং জবাবদিহি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন যেন তার মন-মগজও জীবন-স্রষ্টার অনুগত এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত হতে পারে; কেননা, তার শেষ পরিণতি তাতেই।

www.amarboi.org

বস্তুত যে মানুষ স্রষ্টাকে জানেনা—জানেনা তাঁর মহান গুণাবলী, তার অসীম ও অসাধারণ অনুগ্রহের অবদান, সে মূলত কিছুই জানে না; কেননা সব জ্ঞানের মূল এখানেই নিহিত। যে লোক তার নিজের জীবন-যাপন-পদ্ধতি ও ভাল-মন্দ জানে না, জানেনা তার পরিণতি কি হতে পারে ও শুভ পরিণতি লাভ কিভাবে সম্ভব, সেতো সম্পূর্ণ অন্ধ ও অজ্ঞ। আর অন্ধ ও অজ্ঞ কখনো দৃষ্টিমানের মতো হতে পারে না।

অন্ধত্ব ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষের জীবন কিছুতেই চলতে পারে না। সাধারণভাবে প্রতিটি জীব-জন্তুর চোখে একটা নিজস্ব আলো আছে। তার সাহায্যে তারা অন্ধকারেও নিজেদের পথ দেখে চলতে পারে। এজন্যে তারা বাইরের আলোর মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু মানুষের চোখে নিজস্ব কোন আলো নেই। এ কারণে দেখার জন্যে সে বাইরের আলোর মুখাপেক্ষী। কিন্তু বাইরের আলো তার বৈষয়িক জীবন-পথে চলার জন্যে যথেষ্ট হলেও মানবোপযোগী জীবন যাপনের জন্যে তা কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। মানুষের জন্যে প্রয়োজন অর্জিত জ্ঞানের প্রোজ্জল আলো। এ আলোই তাকে অর্জন করতে হবে—অর্জন করতে হবে একমাত্র নির্ভুল ও সর্বপ্রকার সংশয়মুক্ত সূত্রে। অর্জনযোগ্য এ জ্ঞানের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে ঃ

মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, তার স্রষ্টাকে জানা—স্রষ্টা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন। স্রষ্টাই স্বীয় অনুগ্রহে এবং স্বীয় ইচ্ছা ও কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এ জীবন লাভ করা—এ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের সুযোগ পাওয়াই সম্ভবপর হতো না। তাই স্রষ্টার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও দয়া-অনুগ্রহের কথা তাকে জানতে হবে। জানতে হবে, তিনি কোন্ মহান উদ্দেশ্যে এ দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং কিসে তিনি সন্তুষ্ট আর কিসে অসন্তুষ্ট। তা জানতে না পারলে মানুষের পক্ষে এ দুনিয়ায় স্রষ্টার মর্জী অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হবেনা—সম্ভব হবে না পরকালে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। আর তা-ই যদি না হয়, তাহলে মানুষের এ জীবনটাই যেমন চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে তাকে অনন্ত দুঃখ, দুর্দশা ও আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। তা থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। তাই স্রষ্টা সংক্রান্ত এই জ্ঞান লাভ করতে হবে মানুষের প্রতি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান পবিত্র কুরআন মজীদ থেকে, যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর। তিনি স্রষ্টার নির্দেশে তাঁর এই মহাগ্রন্থকে দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন এবং নিজে তদনুযায়ী আমল করে তার বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছেন। কুরআন এবং রাসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই হচ্ছে স্রষ্টা-প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যম ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস। এই জ্ঞান-মাধ্যম ও জ্ঞান-উৎস থেকেই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে জানতে পারে—জানতে পারে কিভাবে তাকে একক ও সামষ্টিক জীবন যাপন করতে হবে। বিশ্বলোক নিহিত জ্ঞান লাভের মৌল প্রেরণাও সে এ থেকেই পেতে পারে। কেননা স্রষ্টা, সৃষ্টিলোক এবং মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান

www.amarboi.org

কেবলমাত্র স্রষ্টারই থাকতে পারে। তাই তাঁর দেয়া জ্ঞানের তুলনায় অপর কোন উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান কখনই অধিক নির্ভুল, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদর্শনে কেবলমাত্র বিশ্বলোক ও বস্তু-জগত সংক্রান্ত জ্ঞানকেই একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয় বলে দাবি করা হয়েছে। তাতে মহান স্রষ্টাকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি তাঁর দেয়া নির্ভুল জ্ঞান-উৎসকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এই জ্ঞানের প্রথম সূত্র হচ্ছে, মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার ফসল। অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত নিতান্তই বাহ্যিক জগত। আসল ও প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে। সেই অন্তরালবর্তী নিগূঢ় সত্যের ভিত্তিতেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব। আর সে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন আর কারোরই থাকতে পারেনা। ফলে নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-উৎসের ওপর নির্ভরশীল মানুষ প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে। সে যা কিছু জানে, তা ভুলভাবে জানে। এ কারণেই বিশ্বলোক সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের পক্ষে যতটা কল্যাণকর হতে পারতো, তা হয়নি; বরং সে জ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বকে নানাভাবে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত করেছে। স্রষ্টাহীন বস্তু-জ্ঞান মানুষকে বৈষয়িক সুখ-শান্তি অনেক দিয়েছে; কিন্তু এই জ্ঞানই একদিকে যেমন মানুষকে ধ্বংস করার সামগ্রী রচনা করেছে, তেমনি তাকে নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম শূণ্যতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই জ্ঞান মানুষকে বুঝিয়েছে যে, মানুষও অন্যান্য জীব-জন্তুর মতোই একটা জীবমাত্র। বস্তুগত সুখ-শান্তিই তার একমাত্র কাম্য আর এই বস্তুগত জীবন ভিন্ন তার এমন কোন জীবন নেই, যেখানে তার কারোর নিকট জবাবদিহি করতে হতে পারে। কিন্তু এ ধারণা যেমন নিছক ইন্দ্রিয়লব্ধ, তেমনি বস্তুর সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতেও একান্তভাবে ভুল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাস্তিক্যবাদকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে এবং এই সত্য অনস্বীকার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বিশ্বলোকের অন্তরালে এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অপরিহার্য; তাছাড়া এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই সৃষ্টিকর্তা যেমন সব কিছুর নিয়ামক, তেমনি সমস্ত বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানের উৎসও একমাত্র তিনিই।

মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ইউনিট। একে নানাভাবে খণ্ড-ছিন্ন করে নানা বিধি-ব্যবস্থার অধীন করার অবকাশ নেই। তাই জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে এক অবিভাজ্য এককের অংশ হিসেবে সমান গুরুত্ব সহকারে ও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে যাপন করতে হবে। মানুষ বস্তু ও রূহের সমন্বয়ে গঠিত; অতএব তার যেমন বস্তুগত চাহিদা আছে, তেমনি আছে রূহ বা আত্মার চাহিদা— যা পূরণ করতে হয়, আল্লাহ-বিশ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস ও পরকাল-বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কাজের মাধ্যমে। বাহ্যত দেহের চাহিদা প্রবল হলেও মানব সত্ত্বার ওপর আসল কর্তৃত্ব হচ্ছে রূহ বা আত্মার। তাই আত্মার দাবি পূরণের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তার দেহের চাহিদা পূরণ করতে হবে। আত্মা এবং দেহের চাহিদা পূরণে যেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি আবশ্যক

www.amarboi.org

ভারসাম্য রক্ষা করাও। এ দুয়ের মধ্যে বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব মানব জীবনের জন্য মারাত্মক। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ সমন্বিত। পরকালের কথা বিস্মৃত হয়ে বা তার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত তা মানুষের অখণ্ড ও অবিভাজ্য জীবনের পক্ষে কল্যাণময় হতে পারে না । কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

(হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের এই দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও। আর তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা ঃ ২০১)

কেননা এ জগতে দেহ ভিন্ন আত্মা অবাস্তব আর আত্মাবিহীন দেহ মৃত লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই মানুষকে এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যার ফলে সে দেহ ও আত্মার তথা ইহকাল ও পরকালের দাবি একই সঙ্গে ও পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে পূরণ করতে সক্ষম হবে। অতএব আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান ও পরকালীন কল্যাণের উপায় যেমন তাকে জানতে হবে, তেমনিভাবে জানতে হবে আল্লাহ্‌র দেয়া দ্রব্য-সামগ্রীর গুণাবলী ও ব্যবহার পদ্ধতি, যেন মানুষের বৈষয়িক জীবন সামগ্রিকভাবে নির্ভুল পথে চালিত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে অতিবাহিত হতে পারে।

মানুষ একাকী দুনিয়ায় জন্মলাভ করতে পারেনি, একাকী বেঁচে থাকাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। একারণেই মানুষকে বলা হয়েছে সামাজিক জীব। মানুষের এই সামাজিক জীবন শুরু হয় তার জন্মের সূচনা থেকেই। প্রথমত পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে তার জন্ম হয়। এই পিতা ও মাতার দাম্পত্য জীবন সূচিত হয় শরী'আতসম্মত বিবাহ ও সামাজিক সমর্থনের মাধ্যমে। জন্ম লাভের পর তাকে লালিত-পালিত ও ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে হয় পিতৃ-আশ্রয়ে, মায়ের কোলে এবং ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফী ও দাদা-দাদীর পরিবেষ্টনে। এখানেই মানুষের পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ সূচিত হয়। অতএব একদিকে পিতা-মাতার হক তাকে জানতে হবে, সেই সঙ্গে জানতে হবে অন্যান্য নিকট ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের অধিকার এবং তাদের প্রতি তার কর্তব্যের কথা।

এ হচ্ছে মানুষের সামাজিক জীবনের প্রথম ধাপ। এরপর তার সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশ বিস্তার লাভ করে তা স্থানীয় জনমণ্ডলীকে অতিক্রম করে যে দেশে সে বাস করে সেই দেশের বিপুল জনতার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। মানব জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই এই বিপুল জনতা-সমন্বিত বৃহত্তর সমাজের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই সামাজিক সম্পর্কের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন।

www.amarboi.org

মানুষ যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অধীনে নিরাপদে জীবন যাপন করে তা এই সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাহায্যেই অর্জন করা সম্ভবপর। মানুষ যে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বৈষয়িক সুখ-সুবিধা ও আয়েশ-আরাম ভোগ করে, তা একদিকে যেমন এই বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থা থেকে অর্জন করে, তেমনি সেই অর্থ-ব্যবস্থা এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই মানুষকে জানতে হবে বৃহত্তর সমাজের সাথে তার কি সম্পর্ক, সমাজের ওপর তার কি অধিকার এবং সমাজের প্রতি তার কি কর্তব্য ও দায়িত্ব। অনুরূপভাবে তাকে জানতে হবে কোন্ ধরনের রাষ্ট্রনীতি তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা দিতে সক্ষম। কেননা দুনিয়ায় এমন সব রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে যা মানুষের মৌল অধিকারগুলো হরণ করে তাকে নিতান্ত গোলাম বানিয়ে রেখেছে, তাকে পরিণত করেছে বল্গাহীন পশুতে কিংবা নির্বাক জন্তুতে। সাধারণ মানুষকে কথা বলার, মত প্রকাশ করার, ভাল-মন্দ বিচার করার কিংবা সরকারী কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার কোন অধিকারই দেয় না। এইরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে খুবই অপমানকর। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় এমন অর্থ-ব্যবস্থাও রয়েছে যা সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা অধিকার স্বীকার করে না। তা সমাজ-সমষ্টির দোহাই দিয়ে মানুষের সবকিছু কেড়ে নেয়; তার স্বতন্ত্র মানবিক সত্তাকেও অস্বীকার করে। মানুষ সেখানে নিজের জন্যে অর্থোপার্জনের কোন পন্থা নিজেই বাছাই করে নিতে পারে না। অর্থ ও রাষ্ট্র এই উভয় শক্তিরই একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে মুষ্টিমেয় নরপিশাচ। তারা দেশের মানুষকে এমনভাবে দমিয়ে রাখে এবং নিয়ন্ত্রিত করে যেন তারা বিরাট একটা যন্ত্রের অংশমাত্র কিংবা নির্জীব কাঁচামাল বিশেষ। এরূপ অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে নিতান্ত জীব-জন্তুতে পরিণত হয়। কাজেই মানুষকে এই বিশ্বের বুকে তার জন্যে ঘোষিত মর্যাদার দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে মানুষের সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে সুষ্ঠু বৈষয়িক জীবন গঠন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে সেই জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা লাভ করতে হবে।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই সব দিক দিয়েই মানুষকে সুশিক্ষিত ও সৎকর্মশীল বানাতে পারে মানুষের জন্যে কেবলমাত্র সে শিক্ষা ব্যবস্থাই সর্বাত্মক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে কেবলমাত্র তা-ই, যা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব পবিত্র কুরআনের সার্বিক দর্শনের ভিত্তিতে রচিত।

বড়ই দুঃখের বিষয়, সাধারণভাবে গোটা বিশ্ব-সমাজে ও বিশেষভাবে গোটা মুসলিম জাহানে এই কুরআন-ভিত্তিক সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। সারা দুনিয়ায় বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ও কার্যকর তা থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের স্রষ্টাকে, তাঁর অশেষ অবদানকে এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ককে নির্ভুলভাবে চিনতে পারেনা—নিজের উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও জানতে পারে না। সে জানতে

www.amarboi.org

পারে এটুকু যে, মানুষ সাধারণ জীব-জন্তু থেকে ভিন্নতর কোন বিশেষ সত্তা নয়—জানতে পারে, কিভাবে, কি উপায়ে ও কি পদ্ধতিতে এ বিশ্বের পরতে পরতে সঞ্চিত উপকরণাদি নিঃশেষে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের জৈব সুখ-সম্ভোগের আয়োজন করা সম্ভব। কিন্তু এ জানা-ই মানুষের উপযোগী জানা নয়। এ জানা কেবলমাত্র জীব-জন্তুর জন্যেই শোভন। তাই বর্তমান মুসলিম জাহানের প্রধান কর্তব্য ছিল কেবলমাত্র কুরআন-ভিত্তিক সর্বাত্মক শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ও সর্বস্তরে চালু করা। কিন্তু মুসলমানরাও এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণত বা অংশত পরিহার করে ধর্মহীন ব্যক্তিদের রচিত ও তাদের দ্বারা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করে চলেছে। ফলে তাদের বংশধররা মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না; বরং ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও এ শিক্ষা অর্জন করে একই সাথে ঈমান ও চরিত্র উভয়ই হারিয়ে ফেলে। এরফলে ভবিষ্যতে 'মুসলিম জাতি' দুনিয়ায় সসম্মানে বেঁচে থাকবে কিনা, সে প্রশ্নই এখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

www.amarboi.org

ইসলামের শিক্ষা-দর্শন

১৯৫১ সানের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা মিঃ উড (Mr. Wood) বিশ্ব-পর্যটন ব্যপদেশে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচী আগমন করেন। এ সময় তিনি নগরীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শিক্ষা' (Education) বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শেষে তাঁর নিকট প্রশ্ন করা হয় ঃ ইংলণ্ডের সামনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এবং আপনার দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ ও সফল জীবনের ধারণা (Conception) ও লক্ষ্য কি, যা সামনে রেখে ও যা অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনি বর্তমান বংশধরদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন?

এর জবাবে সুযোগ্য বক্তা প্রথমে তো নিজ জাতির বৈষয়িক ও বস্তুগত উন্নতি সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করলেন। পরে তিনি বললেন ঃ 'আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষাবিদ এই মত পোষণ করেন যে, বালক-বালিকাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রাধান্য থাকা উচিত নয়; বরং তাদেরকে অবাধে ও পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে লালন-পালন ও ক্রমবিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া উচিত। বস্তুত তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কথায় কোন মৌলিক তারতম্য নেই। কেননা, বাচ্চাদের সবচাইতে বড় শিক্ষক হচ্ছে তাদের পরিবেশ, যা সব সময়ই তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে।

কেবল মিঃ উড্ (কাষ্ঠ)-এর কথাই নয়, অন্য কোন দেশের Iron (লৌহ) কিংবা Steel (ইস্পাত)-ও যদি হতো, তবু তাদের কাছ থেকেও এই একই ধরনের জবাবই পাওয়া যেত। ইউরোপ, আমেরিকা, জাতিসংঘ প্রভৃতি দেশ ও সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের রচিত গ্রন্থাবলী এবং সে সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহ এই মতের বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। আর এসব শিক্ষাব্যবস্থার অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূলগত দিক দিয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কতিপয় প্রাথমিক সূত্র (Formula) ও মৌলনীতি (Fundamental Principles)-ই পাশ্চাত্য দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ ভিত্তি (common basis)। পাশ্চাত্য দেশসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত এসব প্রাথমিক সূত্র ও মৌলনীতির পর্যালোচনা ও যাচাই করার পূর্বে নীতিগতভাবে একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মহাসত্য এবং শিক্ষার মূলনীতি ও মতাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

শিক্ষা-দর্শন ও জীবন-দর্শন

বস্তুত শিক্ষা ও জীবন এক অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য সত্য। এর একটিকে অন্যটি থেকে

www.amarboi.org

বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে চিন্তা ও বিবেচনা করা সম্ভবপর নয়। একটি জাতির শিক্ষা সংক্রান্ত মতার্দশ ও মূলনীতি তা-ই, যা তার জাতীয় জীবন-দর্শন ও জাতীয় জীবন-আদর্শ। জীবন-দর্শন এবং শিক্ষা-দর্শন এ দুটিই মূলের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-পারদর্শীদের শিক্ষা-সম্পর্কিত মত-পার্থক্য মূলত জীবন-দর্শনেরই পার্থক্য। জীবন-দর্শন বিভিন্ন হওয়ার কারণেই শিক্ষা-দর্শনও বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী হতে বাধ্য। প্রত্যেক জাতিই শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে সে পন্থা ও পদ্ধতিতে, যা তার জীবনাদর্শ ও জীবন-লক্ষ্য বাস্তবায়নের অনুকূল এবং পরিপূরক। যে পথে চলে শিক্ষার্থীর জীবন তাদের জাতীয় লক্ষ্যের দৃষ্টিতে সফল ও চরিতার্থ হতে পারে, সেই পথটিই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত পথ ও পন্থা। কাজেই যে-জাতির জীবন-লক্ষ্য নিছক বৈষয়িক বা বস্তুগত এই নশ্বর জীবনের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিধানই যাদের উদ্দেশ্য, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্য-বিষয় এবং শিক্ষ্যার্থী, শিক্ষাদাতা, শিক্ষালয় ও শিক্ষার পরিবেশ ঠিক তা-ই হবে, যা তাদের এ দৃষ্টিকোণকে চরিতার্থ ও পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে যে-জাতির দৃষ্টিতে এই জীবনটা লক্ষ্যপথের একটা মনযিল ও স্তর মাত্র এবং অবিনশ্বর ও চিরন্তন জীবনের সাফল্য ও সার্থকতাই যাদের চরম লক্ষ্য, তাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতি এমন ভঙ্গিতে তৈরী হতে হবে, যার সামান্য পর্যবেক্ষণেও পরকালীন লক্ষ্যাদর্শ ও উদ্দেশ্যপরায়ণতা অনুভূত হতে পারবে। অনুরূপভাবে যে-জাতির লক্ষ্য শুধু দৈহিক ও মানসিক শক্তিনিচয়ের উন্নতি ও পূর্ণত্ব বিধান, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনুরূপ দৃষ্টিকোণেরই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে। জাতীয়তাবাদী কিংবা দেশমাতৃকাবাদী, বস্তুবাদী কিংবা বৈরাগ্যবাদী—যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেক জাতিই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং এ সব ব্যবস্থায়ই তাদের জীবন-দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে। তাদের জীবন-দর্শন কি—তা ভালো কি মন্দ, ত্রুটিপূর্ণ কি নিখুঁত যা-ই হোক না কেন—এসব ব্যবস্থাপনাই হয় তার নির্মল দর্পন বিশেষ। এ দর্পনে তার সব কিছু প্রতিবিম্বিত হয় এবং তা দেখে তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত একদৃষ্টিতে দেখে নেয়া ও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা খুবই সহজ।

জীবন-লক্ষ্যের বাস্তবতা ও গুরুত্ব

এক কথায়, মানুষের বাস্তব ভূমিকা এবং তার ইচ্ছামূলক কার্যক্রমের পথ ও পন্থা থেকেই সুনির্দিষ্ট হয় তার জীবন-লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ।

বস্তুত শিক্ষা জীবনের জন্যে প্রস্তুতি-বিশেষ—জীবনের প্রস্তুতিরই অপর নাম শিক্ষা। এ বিষয়ে দুনিয়ার সব শিক্ষাবিদই সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এই জীবনটার উদ্দেশ্য কি, কোন্ কাজে ও তৎপরতায় নিয়োজিত হবে এই জীবনটা? .....এ প্রশ্নের জবাব খুজলে দেখা যাবে যে, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা নিয়েই দুনিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে

www.amarboi.org

আকাশ-পাতালের মত-বৈষম্য। এই মত-বৈষম্য সত্ত্বেও জীবন-উদ্দেশ্যের অবিচল প্রত্যয় অনুযায়ীই সাধিত হয় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয়াবেগের প্রশিক্ষণ এবং চিন্তা-বিশ্বাস ও মতামতের লালন ও বিকাশ। এই হৃদয়াবেগ ও চিন্তা-চেতনা থেকেই বাস্তব কর্মগত ভূমিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। এই মানস-প্রকৃতি ও মানস-পরিবেশই মূলত মানুষের সমগ্র চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়াবেগের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু এবং তার সমস্ত কর্মতৎপরতা ও গতিবিধির উৎসমুখ। হাদীস শরীফে এ মর্মস্থলের নাম দেয়া হয়েছে 'ক্বলব্' (قلب) বা হৃদয়-মন। হাদীস অনুযায়ী মানুষের সমস্ত কর্মতৎপরতার যথার্থতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এরই সুস্থতা ও রুগ্নতার ওপর নির্ভরশীল। হাদীসের ভাষা হল ঃ

الا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ الا وَهِىَ الْقَلْبُ (بخارى، مسلم)

জেনে রাখ, মানবদেহে এমন একটা মাংসপিণ্ড বর্তমান, যা সুস্থ হলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকে। আর তা রোগাক্রান্ত হলে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তা হল হৃদয় বা অন্তর।

মানুষের বাস্তব কর্মতৎপরতায় তার মানসিক অবস্থা, অন্তর্গত ভাবধারা ও মৌল বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের প্রভাব কতটা এবং বাস্তব কর্মের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কতখানি, মনোবিজ্ঞানীরা তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা, তা মানবীয় শক্তিসামর্থের পথিকৃৎ শুধু নয়, তা মানুষের শাসক ও নিয়ন্ত্রকও। মানুষ তারই নির্দেশ বাস্তবায়নে ও পরিপূরণে নিজের ধন-সম্পদ ও সর্বাধিক প্রিয় জিনিস নিজের জীবনটাও অকাতরোক বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়ার কঠোরতম সমাজ ব্যবস্থায়ও এসব চুম্বক শক্তিই অধিক সক্রিয় হয়ে থাকে। কমিউনিজম কিংবা সমাজতন্ত্র—সকল ক্ষেত্রেই হৃদয় মনের গভীরতর গহনে লুক্কায়িত এসব ভাবধারার হাতেই থাকে সমস্ত কর্তৃত্ব নিবদ্ধ। এগুলোই জাতির প্রকৃত নেতা—তার চালিকাশক্তি। জাতীয় নেতৃত্ব সুপথগামী হলে গোটা জাতিই নির্ভুল পথযাত্রী হবে আর তা যদি ভ্রান্ত পথের পথিক হয়, তাহলে জাতির প্রতিটি মানুষই ভুলপন্থী হবে। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, জাতিতে ও গোত্রে বিরাজমান পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মূলত জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনাদর্শের বিভিন্নতারই সংঘাত। এক ব্যক্তি বা একটি দলের দৃঢ়তা ও স্থিতি এ চুম্বক শক্তির ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর এ শক্তির দুর্বলতা হচ্ছে এক ব্যক্তি, একটি দল ও একটি জাতির ধ্বংসের উৎসমুখ। দীর্ঘকালব্যাপী আদর্শহীন শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের ফলেই মুসলিম জাতির ঈমান ও প্রত্যয়ে দুর্বলতার এই নৈরাশ্যজনক বাস্তবতা দৃশ্যমান।

www.amarboi.org

আধুনিক শিক্ষার পরিণতি

এ প্রেক্ষিতে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য সভ্যতাগর্বী দেশের উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে একটি সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এ সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যে সব মৌলিক ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল এই বাস্তব ও ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ায় উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ। এছাড়া তাদের সামনে আর কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। এটাই তাদের জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য—তাদের সামগ্রিক ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। স্মর্তব্য যে, বৈষয়িক জীবনকে অন্য কোন মহত্তর ও চিরন্তন জীবনের জন্যে প্রস্তুতিক্ষেত্র এবং লক্ষ্য-পথ ও মাধ্যমরূপে গ্রহণকারী মানুষ এবং এ জীবনকেই আসল ও প্রকৃত জীবন তথা চরম ও পরম জীবনরূপে গ্রহণকারী মানুষের জীবনে আকাশ-পাতালের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্যস্থলের স্বরূপ ও দূরত্বের আলোকেই সফরের প্রস্তুতি ও পাথেয় গ্রহণের অভ্যাস প্রতিটি মানুষের। যাত্রাপথে সেসব জিনিসই সঙ্গে নেয়া হয়, যা পথিমধ্যে ও চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় মনে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এ দুনিয়ার জীবনই যাদের চরম লক্ষ্য, তারা কি ধরনের জিনিসপত্র সংগ্রহে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করবে এবং সাফল্য ও সার্থকতা বলতে তারা কি বুঝে থাকে, তা সহজেই অনুমেয়। এ ধরনের যাত্রীরা যে এই নশ্বর দুনিয়ার সমস্ত বস্তুগত উপায়-উপকরণ দুই হাতে কুড়াবে এবং সে সবকেই অতীব প্রয়োজনীয় ও পরম নির্ভরযোগ্য মনে করবে আর সেজন্যেই নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করবে, তাকেই নিজেদের সমস্ত চেষ্টা তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততার লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে—এ ছাড়া জীবনের সূচনা সম্পর্কে তাদের অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা হবে না—এক বিন্দু চিন্তা হবে না জীবনের পরিণাম সম্পর্কে—এতে কোনই সন্দেহ নেই। যাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাসাদ পুরাপুরি বস্তুগত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, তারা উন্নতমানের 'জীব' সৃষ্টি ছাড়া আর কি-ইবা করতে পারে!

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল হল এই নশ্বর ও বস্তু-জীবনের চাকচিক্য, জাঁকজমক, আনন্দস্ফূর্তি ও স্বাদ আস্বাদন। এছাড়া শিক্ষার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ শিক্ষায় মানুষের যতই উর্ধ্বগমন হোক না কেন, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় ও দেশভিত্তিক উন্নতি লাভই কেবল তার পক্ষে সম্ভব। আর মৌখিক দাবিতে আরো উর্ধ্বগমন সম্ভব হলে সমগ্র মানবতার কয়েকদিনের পাশবিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই হবে তার শেষ লক্ষ্য-বিন্দু। এই উচ্চতর পাশবিক জীবনের লক্ষ্য এবং মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা পাশবিক জীবন বিকাশের একটা ধারাবাহিকতা—অপেক্ষাকৃত উন্নততর জীব কিংবা উচ্চমানের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। পিছনের দিকে তার কোন দৃষ্টি নেই, তার সৃষ্টির পিছনে কোন শক্তি বা সত্তার ইচ্ছার সক্রিয়তা ছিল না বলে তার সমস্ত সত্তাই উদ্দেশ্যহীন, বিশেষ কোন লক্ষ্য বলতেও কিছু নেই তার। ভবিষ্যতের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। উপস্থিত জীবন শেষে নেই তার কোন

www.amarboi.org

হিসাব-নিকাশ—শাস্তি ও পুরস্কার। অবস্থা যখন এই, তখন শুরু ও সমাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক ও বেপরোয়া মানসিকতাই প্রধান ও প্রভাবশালী হয়ে থাকে মানব জীবনের সমস্ত তৎপরতার ওপর। আর উপস্থিত বস্তুগত জীবনের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় তথা লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার চরিতার্থতা, তারই জাঁকজমক, চাকচিক্য, শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য বিধান এবং তা অর্জনের জন্যে ব্যাপক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ এবং তাকেই জীবনের উন্নতি ও উৎকর্ষের চরম সার্থকতা মনে করা—এটাই স্বাভাবিক। আর বর্তমান দুনিয়ায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিপদ-আপদ ও অশান্তি-উৎপীড়নের মূল উৎসই হল আধুনিক শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পরকালীন সাফল্যও যে মানুষের জীবন-লক্ষ্য হতে পারে তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া এবং সে সব কিছুকে জীবনের তৎপরতা থেকে বিতাড়িত করে বৈষয়িক সুখ-সুবিধা, মান-সম্মান, ধন-সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা, ব্যবসায়িক উন্নতি, সর্বোপরি মানসিক ও জৈবিক স্বাদ-আস্বাদনকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করাই এ শিক্ষার অনিবার্য পরিণতি।

ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষা-দর্শন

বিদ্যার্জন ও শিক্ষা সংক্রান্ত এই নিরেট বস্তুবাদী ও পাশবিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল তথা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি, মুসলমান হিসেবে তা আমাদের সর্বপ্রথম জেনে নেয়া দরকার। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের ঘোষণাবলী লক্ষণীয়। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا – ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَاَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه لا وَهُوَاَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى –

হে নবী! সেই লোকের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখ, যে আমাদের নাযিল করা জীবন বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে এবং নিতান্তই বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য আর কিছুর ওপর নিবদ্ধ নয়। এই শ্রেণীর লোকদের জ্ঞানের পরিধি চূড়ান্ত সীমা এ পর্যন্তই। আল্লাহর পথ থেকে কে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং কে তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেছে, এই উভয় ব্যক্তিকে তোমার খোদা-ই অধিক ভালো জানেন।

(সূরা নাজম ঃ ২৯-৩০)

এরই পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ

www.amarboi.org

الْاُنْثٰى - وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا -

যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে অভিহিত করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা তো নিছক আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলছে । কিন্তু নিছক আন্দাজ-অনুমান তো প্রকৃত সত্যের বিকল্প হতে পারে না। (সূরা নাজম ঃ ২৭ - ২৮)

প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটির বক্তব্য হল ঃ যারা আল্লাহ্‌র বিধান পরিহার করে চলে—জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে তাকে গ্রহণ করে না, নিতান্ত বৈষয়িক ও বস্তুবাদী এই জগত ভিন্ন অন্য কিছুতে যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়, তারা শুধু এই জীবন ও এই জগত সম্পর্কেই হয়ত কিছুটা জানতে পারে। এর বাইরের জগত তাদের দৃষ্টিরও আড়ালে, তাদের জ্ঞান-সীমারও বহির্ভূত। এ ধরনের বস্তুবাদী ও আল্লাহবিমুখ লোকদের পক্ষে ইহকাল ও পরকালব্যাপী সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তাদের চিন্তা-বিবেচনা সর্বাত্মক ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়—বরং একদেশদর্শী। প্রকৃত জ্ঞান তাদের আওতা-বহির্ভূত। নিছক বাহ্যিক ও ভাসাভাসা জ্ঞানই তাদের একমাত্র সম্বল।

আর দ্বিতীয় আয়াতের প্রতিপাদ্য হল ঃ পরকাল অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী—এ বিশ্বাস যাদের নেই, কেবলমাত্র এ জীবনটাকেই যারা চূড়ান্ত ও একমাত্র বলে মনে করে নিয়েছে, তারা প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। প্রকৃত ব্যাপার জানবার কোন সাধ্য তাদের নেই বলে তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে দেব-দেবী ইত্যাদি মনে করে চরম অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে। মানুষ বস্তু ও আত্মার সমন্বয়ে গড়া একটি পরিপূর্ণ সত্তা আর এই সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞানই সত্যিকার জ্ঞান—যথার্থ ও সম্যক জ্ঞান। একটি গোটা সত্তার শুধু এক দিক সম্পর্কে যার জ্ঞান তার সে জ্ঞান যথার্থ বা সত্যভিত্তিক নয়; তা নিতান্তই আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক। আর আন্দাজ-অনুমান দ্বারা কখনো প্রকৃত সত্য জানা যেতে পারে না। অথচ মানুষের জন্যে প্রকৃত সত্য জ্ঞানই অপরিহার্য প্রয়োজন। প্রকৃত সত্যকে জানবার জন্যে সর্বপ্রথম দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে দুনিয়ার এপার থেকে পরকালের ওপার পর্যন্ত এবং এই সত্য পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এপার-ওপার দুপারেরই প্রেক্ষিতে যা কল্যাণকর তাকেই কল্যাণকর রূপে গ্রহণ এবং যা অকল্যাণকর তাকেই অকল্যাণকর মনে করে পরিহার করে চলতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে বস্তুনির্ভর ও বস্তুসর্বস্ব জ্ঞান নিতান্তই বাহ্যিক জ্ঞান। বস্তুর গভীরে যে আত্মা নিহিত, তাকে না দেখে বা তাকে বাদ দিয়ে যে জ্ঞান তা নিতান্তই ভুল জ্ঞান। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান শিখালেও বস্তু ও আত্মার

www.amarboi.org

সমন্বিত সত্তা সম্পর্কিত কোন জ্ঞানই শেখায় না। এ জন্যে সে জ্ঞান চিরকালই ভুল থেকে যায়। কুরআনে এহেন জ্ঞানবানদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ -

ওরা কেবল বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক দিকটাই মাত্র জানে। আর পরকাল সংক্রান্ত ব্যাপার ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা একেবারেই অনবহিত—অসতর্ক।

(সূরা রূম ঃ ৭)

এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টি ও বৈষয়কি জীবনকেন্দ্রিক জ্ঞানের পরিণাম কি? এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

খুব ভালভাবেই জেনে রাখ, এ দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল-তামাসা, মন-ভুলানোর উপায়, বাহ্যিক চাকচিক্য এবং তোমাদের পারস্পরিক গৌরব-অহংকার প্রকাশ আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে পরস্পরের তুলনায় অধিক অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। (সূরা হাদীদ ঃ ২০)

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ -

এই দুনিয়ার জীবনটা তো কয়েক দিনের ক্ষয়িষ্ণু সামগ্রী মাত্র। আর চিরকাল অবস্থানের জায়গা তো হল পরকাল। (সূরা মুমিন ঃ ৩৯)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

এ দুনিয়ার জীবনটা খেল-তামাসা ও অন্তঃসারশূন্য আনন্দ-স্ফূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল ও প্রকৃত জীবন হল পরকাল। অবশ্য যদি তারা এ তত্ত্ব জানতে পারে।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৬৪)

প্রথম আয়াতটি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, এই বৈষয়িক জীবন নিতান্তই অস্থায়ী। এখানকার আনন্দ-স্ফূর্তি ও চাকচিক্য এ জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানেই তার সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবে। এগুলো বাহ্যত ও উপস্থিত যতই আনন্দ এবং তৃপ্তিদায়ক হোক না কেন, এগুলোর কোন প্রকৃত ও স্থায়ী মূল্য নেই। এখানে এক-একটা জিনিসকে

www.amarboi.org

যত বড়ই মনে করা হোক-না কেন, আসলে তা-খুবই সামান্য ও নগণ্য। মানুষ নিজের দৃষ্টি সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা ও মনোবৃত্তির হীনতা-নীচতার দরুনই এখানকার এক-একটা জিনিসকে খুবই বিরাট, মূল্যবান ও আকর্ষণীয় মনে করে বসেছে। মানুষ নিতান্ত ধোঁকায় পড়েই এগুলোকে লাভ করার জন্যে পাগল হয়ে ছুটেছে এবং এগুলো পাওয়াকেই জীবনের চরম সাফল্য ও সার্থকতা মনে করছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের দ্যোতনা আরো সুস্পষ্ট- -আরো মর্মস্পর্শী। তাতে চোখা চোখা কথায় বলে দেয়া হয়েছে, এ দুনিয়ার জীবনটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত অবক্ষয়মান সম্পদ মাত্র। আসলে এটা কোন জীবনই নয়। এটা এখানেই ফেলে যেতে হবে ছেঁড়া জুতার মতো। আসল চিরস্থায়ী জীবন তো পরকালীন জীবন। কাজেই এ দুনিয়ার জীবনটাকে যদি কেউ চিরস্থায়ী মনে করে, তাহলে সে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ মনে করার মতোই চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে। সে একজন অজ্ঞ-মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া তার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয়।

এ দুনিয়াকে চরম 'লক্ষ্য' রূপে গ্রহণ করার এবং এর ক্ষণিক সুখ-শান্তি ও উন্নতি-স্থিতিকেই চরম সার্থকতা মনে করার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এটি বিশ্বলোকে মানুষের আসল অবস্থান ও মর্যাদাকে পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে নিক্ষেপ করে পাশবতার নিম্নতম পংকে পৌঁছে দেয়ার শামিল। দৃষ্টি ও চিন্তার পরিধিকে সংকীর্ণতর করে ঠিক-বেঠিক, সত্য-মিথ্যা, সহীহ্-গলদ ও ভাল-মন্দ হওয়ার সিদ্ধান্ত এই অস্থায়ী জীবনের লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ ও স্বাদ-বিস্বাদের নিক্তিতে ওজন করে গ্রহণ করার পরিণতি মানবতার পক্ষে কতখানি মারাত্মক, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করাও এ দুনিয়ায় সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা মানুষকে এই দৃষ্টিভঙ্গিই দিয়েছে—এই মানসিকতাকেই প্রবল করে তুলেছে। পরিণামে তা মানুষকে নিতান্ত 'পশু' বানিয়ে ছেড়েছে—মানুষ থাকতে দেয়নি। এটা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক বিরাট 'অবদান', তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সমাজদৃষ্টি

দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই পিতামাতার সন্তান, সকলে একই বংশোদ্ভূত, সকলের ধমনীতে একই মা-বাবার রক্ত প্রবাহমান। রক্ত-বর্ণের দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কোনরূপ ভেদাভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু মানব জাতির এ স্বাভাবিক একত্বতা ও অভিন্নতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন সাংঘর্ষিক দল-উপদলে বিভক্ত করে দেয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জীবন-দৃষ্টিরই অনিবার্য পরিণতি। কেননা দুনিয়ার বস্তুগত উপায়-উপকরণ, ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের সামগ্রী খুবই সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষা এগুলোকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। অথচ মানুষের জৈবিক লোভ-লালসা অন্তহীন—সীমালঙ্ঘনকারী। শুধু ব্যক্তিগত চিন্তাই

www.amarboi.org

নয়, জাতীয় ও সামষ্টিক মতাদর্শের ভিত্তিও এ সব বস্তুগত জিনিসের ওপর সংস্থাপিত। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমাজ ও জাতি সংক্রান্ত ধারণা (Concept of Society and Nation) বর্ণ-গোত্র ও দেশমাতৃকার সীমাভিত্তিক এবং তা নিতান্তই বস্তুগত নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। পাশ্চাত্য জাতি-দর্শনে দেশমাতৃকা বা ভূগোল-সীমার মধ্যে বসবাসকারী এক নির্দিষ্ট বর্ণের বা গোত্রের লোক বা এক ভাষাভাষী লোকেরা এক-একটা জাতি। এ জাতি অন্যান্য সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। এই বস্তুগত বা অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাই এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা তীব্রতর করে তোলে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'দুনিয়ার মালিকরা এক হও' প্রভৃতি শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগান এ সংকীর্ণ ও বিষাক্ত শ্রেণী চেতনারই ফসল। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে গোত্রে ও ভাষায় ভাষায় যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং হিংসা-বিদ্বেষের যে আগুন চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে গোটা মানব সভ্যতাকে ছারখার করে দিতে চাইছে, তা বর্তমান বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অনিবার্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি জাতিসংঘ (U.N.O) থেকে বিশ্ব-মানবতার সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে বড় বড় দাবি সহকারে যে সব বই-পুস্তক প্রচার করা হয়, দুঃখের বিষয়, তাও এই ধরনের অতীব সংকীর্ণ দ্বান্দ্বিক ও সাংঘর্ষিক ভাবধারা ও বিদ্বেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর।

এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা ও তার প্রধান গার্জিয়ান পাশ্চাত্য প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সৃষ্ট জীবন-দৃষ্টি ও তার জ্ঞানগত মানের পরিধি। এ জীবন-দর্শন ও জ্ঞানগত মান অর্জন এবং তা বিতরণের জন্যেই এসব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সদাব্যস্ত ও প্রচণ্ডভাবে কর্মতৎপর। আমরা প্রাচ্যবাসীরাও অন্ধভাবে তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে এ ধরনেরই জীবন-দৃষ্টি ও মানস প্রস্তুতি গ্রহণে সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছি। এ পথে চলার মধ্যেই জীবন ও জন্মের চরম সার্থকতা নিহিত বলে দৃঢ় প্রত্যয় রাখি। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় সভ্যতা যে আমাদের চোখকেই ঝল্‌সে দিয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ইসলামের জীবন দৃষ্টি

ইসলামের জীবন দৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় এই বিশ্বলোকে মানুষের স্থান সম্পর্কে। ইসলামের ঘোষণানুযায়ী বিশ্বলোকে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে। মানুষের কল্যাণে ও তার ব্যবহারে আসার জন্যে সদাপ্রস্তুত এই গোটা বিশ্বলোক। বাহিকে অবয়বের দিক দিয়ে মানুষকে সর্বোত্তম আকার-আকৃতি এবং দেহ কাঠামো ও দেহ-সংস্থা দান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষকে দেয়া হয়েছে খিলাফতের মর্যাদা—প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। মানুষ এ দুনিয়ায় প্রথমে আল্লাহ্‌র বান্দাহ।

www.amarboi.org

আল্লাহ্র বন্দেগী, দাসত্ব ও হুকুমবরদারী করাই মানুষের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, মানুষ এখানে আল্লাহ্র খলীফা—তার প্রতিনিধি। মানুষকে এই মর্যাদা ও দায়িত্ব দিয়েছে কেবলমাত্র ইসলাম। দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অপর কোন একটিতেও মানুষকে এই মর্যাদা দেয়া হয় নি—দেয়া হয়নি তাদেরকে এই সুমহান সুমহান দায়িত্ব। এ ব্যাপারে ইসলাম একক ও অনন্য ব্যবস্থা—এর কোন তুলনা নেই। আল্লাহ্র নিকটতম ও অতি সম্মানার্হ সৃষ্টি হল ফেরেশতা। এই ফেরেশতাদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষকে সিজদা করার জন্যে। এ-ই যখন অবস্থা, তখন মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করতে—অন্য কারোর সামনে মাথানত করতে পারে কিভাবে? মানুষের সেবায় বাধ্য করা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টিলোককে—বিশ্বলোকের সমস্ত শক্তিকে। সব কিছুকেই মানুষের ব্যবহারাধীন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা হল ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ –

আকাশমণ্ডলে যা-কিছু আছে আর যা-কিছু রয়েছে পৃথিবীতে, সেই সব কিছুকেই আল্লাহ তা'আলা (হে মানুষ! কেবল) তোমাদেরই কল্যাণে ও ব্যবহারে দৃঢ়ভাবে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র এই ব্যবস্থাপনায় চিন্তাশীল বিবেকবান লোকদের জন্যে অনেক চিন্তা-ভাবনার বিষয় নিহিত রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা যাসিয়াহ ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا –

নিঃসন্দেহে মানবজাতিকে আমরা বহু সম্মান ও মর্যাদা দান করেছি এবং তাদের বহন করে নিয়েছি স্থলভাগে ও নদীসমুদ্রে আর তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছি অতীব পবিত্র ও উত্তম উৎকৃষ্ট জিনিস দিয়ে। আর আমার সৃষ্টিকুলের অনেকেরই ওপরে তাদেরকে উচ্চমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

সৃষ্টিকুলে মানুষের এই উচ্চতর মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদেরকে অতীব উত্তম আকার-আকৃতি দান করা হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ –

নিশ্চিতই আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো ও আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা ত্বীন ঃ ৪)

www.amarboi.org

অতঃপর মানুষকে এই ভুবনে আল্লাহ্‌র খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। মানবসৃষ্টির পূর্বেই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ ত''আলা ঘোষণা করেছিলেন ঃ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً—'নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার বুকে খলীফা বানাব'। অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষকে খিলাফতের মর্যাদা দিয়ে—খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে চিন্তা-শক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-অন্যায় বোধ দেয়া হয়েছে জন্মগতভাবেই। এসব বৈশিষ্ট্য অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। এর উদ্দেশ্য হল, মানুষ এখানে আল্লাহ্‌র 'নায়েব' বা প্রতিনিধি হয়ে সেই সমস্ত কাজই সুসম্পন্ন করবে, যেগুলো সম্পাদনের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ করেছেন। এজন্যে মানুষকে কর্মক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে দেয়া হয়েছে কর্ম-বিধান। মানুষকে এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে, স্বেচ্ছাচারিতার নয়। তাকে দৈহিক সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তি-সামর্থেও বলীয়ান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي—'আমি তাদের দেহে আমারই রূহ ফুঁকে দিয়েছি।'

মানবদেহে যে রূহ বিরাজমান, তা সৃষ্টিকুলের অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আল্লাহ তাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করেছেন—যেন মানুষ জীব-জন্তু ও ইতর-প্রাণীকুলের ন্যায় নিছক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত না হয়, যেন সাধারণ জীব-জন্তু ও পোকা-মাকড়ের ন্যায় নিছক জৈব কার্যাদি সম্পন্ন করেই সে মাটির সাথে মিশে না যায়; বরং তারও উর্ধ্বস্থিত খোদায়ী খিলাফতের দায়িত্বও যেন সে পালন করতে পারে। এ জন্যে তার সহজাত মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা-প্রতিভা যেন অকাতরে নিয়োজিত হতে পারে। বিশ্বলোকের পরতে পরতে লুক্কায়িত সব সম্পদ ও শক্তি যেন পূর্ণ মাত্রায় ব্যয়িত হতে পারে মানুষের এই খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালনে। আর এই সব কাজ করতে গিয়ে মানুষ যেন মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত না হয় আল্লাহ্‌র সম্মুখে তার আসল মর্যাদার কথা—সে একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ্—দাসানুদাস, একমাত্র আল্লাহই তার মা'বুদ। তার হৃদয়ে যেন সর্বদা জাগ্রত থাকে আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমারই বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।
(সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা—আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী দুনিয়ায় সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করাই মানুষের একমাত্র জীবন-উদ্দেশ্য। এ জন্যেই তাকে একটা নির্দিষ্ট মিয়াদের জীবন-কাল এবং দুনিয়ার এই বিশাল কর্মক্ষেত্র দান করা হয়েছে। এরূপ সমুচ্চ ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী

www.amarboi.org

মানুষ এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কার সামনে নতি স্বীকার করতে পারে—আনুগত্য স্বীকার করতে পারে আর কোন্ সার্বভৌম শক্তির?

জীবন-উদ্দেশ্য ও মানবীয় মহত্ত্ব

এতৎসত্ত্বেও মানুষ যদি ইতর জীব-জন্তুর ন্যায় নিছক প্রকৃতিগত দাবি-দাওয়া ও সহজাত লালসা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করে এবং বিশ্বলোকের যেসব শক্তি ও সম্পদকে মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে সবের দাসত্বে নিজের উন্নত যোগ্যতা ও গুণাবলী ব্যয় করতে শুরু করে তাহলে মানুষ অনিবার্যভাবে তার সুমহান মর্যাদা থেকে বিচ্যুত ও বঞ্চিত হবে। সেটা হবে তার পক্ষে চরম অধঃগতি। সেক্ষেত্রে মানুষ 'সেরাসৃষ্টি' হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতাই তার থাকবে না। অতঃপর সে দুনিয়ার বস্তুগত উপায়-উপকরণের—জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, প্রস্তর ও উদ্ভিদকুলের যতই উৎকর্ষ সাধন করুক না-কেন, সে যতক্ষণ তার হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার না করবে এবং স্বীয় আত্মিক, মানসিক ও মানবিক যোগ্যতা-প্রতিভাকে বিকশিত করে না তুলবে, সে তার সুমহান মানবীয় মর্যাদা কখনো ফিরে পাবে না। কেননা, সৃষ্টিকর্তা সমস্ত সৃষ্টিলোককে মানুষের খেদমতের জন্যে এবং মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্ব-আনুগত্য তথা খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে দুনিয়ার নিছক বস্তুগত উন্নতি বিধান কখনও মানুষের জীবন-লক্ষ্য হতে পারে না; বরং সমস্ত বস্তুগত উন্নতি-উৎকর্ষকে আল্লাহ্র সন্তোষলাভ ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য অর্জনে নিয়োজিত করার মধ্যেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা নিহিত, অন্য কিছুতে নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم ولى ربك المنتهى তোমাদের একটা চরম পরিণতি রয়েছে। সেই পরিণতির জন্যে তোমরা পূর্ণ শক্তিতে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

(আর কুরআনের ঘোষণা হল) 'আল্লাহতেই হবে তোমার চরম পরিণতি লাভ।' জীবন-দর্শনের এ মৌল ভাবধারার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে ইসলামের শিক্ষা-দর্শন। যে-শিক্ষায় এ ভাবধারা উপেক্ষিত, তা মানবোপযোগী শিক্ষা হতে পারে না ইসলামের দৃষ্টিতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও আত্মা

কিন্তু তাই বলে ইসলামের দৃষ্টিতে এই বস্তুগত দুনিয়া কিছুমাত্র উপেক্ষণীয়, বর্জনীয় বা পরিত্যাজ্য নয়; বরং মানবীয় সৌভাগ্য লাভের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছার পথ এই বস্তুগত জগতের মধ্য দিয়েই চলে গেছে। 'ম্যাটার' (Matter) এবং 'স্পিরিট' (Spirit) এই দুয়ের সমন্বয়েই মানব জীবন তথা মানবদেহ গঠিত। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব এ বাস্তব দুনিয়ায় অসম্ভব। এ দুটির মধ্যে কোন একটির ওপর অপরটির একক

www.amarboi.org

প্রাধান্যও জীবনে ও সমাজে চরম বিপর্যয় ঘটায় অবশ্যম্ভাবীরূপে। অতএব, দুটির মধ্যে পুরোমাত্রায় ভারসাম্য (Balance) রক্ষা করা মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতেই অপরিহার্য। কিন্তু 'বস্তু' ও 'প্রাণ-শক্তি'র পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষায় ইসলাম যে নির্দোষ ও স্বভাবসম্মত ভারসাম্য উপস্থাপন করেছে, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মবিধান ও সমাজ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তা পেশ করতে পারেনি। ইসলামের স্বভাবসম্মত ভিত্তি এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির এটাই অকাট্য প্রমাণ। মানবদেহ—বস্তু বা Matter—স্রষ্টার মহামূল্য অবদান, মানবজাতির জন্যে অতিশয় প্রয়োজনীয় নিয়ামত। এটা মানুষের নিকট আমানত রাখা হয়েছে। এর সংরক্ষণ ও সুস্থতা বিধান এবং এর যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পক্ষান্তরে এর কোন ক্ষতি সাধন, এর প্রতি একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শন এবং এর অধিকারসমূহ আদায় না করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই সব মৌল বৈশিষ্ট্যের গভীর ও সূক্ষ্ম অধ্যয়ন এবং নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর মাধ্যমে এগুলোর অন্তর্নিহিত ব্যাপক কল্যাণকারিতার বাস্তব প্রকাশ ঘটানো ইসলামী শিক্ষাদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য।

বস্তুত দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সংযোজন, সহযোগিতা ও অবিচ্ছিন্নতা একান্তই অপরিহার্য। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব এখানে অসম্ভব। আত্মাহীন দেহ একটি লাশ মাত্র এবং দেহহীন আত্মা বস্তু সম্পর্কহীন একটি বিমূর্ত সত্তা। বর্তমান বস্তুজগতে আত্মা দেহের সঞ্জীবনী ও চালিকা শক্তি। তার সমস্ত দায়িত্ব ও কাজ 'দেহ' দ্বারাই আঞ্জাম পেয়ে থাকে। দেহ তার একমাত্র হাতিয়ার, উপায়-উপকরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মার জন্যে দেহ উপায় ও হাতিয়ার মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। 'বস্তু' নশ্বর উপাদান। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর—শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য । এর কোন একটিকে উপেক্ষা করার ভাবধরায় যে বিধান রচিত, তা মানবতার জন্যে একবিন্দু কল্যাণ সাধনে অক্ষম। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকালও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ পরকাল। কেননা, ইহকাল নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত—তা অবসান বা চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্যে অপেক্ষমান। আর পরকাল অনন্ত, অশেষ এবং স্থায়ী। মানুষের আসল কল্যাণ লাভ এখানে সম্ভব নয়—তা সম্ভব পরকালীন জীবনে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকাল

এই দুনিয়া ও প্রাকৃতিক জগত যে কিছুমাত্র নিরর্থক নয়—নিষ্ফল ও মূল্যহীন নয়, কুরআন মজীদে বার-বার সে কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ –

আমরা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে, নিছক খেলার ছলে সৃষ্টি করি নি। (সূরা আম্বিয়া : ১৬)

www.amarboi.org

এ দুনিয়ার সৃষ্টি-রহস্য যারা জানতে পারে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘোষণা করতে বাধ্য হয় ঃ

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا –

হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এই সৃষ্টিকুল—আসমান, জমিন ও এদের মধ্যবর্তী সবকিছু—নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি। (আলে ইমরান ঃ ১৯১)

বস্তুত এ পৃথিবী কিছুমাত্র নিরর্থক নয়—উদ্দেশ্যহীন নয়। উদ্দেশ্যহীন কোন বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র পক্ষে অশোভনীয়—অসম্ভব; বরং এর একটা ইতিবাচক উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে। সে উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখেই এ পৃথিবীর, এ বিশ্বলোকের এবং এখানকার জীবন কালের মূল্যায়ন করতে হবে। বস্তুত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও জীবনের জন্যে তার অপরিহার্যতা কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় নয়, এটা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।

ইসলাম এ পার্থিব জীবনের যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে এবং একে উপেক্ষা বা ত্যাগ করার প্রবণতা এবং যে ধরনের মতবাদ দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা দেয়, তার প্রতিবাদ করেছে তীব্র ভাষায়। কুরআনে নেতিবাচক ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ –

বৈরাগ্যবাদ—দুনিয়া ত্যাগের প্রবণতা—তারা নিজেরা ইচ্ছামত রচনা করে নিয়েছে। আমরা তাদের জন্যে এ ব্যবস্থা দেইনি। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

আর ইতিবাচক ভাষায় ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আর আল্লাহ তোমাকে এই জীবনে যা-কিছু দিয়েছেন—জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ধন-সম্পদ ও প্রাকৃতিক বস্তু-সামগ্রী ইত্যাদি—সেই সবকিছু ব্যয় ও ব্যবহার করে তুমি পরকালীন কল্যাণ লাভে আকাঙ্ক্ষী ও যত্নবান হবে। আর তা করতে গিয়ে তোমার বৈষয়িক জীবনের অংশ ও প্রাপ্য তুমি কিছুতেই ভুলে যাবে না। (সূরা কাসাস ঃ ৭৭)

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا

www.amarboi.org

তুমি দুনিয়ার জন্যে কাজ করবে এমনভাবে যেন তুমি চিরকালই এখানে থাকবে—বসবাস করবে। আর পরকালের জন্য কাজ করবে এরূপ মনোভাব নিয়ে যেন কালই তোমার মৃত্যু হবে।

অর্থাৎ এ জীবন ও জীবনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সময়-অবসর, ধন-সম্পদ, যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা, মেধা-প্রতিভা, বিবেক-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহার করবে—কর্মে নিয়োজিত করবে এক সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্যে। একটি হল পরকালীন কল্যাণ আর দ্বিতীয়টি ইহকালীন অর্থাৎ এই বৈষয়িক জীবনের কল্যাণ। ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক কল্যাণের পরিবর্তে চিরস্থায়ী পরকালীন কল্যাণই হবে তোমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, তৃপ্তি-সাফল্যের, উন্নতি-সার্থকতার স্বাদ-আস্বাদনের ব্যাপারটি কিছুমাত্র উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হতে পারবে না। এক সঙ্গে ও একই কাজের মাধ্যমে উভয় কালের কল্যাণ লাভই হবে তোমার চরম লক্ষ্য এবং একটির জন্যে অপরটিকে কিছুমাত্র উপেক্ষা করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম তা আদৌ সমর্থন করে না; বরং একই কাজের মধ্যে ইহকাল ও পরকাল উভয়কে সমন্বিত করা কেবলমাত্র ইসলামেরই অবদান।

বৈষয়িক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও চাকচিক্য সম্পূর্ণ বর্জন করাই আল্লাহ্‌র উপাসনার মাপকাঠি—দুনিয়ার বৈরাগ্যবাদী লোকদের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে কুরআন মজীদে নেতিবাচক ভাষায় প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

বল, দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকর এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারী দ্রব্যাদি ও পবিত্র-উৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয় তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্‌দের কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন; সে সবকে হারাম ও নিষিদ্ধ করে দিতে পারে কে? (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)

অর্থাৎ এই পৃথিবীর জাঁকজমক, স্বাদ আস্বাদন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিস ভোগ ও ব্যবহার করা আল্লাহ্‌র বন্দেগীর পরিপন্থী নয় এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হলে এগুলো বর্জন করতে হবে এরূপ মনে করা একেবারেই ভিত্তিহীন। ইসলাম দুনিয়া ত্যাগের এই বৈরাগ্যবাদী মানসিকতাকে আদৌ সমর্থন করে না। উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-

জানিয়ে দাও, এই সব কিছুই এ দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার লোকদের ব্যয়-ব্যবহার ও ভোগ-সম্ভোগের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)

www.amarboi.org

অর্থাৎ এসব বর্জন করে চলায় ঈমানদারী নেই। ঈমানদারীর দায়িত্ব পালনের জন্যে এই সবকিছু যে উদ্দেশ্যে ও যে কাজে লাগাবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে ও সেই কাজেই ব্যবহার করা আবশ্যক এবং এ ব্যাপারে অন্যান্যের তুলনায় ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব সর্বাধিক।

কুরআন ও হাদীসে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সৌন্দর্য তথা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যে একসঙ্গে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এমনকি, এই প্রার্থনায় বিশেষ একটা কালের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - اُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনেই দাও......;এদের জন্যে পরকালে কিছুই প্রাপ্য নেই। আবার এ লোকদের মধ্যে অনেকেই দো'আ করে এই বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ ও সুন্দর দান কর—সুন্দর ও কল্যাণ দান কর পরকালেও'। এ লোকেরাই তাদের উপার্জনের অংশ পাবে। আর আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সূরা বাকারা ঃ ২০০-২০২)

অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকাল অবিভাজ্য। যারা এর একটিমাত্র কালকে চাইবে, তারা শুধু অপরটি থেকেই নয় দুটি থেকেই বঞ্চিত হবে। যারা কেবলমাত্র দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাইবে, তারা এখানেও তা পাবে না এমন কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে—'পরকালে তারা কিছুই পাবে না।'

বস্তুত মানুষের বৈষয়িক ও জাগতিক জীবনের প্রয়োজনাবলী পূরণ করা এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা ও দ্বীন ইসলাম সংরক্ষণের জন্যে যথাসাধ্য উপায়-উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করার আবশ্যকতা ইসলাম শুধু স্বীকার করে নি, তার সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছে। একটি আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ -

আর তোমরা শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্যে যতদূর সম্ভব শক্তি-সামর্থ্য ও সজ্জিত ঘোড়া (বাহন) প্রস্তুত করে রাখ। তার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের আর তোমাদের শত্রুদেরও। এদের ছাড়া আরো আরো ভয় দেখাবে সে সব শত্রুকেও যাদের কথা তোমরা জাননা, আল্লাহ্ তাদের জানেন। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

এ আয়াতের দুটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কথা, এ আয়াতে সাধারণ বস্তুগত শক্তি সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং তার এমন একটা মান ও পরিমাণ সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যদ্দারা সাম্প্রতিক শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা যায়। এর ফলে তারা ভয় ও ত্রাসে এতটা দিশেহারা হয়ে পড়বে যে, মুসলিম শিবিরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস পাবে না। আর দ্বিতীয়, বস্তুগত সরঞ্জাম ছাড়াও একটি জিনিস সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে, তা হল 'কুওয়াৎ' (قوة) । এ শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এতে বস্তুগত শক্তি তথা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আরো একটি শক্তি বুঝায়, যা নির্বস্তুক এবং ভিন্নতর। এ দ্বারা যেমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বুঝায়, তেমনি প্রত্যেক যুগের উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্রশস্ত্রও বুঝায়। সাধারণ সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ যুদ্ধ-কৌশল (Strategy) এবং গণ-সমর্থনও এর মধ্যে গণ্য। মোটকথা, শত্রুদমনে ও যুদ্ধজয়ে আদর্শবাদী জনশক্তির সক্রিয় ও সাগ্রহ সহযোগিতা এবং প্রতিটি ব্যাপারে বাস্তব আনুকূল্যের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। বস্তুত এ এক সর্বাত্মক ও সর্বমুখী প্রস্তুতি। এর জন্যে যা কিছু দরকার, তা সবই করার জন্যে ইসলামের রয়েছে এক অনমনীয় ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ।

ইসলাম জীবন-জীবিকার সুষ্ঠু সন্ধান ও সংগ্রহকে ওয়াজিব করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তাকে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান' নামে অভিহিত করেছে। কেননা, ইহকালের সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন সুখ-সুবিধা বিধান এবং ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ বিধানের জন্যেই ইসলাম এক সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জন্যে জীবনের কোন একটা দিকও তার আওতার বাইরে থাকেনি। কুরআন মজীদে এই সব কিছুরই মৌলিক বিধান বলিষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে উল্লেখিত রয়েছে। কৃষি কাজ, বাগান রচনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সৌকর্য প্রভৃতি কোন কিছুই তাতে বাদ পড়েনি। রাসূলে করীম (স)-এর বাণী-সম্পদে (হাদীসে) হস্তশিল্প, ব্যবসা ও জীবিকার্জনের বিভিন্ন পন্থা ও উপায়ের নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন মূল্যায়নও ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অর্থোৎপাদনের সব উপায় ও পন্থা এবং রাষ্ট্র ও দেশ শাসনের সমস্ত পদ্ধতিসহ দুনিয়ার জীবন ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালের শাশ্বত ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় এক অস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দুনিয়ার জীবন একটা পথ মাত্র, চূড়ান্ত মন্‌যিল নয়। দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছুই উপায়-উপকরণ

www.amarboi.org

মাত্র—লক্ষ্যস্থল নয়। আসল ও চিরন্তন লক্ষ্যস্থল হল পরকাল। মানুষের প্রকৃতির সাথে এর ধারণার পূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান।

দুনিয়ায় শুধু ধন-সম্পদের প্রাচুর্যই ইসলামের কাম্য নয়, বৈষয়িক উন্নতিও উন্নতির আসল মানদণ্ড নয়। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য পরকালীন কল্যাণ—সেই কল্যাণের দৃষ্টিতেই এই সব কিছুর মূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

তোমরা তো কেবল বৈষয়িক জীবনকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর। অথচ পরকালীন জীবনটাই আসল—কল্যাণের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং সেটাই চিরস্থায়ী।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

তোমরা তো দুনিয়ার অস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্যাদি লাভ করতে চাও; কিন্তু আল্লাহ (তোমাদের জন্যে) চান পরকাল। আর আল্লাহ্ সর্বজয়ী ও সুবিজ্ঞানী।

(সূরা আনফাল ঃ ৬৭)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى لْاٰخِرَةِ اِلَّاقَلِيْلٌ-

তোমরা পরকাল বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়ার জীবন পেয়েই খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলে? .... কিন্তু আসলে পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সমস্ত সামগ্রী নিতান্তই স্বল্প—অপর্যাপ্ত। (এ কথা তোমরা ভুলে যেতে পার কেমন করে?

(সূরা তওবা ঃ ৩৮)

এই প্রেক্ষিতে পরকালকে উপেক্ষা করে কেবল বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-উৎকর্ষ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জ্ঞানলাভ কখনো যথার্থ ও কল্যাণকর শিক্ষা-নীতি হতে পারে না। মানুষের জন্যে একমাত্র কল্যাণবহ শিক্ষা নীতি তা-ই, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের সার্বিক কল্যাণ-দৃষ্টিতে রচিত। কেননা, ইহকাল-পরকাল সমন্বয়ে মানুষ এক অখণ্ড জীবন-সত্তা। এর এক অংশ উপেক্ষিত হলে অপর অংশ উপেক্ষার আঘাতে পঙ্গু হয়ে যায় অবশ্যম্ভাবীরূপে। দুনিয়ার কোন শিক্ষা দর্শনই মানুষের এই দু পর্যায় সমন্বিত জীবনসত্তা সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করতে পারেনি। তাই পারেনি এমন শিক্ষা-দর্শন রচনা করতে, যা এই অখণ্ড জীবন সত্তার সার্বিক কল্যাণের বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সমর্থ। ইসলাম—কেবলমাত্র ইসলামই এই ধরনের শিক্ষাদর্শন তথা শিক্ষানীতির উদ্ভাবক।

www.amarboi.org

অখণ্ড মানবতা ও ইসলাম

বিশ্বলোকের অন্তর্নিহিত সত্য ও বাস্তবতা, বিশ্বলোকে মানবজাতির প্রকৃত স্থান ও মর্যাদা (Position) দেহ ও আত্মার পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক, ইহকাল-পরকালের অবিচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতা এবং বৈষয়িক দুনিয়ার নশ্বরতা ও পরকালীন জীবনের চিরন্তনতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও মতবাদ ওপরে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে ইসলামের বিশ্ব-মানবতা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণও অবশ্যই বিবেচ্য। তাহলেই ইসলামের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার সন্তোষ বিধানই মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কুরআনের ঘোষণা ঃ ولى ربك المنتهى —'তোমার আল্লাহ্‌র দিকেই চূড়ান্ত পরিণতি'।

কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বল, আমার নামায, আমার ইবাদত-বন্দেগী, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু—সব কিছুই সারে জাহানের রব্ব্ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।
(সূরা আন'আম ঃ ১৬২)

বলা বাহুল্য যে, এই চেতনার পূর্ণ বাস্তবায়ন পরকালেই সম্ভব হবে। কেননা, পরকালীন কল্যাণ মানুষের জন্যে শেষ মনযিল রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে যে অপরিমেয় সম্পদ ও নিয়ামতের দিকে মানবীয় চিন্তা ও কর্মকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে, তাও অসীম—অশেষ। মানুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবে যে অসীমতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তারও পূর্ণ চরিতার্থতার ব্যবস্থা রয়েছে এতে। আর এই লক্ষ্যেই 'বিশ্ব-মানবতা'র পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার পুরাপুরি ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। উদ্দেশ্য ও আদর্শের এই সুস্পষ্ট ঐক্য ও বিশাল-বিস্তৃত ভাবধারার দরুন মানুষের বিভিন্ন বংশ-গোত্র ও দেশভিত্তিক জাতীয়তার সংকীর্ণতা স্বতঃই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এ কারণেই ইসলাম সংকীর্ণ বস্তুগত ভিত্তিতে মানব জাতির বিভক্তি-বিভাজন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছে; বরং এতে সমস্ত মানুষকে একটি বৃহত্তর লক্ষ্যবিন্দুর দিকে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইসলাম পারস্পরিক সম্বন্ধ-সম্পর্ককে অধিকতর দৃঢ় করে তোলার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানব-জাতির এই আদর্শিক ঐক্য ও অভিন্নতার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে বা মতাদর্শে দেখতে পাওয়া যায় না।

বস্তুত ইসলামী ঐক্য-চেতনা ও সামষ্টিক সাম্যবাদের ভিত্তি আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক একাত্মতার ওপর স্থাপিত। কোন বাহ্যিক বা বস্তুগত পার্থক্য এখানে মোটেই বিবেচ্য নয়। এতএব, পাশ্চাত্য সমাজ-দর্শনে নিহিত বর্ণ-ভাষা, ভৌগোলিকতা, দেশমাতৃকা,

www.amarboi.org

ধন-সম্পদের পরিমাণ-পার্থক্য এবং বিভিন্ন লৌকিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের মনগড়া ঐক্যবন্ধন কি করে ইসলামের মানে উত্তীর্ণ হতে পারে?

পাশ্চাত্য উদ্ভাবিত আধুনিক শিক্ষা জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা বা 'জাতিসংঘে'র যে-ধারণা পেশ করেছে, তার ভিত্তি নিতান্তই দুর্বল ও ক্ষণভংগুর। যে সমাজে সত্য, ন্যায়, সুবিচার, সদাচরণ, দানশীলতা, সহযোগিতা, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং অগ্রাধিকার দানের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের গায়ের বর্ণ, মাতৃভাষা ও ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা, ইসলামের দৃষ্টিতে তা মানুষের উপযোগী নীতিমালা নয়। এ নীতি মানব সমাজে সম্পূর্ণ অচল, অমানবিক এবং নিতান্তই অবিচারমূলক।

মানবীয় একত্ব ও ব্যাপকতা

আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় মতাদর্শ খৃস্টবাদের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ ও লালিত-পালিত। এ কারণেই এ শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে দ্বীন ও দুনিয়া তথা ধর্ম ও সমাজ এবং ইহকাল ও পরকালের দ্বৈততার ওপর। এরই ফলে খৃষ্ট ধর্ম কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক আচার-আচরণ ও উপাসনা সংক্রান্ত কতিপয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির সাথে এ ধর্মের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তাই ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক কোন ধারণা এ শিক্ষাব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের ঐক্য, একতা ও অভিন্নতা পর্যায়ে বিন্দুমাত্র ধারণাও এ ব্যবস্থায় 'শিক্ষাপ্রাপ্ত' লোকদের মনে-মগজে স্থান পায়নি।

পক্ষান্তরে ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপক জীবন-বিধান। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র ও ব্যাপার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। মানুষের বাস্তব জীবনধারাকে বিশ্লেষণ করা হলে তিনটি পর্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

(ক) ব্যক্তির সম্পর্ক তার স্রষ্টার সঙ্গে—আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহই হল এ সম্পর্কের বাস্তব রূপ।

(খ) ব্যক্তির সম্পর্ক দুনিয়ার অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টিকুলের সঙ্গে—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এই সম্পর্কের অভিব্যক্তি।

(গ) ব্যক্তির সম্পর্ক স্বয়ং তার নিজের সঙ্গে—এ সম্পর্কেরই অপর নাম চরিত্র বা নৈতিকতা।

ইসলাম এই সবক'টি দিক ও বিভাগেই মানুষকে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। এই সব ক'টি বিভাগ সম্পর্কে ইসলাম 'আঙ্গিক একত্ব ও অবিচ্ছিন্নতার' ব্যাপক ধারণা পেশ করেছে। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শ তথা সমাজব্যবস্থার তুলনায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই অনুধাবনীয়। এতে ঈমান ও আমলের সমস্ত ভাবধারা এতই সুসংবদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন যে, এই সব ক'টি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ কার্যকর

www.amarboi.org

না হলে মানুষের ধর্মীয় জীবনও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনেও এই সামগ্রিক রূপ প্রতিভাত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-দর্শন এই সামগ্রিকতার চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

ইসলাম মানুষকে শুধু অধিকারের (Rights) কথাই শিখায় না। সেই সঙ্গে তার কর্তব্যের (Obl igations) কথাও বলিষ্ঠভাবে ও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেয়। যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে তাদের কর্তব্য ও অধিকার উভয় দিকের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায় এবং উভয় দিকের দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন করার অদম্য প্রেরণা লাভ করে, তা-ই মানুষের জন্যে ভারসাম্যপূর্ণ (Well-balanced) শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষকে প্রথমে আত্মচেতনায় বলিষ্ঠ করে তোলে। সেই সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় দিকের কর্তব্য এবং উভয় দিক সম্পর্কে নিজের দায়িত্বের কথা বিশদভাবে জানিয়ে দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের (فقه) সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায় ঃ

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا –

নিজেকে চেনা, সেই সঙ্গে নিজের কি অধিকার এবং অন্যের (স্রষ্টা ও সৃষ্টির) প্রতি তার কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা বিশদভাবে জানতে পারাই ইসলামের ব্যবহারিক শাস্ত্র বা বিধান।

মানুষ নিজের ক্ষমতা বা ইচ্ছায় এই জগতে আসতে পারেনি। সে স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টা তাকে বিশেষ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বন্দেগী ও মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মৌল ভাবধারা এখানেই বিধৃত। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, বিয়ে-তালাক, সন্তান প্রজনন, সন্তান পালন, সামাজিক সদাচার, সুবিচার-ইনসাফ, বিচার-সালিশ ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে শুরু করে শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদ, কৃষি-শিল্প, রাজনীতি, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র-শাসন, আইন ও বিচার, অর্থনীতি, অর্থোপার্জন ও ব্যয়-বন্টন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, যুদ্ধ-সন্ধি ও জোটগঠন—এ সব কিছুই ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের (فقه) আওতাভুক্ত। এতেই রয়েছে মানুষের বস্তুগত, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সর্বদিকের লালন-পালন, বিকাশ সাধন ও উন্নয়নের বিপুল প্রেরণা। ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা এই ব্যাপক ও অখণ্ড ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত ও প্রতিফলিত। একটি মাত্র দিক সম্পর্কিত শিক্ষা মানুষ গড়ার শিক্ষা হতে পারে না। তাই ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ বিশ্বনবীর দরবারে লক্ষ্যণীয়। অন্য কোথাও তার ভাবমূর্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ইসলাম স্রষ্টার আরাধনা-উপাসনার কয়েকটি অনুষ্ঠানের শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব এড়াতে সম্পূর্ণ নারাজ। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপায় সংক্রান্ত জ্ঞান দিয়েই ইসলাম মনে করে না যে, মানুষের

www.amarboi.org

প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। দুনিয়ার প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তর ও হৃদয় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে তোলার দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন করার সংকল্পে ইসলামের দৃঢ়তা অপরিবর্তনীয়। কুরআনে বিশ্ব নবীর শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনায়ও তা ধ্বনিত ও ঝংকৃত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ –

তিনি (রাসূল) লোকদের সামনে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি পেশ করেন, তাদের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করেন। আর তাদের সামগ্রিক বিধানসম্পন্ন কিতাবের শিক্ষাদান করেন এবং শেখান বুদ্ধি-প্রজ্ঞা ও বিবেচনা পদ্ধতি। (সূরা জুম'আ ঃ ২)

কুরআনের নির্দেশ হল ঃ

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

বাহ্যিক দিক দিয়ে যা পাপ তাও পরিহার কর—পরিহার কর যা পাপ ভিতরের দিক থেকে।

তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুণ্যময় কাজের নির্দেশনার সাথে সাথে যাবতীয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পাপ জানিয়ে দেয়া এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রবণতা তীব্র করে তোলা অপরিহার্য। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষায় জীবনের কোন একটি দিকও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে পারে না। সকল দিকের সব তত্ত্ব, তথ্য ও বিধান উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীর জ্ঞান-দৃষ্টির পরিধিতে ও পরিমণ্ডলে। এ-ই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার সুফল।

ইসলামী শিক্ষার বিপ্লবী ভাবধারা

ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীর স্কন্ধে নিছক তত্ত্ব ও তথ্যের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; তা শিক্ষার্থীর মনে-মগজে এক বিপ্লবী ভাবধারাও জাগিয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু জানাই লক্ষ্য নয়, প্রকৃত বিষয় জানতে হবে, যথার্থ সত্য ও সনাতনকে জানতে হবে এবং সেই জানার পর যে মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত হবে তাকে নিজের জীবনে, সমাজে ও পরিবেশে বাস্তবায়িত করবার জন্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাতে হবে। প্রকৃত সত্যকে জানার পর শিক্ষার্থী তার নিজের মন-মগজের—আকীদা-বিশ্বাসের, আমল ও চরিত্রের, নিজের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের অবস্থা যাচাই করবে এবং লব্ধ পরম সত্যের পরিপন্থী যেখানে যা কিছু পাওয়া যাবে তা দূর করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। অন্যায়, অসত্য, বাতিল ও মিথ্যার সাথে সে সমঝোতা করতে প্রস্তুত হবে না; বরং তার নিজের জানা চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ডে যা কিছু বিপরীত প্রমাণিত হবে তাকে যথানিয়মে দূর করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোই শিক্ষার্থীর অনিবার্য দায়িত্ব বলে মনে করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে নিছক শেখা, শিক্ষার নামে

www.amarboi.org

কতকগুলো তত্ত্ব ও তথ্যের আবর্জনা পুঞ্জীভূত করে তোলার নাম শিক্ষা নয়। অন্যকথায়, ইসলামের শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন নয়, আদর্শহীন নয়, প্রেরণাহীন নয়; তা প্রকৃতপক্ষেই মানুষের জন্যে সঞ্জীবনী সুধা।

ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীকে একটি 'মিশন' দেয়, জীবনের একটা কাজ দেয়, একটা কার্যসূচী দেয়; একটা বিপ্লবী ভাবধারাপূর্ণ আবেদন জন-সমক্ষে পেশ করার জন্যে তা শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম যে ধরনের শিক্ষার তাকীদ করেছে, যে-শিক্ষা না থাকার দরুণ তীব্র আপত্তি তুলেছে, তা হল এই শিক্ষা। কুরআন মজীদে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঃ

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ –

প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন জন-সমষ্টি থেকে কিছুসংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যায় না এ উদ্দেশ্যে যে, তারা 'দ্বীন' সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জন করবে এবং তারা যখন নিজেদের জনগণের নিকট ফিরে আসবে, তখন তারা তাদের প্রকৃত ব্যাপার ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে তুলবে। ....এভাবেই হয়ত তারা সতর্ক ও সত্য পথগামী হয়ে উঠবে। (সূরা তওবা ঃ ১২২)

এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হল 'দ্বীন' সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন, দ্বীন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা লাভ। আর দ্বীন বলতে বুঝায় জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ—স্রষ্টা, আত্মসত্তা, সৃষ্টিলোক, বিশ্ব নিখিল, সমগ্র প্রাকৃতিক জগত তথা ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়। কিন্তু এই জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভই চরম লক্ষ্য নয়। চরম লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে সে জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করা, তাদেরকেও সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত করা এবং তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গঠনের জন্যে তাদেরকে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলা।

ইসলামী শিক্ষা দর্শন শিক্ষার্থীদের একটি আহ্বান বাণী শিখিয়ে দেয় এবং সেই আহ্বান লোক সমক্ষে পেশ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করে। কুরআনী পরিভাষায় সে আহ্বান দাওয়াতুল হক (دعــوة الحق) বা 'সত্যর আহ্বান' নামে অভিহিত। এই 'দাওয়াতের' মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন মজীদ ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

যে লোক আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান জানাল, নিজে তদনুযায়ী নেক আমল করল এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল যে, আমি একজন মুসলমান, তার চাইতে

www.amarboi.org

উত্তম কথা আর কেউ বলছে না—এর চেয়ে উত্তম ও অধিক কল্যাণকর আহ্বান আর কিছু হতে পারে না। (সূরা হা-মী আস্-সিজদাহ ঃ ৩৩)

বস্তুত ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাবার এক অতুলনীয় ও অতীব উত্তম মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পর প্রথমত এ মহান আহ্বানের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে তার নিজের মনে, জীবনে ও চরিত্রে। অতঃপর তার মন-মানসে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, আদর্শিক বলিষ্ঠতা ও নিজের আদর্শিক পরিচয়ে অকুণ্ঠতার সঞ্চার হয়। ফলে সে উদাত্ত কণ্ঠে 'ইসলামী আদর্শবাদী' বা 'ইসলামী আদর্শানুসারী' মুসলিম রূপে বিশ্বসমাজে নিজেকে পরিচিত করাতে একবিন্দু সংকোচ বা লজ্জাবোধ করে না। যে শিক্ষা মানুষকে মিন্‌মিনে, সংশয়িত, শংকিত, অকর্মণ্য বা অপদার্থ বানিয়ে দেয়, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর চিত্তকে স্বতঃস্ফূর্ত করে না, যে শিক্ষা মানুষের উন্নত স্বভাব ও চরিত্রের সৃষ্টি করেনা, সর্বোপরি যে শিক্ষা তাকে কথা ও কাজে অভিন্ন, অকৃত্রিম, উদার, নির্ভীক ও সাহসী বানায় না, তা তত্ত্ব ও তথ্যে যতই স্ফীত ও সমৃদ্ধ হোক না কেন, শিক্ষার্থীর নামের শেষে যত বড় বড় ডিগ্রীর লেজুড় জুড়ে দেয়া হোক না কেন, তা মানুষের কোন কল্যাণ সাধনে আদৌ সমর্থ হতে পারে না—না ইহকালীন কল্যাণ না পরকালীন।

এরই অনিবার্য পরিণতিতে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার মতো যোগ্যতার অধিকারী হয়। কেননা, যারা মহান আদর্শে নিজেরা উজ্জীবিত হয়ে নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মানুষের সামনে সে আদর্শ উপস্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারাই তো হয় বিশ্ববাসীর শিক্ষাগুরু, পথ-প্রদর্শক ও অগ্রনেতা। আর তারাই হতে পারে বিশ্বের গোটা জনমানবের মাঝে সর্বোত্তম লোক হওয়ার উপযুক্ত দাবিদার। কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

বস্তুত যারাই ঈমান এনেছে ও তদনুযায়ী নেক আমলও করেছে, তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি। (সূরা বায়্যিনাত ঃ ৭)

'সর্বোত্তম' হওয়ার এই কুরআনী ঘোষণা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মনে কোন অবাঞ্ছিত অহমিকা কিংবা Superiority Complex জাগায় না—জাগায় গভীর আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ব-চেতনা, আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অহংবোধ। আর বিশ্বের নেতৃত্ব দানে এ গুণগুলো একান্তই অপরিহার্য। লোকদের মাঝে এ চেতনা জাগ্রত করাই আয়াতটির লক্ষ্য।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তা জনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য ও একত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। এ ঐক্য ও একত্ববোধ তিনটি ক্ষেত্রেই কার্যকর

www.amarboi.org

হয় ঃ (১) ঈমানী ঐক্য ও একত্ব—আকীদা-বিশ্বাস, বিশ্ব-দর্শন ও জীবন-উদ্দেশ্যে অভিন্নতা, (২) কর্মের ঐক্য ও একত্ব—বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আঙ্গিকে ও সাংগঠনিক ঐক্য ও একত্ব এবং (৩) মানবীয় ঐক্য ও একত্ব—সব ব্যক্তি মানুষই মৌলিক ও মানবিক দিক দিয়ে অভিন্ন ও সমতুল্য। এই মনোবৃত্তি ও কার্যধারাই ইসলামী শিক্ষার বিশেষত্ব।

বস্তুত ঈমানী ঐক্য ও একত্বই যে একটা জাতির সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি তা সর্বজনবিদিত। ঈমান-আকীদা, ধারণা-বিশ্বাস, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও মনোভাব-মূল্যবোধের অভিন্নতাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে; তাদের সম্মিলন ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে এক অখণ্ড জনসমাজ। এই সমাজেরই বৃহত্তর রূপকে বলা হয় 'জাতি'। একটা জাতির আদর্শিক অস্তিত্ব তার লোকদের ঈমান-আকীদা, চিন্তা-বিশ্বাস ও মতবাদ-মনোভাবে পরম ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। যে জাতির লোকজনের মধ্যে এ ঐক্য নেই, সে জাতি 'জাতি' নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। আর যে জাতির মধ্যে এ ঐক্য ও একত্ব রয়েছে, সে জাতিই বিশ্ব-নেতৃত্বের সুউচ্চ আসনে সমাসীন হওয়ার অধিকারী। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ সমন্বয়ে একদিন যে জাতি গড়ে উঠেছিল, সে জাতির এই গুণটিই ছিল প্রধান এবং উত্তরকালে এ জাতিই হয়েছিল বিশ্বনেতা। এ জাতির প্রতি কুরআনের নির্দেশ ছিল ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا –

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র 'রুজ্জু' দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। পরে আল্লাহ্ই তোমাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর সম্প্রীতিপূর্ণ করে দিলেন; ফলে আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমেই তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

'আল্লাহ্র রজ্জু' বলতে কি বোঝান হয়েছে এ আয়াতে? আল্লাহ্র রজ্জু হল আল্লাহ্র কিতাব। এই কিতাব সম্পর্কেই বলা হয়েছে অপর আয়াতে ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰاةَ وَالْاِنْجِيْلَ– مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ –

আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতি আল-কিতাব নাযিল করেছেন তা পূর্বে নাযিলকৃত তওরাত ও ইন্জীলের সত্যতা ঘোষণাকারী, তা জন-মানুষের সংবিধান এবং তা (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে) পার্থক্য সৃষ্টিকারী রূপে নাযিল করেছেন। (আলে ইমরান ঃ ৩)

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শের মৌল বিশ্বাস ও তার উপাদানসমূহ আরো একটি দিক দিয়ে ঐক্য ও একত্বের বাণী বহন করে এনেছে। ইসলামের দাবি এ নয় যে, দুনিয়ায় কখনই কোন দ্বীন আসেনি; বরং তার দাবি হল, মানব সমাজকে ঐক্য ও একত্বের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে মানবসৃষ্টির সূচনা থেকেই খোদায়ী পথ-প্রদর্শনের ধারা সূচিত হয়েছে এবং তা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। আল্লাহ্র কুরআন এই ধারারই সর্বশেষ নির্দেশিকা। ফলে এই ধারায় কোন অসম্পূর্ণতাই থাকতে পারেনি। উপরি-উদ্ধৃত আয়াত একথাই ঘোষণা করেছে এবং এ ঘোষণায়ও সেই ঐক্য ও একত্বের মহিমাই ঝংকৃত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যও এখানে যে, তা অপূর্ব ও অভিনব হওয়ার দাবি করে না। তাতে ইতিপূর্বে আসা অপরাপর খোদায়ী বিধানের সত্যতা পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত। কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার এই সমগ্র মানুষ এক অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ জাতীয় একত্ব ও অখণ্ডতা সর্বপ্রযত্নে রক্ষণীয় ঃ

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ –

তোমাদের এই জাতি আসলে এক অখণ্ড জাতি। আর আমি (আল্লাহ্) একাই তোমাদের সকলের প্রভু ও মালিক। অতএব তোমরা কেবল এক আমাকেই ভয় ও সমীহ করে চলবে। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫২)

(এরূপই অপর এক আয়াতের শেষ শব্দ হয় فَاعْبُدُوْنِ —'অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল কর'। (আল-আম্বিয়া ঃ ৯২ আয়াত)

কুরআনের ব্যাখ্যানুযায়ী এ জাতিকে 'মুসলিম' নামে সর্বপ্রথম অভিহিত করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। আমাদের জানা ইতিহাসে তিনিই সব নবী-রাসূলের আদি পিতা। তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল প্রভৃতি ঈমানী বিষয়াদি তিনিই সর্বপ্রথম পেশ করেছেন। আর সর্বশেষ রাসূলের নাম পর্যন্ত পূর্বেকার সব নবী-রাসূল ও খোদায়ী গ্রন্থাদি কর্তৃক ঘোষিত। এ জন্যে তাঁর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে বিশ্বমানবের প্রতি এ পরম ঐক্যবাণী ঃ

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَايَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –

(হে জনসমষ্টি!) তোমরা সকলে এমন একটি মহান বাণীর দিকে এস, যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান ও অভিন্ন। সে বাণী হল ঃ আমরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বন্দেগী করব না, তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করব না এবং আমাদের কেউই আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে পরস্পরকে রব্ব্ রূপে গ্রহণ করবনা। ......তোমরা যদি

www.amarboi.org

এ মহান ও কল্যাণকর ঐক্যবাণী গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হও, তা হলে তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা কিন্তু এ বাণীতেই আত্মসমর্পিত। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৪)

বস্তুত ইসলামী শিক্ষা-দর্শন এভাবেই চিরন্তন ও শাশ্বত মানবীয় ঐক্য ও একত্বের বাণী প্রচারের মহান দায়িত্ব পালন করেছে। ঈমানী একত্বের এ মহান বাণীতে তার বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র ঈমান-আকীদা ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সাংগঠনিক দিক দিয়েও ইসলামী শিক্ষা-দর্শন এক পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার প্রবর্তক। এর অংশগুলো পরস্পর এমনভাবে সম্পৃক্ত ও অবিচ্ছিন্ন যে, জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ নিয়ে তা এক অখণ্ড ঐকিক রচনা করে। তার প্রত্যেকটি দিক অপরটির জন্যে অপরিহার্য। ফলে একদিক রক্ষা করা হলেই দায়িত্ব পালিত হয় না; বরং একসঙ্গে ও একই সময়ে রক্ষা করতে হয় জীবনের সবগুলো দিক ও বিভাগ। এ কারণে কেউ শুধু নামায-রোযা ও হজ্ব-যাকাত আদায় করেই যথার্থ মুসলিম হতে পারে না—নিছক কতিপয় সামাজিক নিয়মবিধি পালন করেই দায়িত্ব এড়ান সম্ভব হয় না; সমস্ত ও সম্পূর্ণ জীবনটিকেই ইসলামের আওতাভুক্ত করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ জন্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ –

তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবে ইসলামী আদর্শানুগামী হও পরিপূর্ণভাবে এবং জীবনের কোন ক্ষেত্রেই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

(সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

বস্তুত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা মানবদেহের মতোই এক অবিচ্ছন্ন সংগঠন উপস্থাপন করেছে। ব্যক্তি ও সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংগঠনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের ছাঁচে ঢেলে জীবন গঠন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্যে প্রতিশ্রুত ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বাস্তবায়িত হতে পারে না। ইবাদত এ জীবন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। তার অবিভাজ্যতা ও অখণ্ডতা লক্ষণীয়। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, দ্বীন বলতে তার কিছু নেই'। 'যে লোক যাকাত দেয় না, তার নামাযও গ্রহণীয় নয়'। 'নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত এ চারটি ফরয সম্পর্কে তাঁর ইরশাদ হল : 'এর তিনটি পালন করলেই তার দায়িত্ব পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে সব কয়টি আদায় করবে।

সমাজ জীবনেও এই ঐক্য, একত্ব ও সাদৃশ্য রক্ষা করা অপরিহার্য। রাসূলের সম্মুখে দুইজন স্ত্রীলোকের কথা আলোচিত হয়। তার একজন খুব বেশী বেশী নফল নামায পড়ে; কিন্তু প্রতিবেশীদের জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়। আর অপরজন জরুরী নামাযসমূহ আদায় করে (নফল নামায বেশী পড়ে না); কিন্তু প্রতিবেশীদের কোনরূপ কষ্ট দেয় না। রাসূলে করীম (স) প্রথম স্ত্রী লোককে জাহান্নামী এবং দ্বিতীয়জনকে জান্নাতী বলে ঘোষণা

www.amarboi.org

করেন। জীবনের বিশাল ও বিপুল কর্মক্ষেত্রে যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি অপরিহার্য এবং অসঙ্গতি ও সংকীর্ণতা যে আদৌ থাকা অনুচিত, তারই দ্যোতনা এসব ঘটনায় রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন এই অখণ্ডতা সংস্থাপন করেছে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এবং কর্মজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে; যদিও জীবনের অস্বাভাবিক বিভাগ-বন্টনে মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো কলংকিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক, পারসিক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই বিভাগ-বন্টনের ফলেই মানবজীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ ও অসামঞ্জস্যতার আঘাত জর্জরিত। আর্যদের বর্ণবিভেদ, ইয়াহুদীদের ধর্ম ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্নতা, খৃস্টানদের খোদা ও কাইজারের মধ্যে বিভেদ এবং শেষোক্ত এ দুটি সমাজের বৈরাগ্যবাদ মানবজীবনকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে খণ্ডিত করে দিয়েছে। ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবনকে দুটি স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী ধারায় বিভক্ত করার দরুণ মানবজীবন ও সমাজ দেহ টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। বর্তমান সভ্যতা শেষের দিকে মানবীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার গালভরা বুলি প্রচার করতে শুরু করেছে বটে; কিন্তু জীবন-বুনিয়াদের শতধা-বিভক্তি তার এ বুলিকে প্রহসন ও বিদ্রূপে পরিণত করেছে। অথচ মানুষের দেহ-সত্তা বস্তু ও আত্মার সংমিশ্রণ ও অভিন্নতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন; তা মানব-প্রেমের দাবিদার বর্তমান সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অখণ্ড মানব সত্তার জন্যে অখণ্ড ও অবিভাজ্য জীবন ব্যবস্থা তথা শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা আধুনিক সভ্যতার ধারকরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সেখানে ধর্ম ও কর্মজীবন বিচ্ছিন্ন; নৈতিকতার সাথে অর্থনীতি সংযোগবিহীন; ইহকালের সাথে পরকাল বিবেচনা-বহির্ভূত। এ সভ্যতা তাই মানুষের জীবনে যেমন চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে, এখনকার শিক্ষাব্যবস্থাও ঠিক তেমনি মানুষের জীবনে কোন কল্যাণই আনতে পারেনি। যে শিক্ষা-দর্শন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পরের পরিপূরক জ্ঞানদানে নিবেদিত, একমাত্র সে শিক্ষা দর্শনই সার্বিকভাবে সমস্ত মানুষের জন্যে কল্যাণবহ। মুসলমান তথা সমগ্র মানুষের জন্যে তাই একমাত্র ইসলামী শিক্ষা-দর্শনই গ্রহণীয়—অন্য কিছু নয়।

www.amarboi.org

আল-কুরআনের শিক্ষা দর্শন

মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে কুরআনই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, এ কথা অনেকের নিকটই বিস্ময়কর মনে হয়। কেননা এ দৃষ্টিতে খুব কম লোকই চিন্তা-ভাবনা করেছেন আর এই দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছেন, এমন লোকও খুব বেশী পাওয়া যায় না। আমাদের তথাকথিত চিন্তাবিদদের অনেকেই কুরআন মজীদ পাঠ করেন নি আর করে থাকলেও তা না-বুঝে-শুনেই পাঠ করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, কুরআন মজীদ মানবতার জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক তুলনাহীন আকর বিশেষ। সাধারণভাবে গোটা মানব জাতির জন্যে এই কিতাবখানি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম গ্রন্থ রূপে গণ্য হতে পারে এবং বিশেষভাবে সামাজিক ও সামষ্টিক এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস হতে পারে।

সমস্ত বিষয়ের শুরু ও শেষ এবং মানুষ ও বিশ্বলোক তথা মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা ও পর্যালোচনাই যদি দর্শনের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন মজীদই হচ্ছে সেই দর্শনের উৎসমূল। আর ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যের লালন ও উৎকর্ষ সাধন এবং মানব প্রজাতি হিসেবে তাকে গড়ে তোলাই যদি প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হয়, তাহলে কুরআন মজীদই এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান সহায়ক। কেননা মানুষ ও সৃষ্টলোকের লালন ও প্রশিক্ষণের কথা কুরআন মজীদই বলেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়। আমরা যখনই বলি ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। তখনই আমরা বলি, সমগ্র বিশ্বলোকের প্রভু ও প্রতিপালক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তিনি কেবল মানুষেরই নন, সমস্ত সৃষ্টি লোকেরই প্রতিপালক। সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশ লাভ এবং মানুষের লালন-পালন, ক্রমবৃদ্ধি ও মানবীয় প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন স্পষ্টত কথা বলে। গোটা প্রকৃতি ও সমাজ-সমষ্টির মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের কথা কুরআনই বিশ্লেষণ করে। সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সে মানুষকে তাগিদ দেয়। মানুষের মন-মানস পরিচ্ছন্নকরণ ও তার আচার-আচরণ সুসংবদ্ধকরণে কুরআনের অবদান তুলনাহীন। কুরআনের প্রশিক্ষণ-দর্শনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাধারণভাবে সব কিছুর প্রশিক্ষণ দান। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সত্তার স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা কুরআন গ্রহণ করেছে। পরিবর্তন, বিবর্তন ও বিকাশ লাভের কথাও কুরআনে বাদ পড়েনি।

কুরআনের প্রশিক্ষণ সমগ্র বিশ্ব-ভূমণ্ডল, আকাশলোক, বস্তুলোক, আত্মার জগত ইত্যাদি সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত; সব কিছুর শুরু ও শেষ, বাহির ও ভিতর এবং স্থান ও

www.amarboi.org

কাল পর্যায়ের সব কিছুকেই তা শামিল করেছে। কুরআনের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হচ্ছে, এই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি বহু নন, এক ও একক। কুরআন-উপস্থাপিত 'তওহীদ'-এর আবেদন সর্বাত্মক ও সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্যশীল। কুরআন বস্তু ও আত্মার সমন্বয় সাধন করেছে—ঈমান ও বিবেকের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। তা দ্বীন ও দুনিয়াকে অভিন্ন করে দিয়েছে এবং চিন্তা ও কর্মের ঐক্য বিধান করেছে। তা স্বাদ ও কষ্ট, চেষ্টা ও ইবাদত, আদর্শ ও বাস্তব, মানুষ ও বিশ্বলোক এবং বিশ্বলোক ও বিশ্বস্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে সুস্পষ্টভাষায়।

কুরআন মানুষকে এক অবিভাজ্য 'একক' রূপে পেশ করেছে। বস্তু ও আত্মার মাঝে বিরোধ ও পার্থক্যকারী দর্শনকে কুরআন বাতিল করে দিয়েছে। কেবল আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে মশগুল থাকা এবং বৈষয়িক জীবন পরিহার কিংবা উপেক্ষা করার সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বীন ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যকারী দর্শনকে ইসলাম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। একই মানব সত্তাকে তাকওয়া ও ফাসিকী এই দ্বিমুখী ধারায় গড়ে তোলাকে এবং একই সমাজ-সমষ্টিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তকরণকে কুরআন বাতিল করে দিয়েছে। মানুষ মসজিদে 'মুত্তাকী' হবে আর নিজেদের পারস্পরিক লেন-দেনে প্রতারণা করবে, বাহ্যত নিজেকে বড় পরহেযগার হিসেবে জাহির করবে আর গোপনে সে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করবে কিংবা জুয়া খেলবে—কুরআন তা মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। সমাজের কিছু লোক মহা সুখ-স্বাচ্ছন্দে লিপ্ত হবে আর অবশিষ্ট লোক নিজেদের দেহ ও আত্মার সম্পর্ক রক্ষার মত খাদ্যও পাবে না—কুরআন এই নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। এক কথায় বলা যায়, কুরআনের দর্শন মানব সত্তার পরম ঐক্য ও একত্বের দর্শন। বিবেক-বুদ্ধি, দয়া-মায়া, সহানুভূতি ও বাস্তব কাজ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। কুরআনের দর্শন ঐক্য ও সৃংখলার দর্শন। ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি এবং মানুষ ও বিশ্বলোক ও বিশ্বস্রষ্টার পারস্পরিক সম্পর্ক রচনা হচ্ছে কুরআনের দর্শন। কুরআনের ব্যাপকতা ও সর্বাত্মকতা, তথা তওহীদ বলতে আমরা এটাই বুঝি।

বিকাশ, ক্রমবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কুরআনী প্রশিক্ষণের সাথে পুরোপরি সামঞ্জস্যশীল। কুরআনের উন্নয়ন উচ্চতর আদর্শের দিকে—উচ্চতর আদর্শিক জীবনের দিকে মানুষের অব্যাহত অগ্রগতি। মহত্ত ও পূর্ণত্বের দিকে কুরআনের অগ্রসরতাই কল্যাণকর উন্নয়ন। যে উন্নয়ন মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তাকে পশুত্ব ও পাশবিকতার নিকটে পৌঁছে দেয়, কুরআনের নিকট তা সমর্থনযোগ্য নয়। অতএব আত্মিক, নৈতিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করাই কুরআনী প্রশিক্ষণের সার কথা।

কুরআনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, প্রশিক্ষণের পথ ও পন্থা এবং সর্বশেষে কুরআনী প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি ও নিয়ম জানাই প্রকৃত প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য।

www.amarboi.org

কুরআনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

কুরআন যে প্রশিক্ষণ-লক্ষ্য উপস্থাপন করেছে, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১. মানুষের সংজ্ঞা ও পরিচয়। সৃষ্টিলোকে ব্যক্তি মানুষের স্থান এবং এই পার্থিব জীবনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. ব্যক্তি মানুষের সামাজিক পরিচিতি, সমাজ-সমষ্টিতে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩. বিশ্বপ্রকৃতির সাথে ব্যক্তি মানুষের পরিচিতি, স্রষ্টার সৃষ্টিকুশলতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং বস্তুর ভোগ-ব্যবহারে মানুষের প্রতিষ্ঠা।

৪. বিশ্বস্রষ্টার সাথে ব্যক্তি মানুষের পরিচিতি এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধকরণ।

এ চারটি লক্ষ্য বাহ্যত ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন মনে হলেও মূলত এগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত—কোনটাই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র নয়। অন্য কথায় বলা যায়, প্রথমোক্ত তিনটির লক্ষ্য চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে চতুর্থ লক্ষ্যটিতে। প্রথমোক্ত তিনটির লক্ষ্য পূর্ণত্ব লাভ করে চতুর্থ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে। সে চতুর্থ লক্ষ্যটি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ এবং তাঁর আনুগত্য তথা আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার প্রবণতা অর্জন। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ, তাঁর আনুগত্য তথা আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। আত্মোপলব্ধি বা আত্মসচেতনতা, সমাজ-সচেতনতা ও বিশ্বলোক ব্যবস্থা অনুধাবন এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য নয়, এ সব হচ্ছে মূল লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার উপায় ও উপকরণ মাত্র। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামী প্রশিক্ষণের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভিত্তিতে মানুষের পুনর্গঠন এবং তাঁর আদেশাবলী পালন ও নিষেধসমূহ পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের ইচ্ছা-বাসনা মানব মনে জাগিয়ে তোলা। বিশ্বপ্রকৃতি যেসব আইনের ভিত্তিতে চালিত হচ্ছে এবং যেসব নৈতিক বিধিবিধান গ্রহণ ও অনুসরণের জন্যে কুরআন মজীদ আহ্বান জানায়, এই উভয়বিধ আইন-বিধানই মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ, মহাসত্য ও পরম সৌভাগ্য লাভ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এই সবকিছুর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। এ থেকে জানা গেল যে, বিশ্বস্রষ্টা প্রবর্তিত 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এ পদচারণা কেবল মুমিন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আর আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে চলার নামই হচ্ছে ইবাদত—সে নিয়ম-বিধান প্রকৃতিগত হোক কি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক হোক, বৈষয়িক কিংবা ইহলৌকিক কি হোক পরলৌকিক।

অতঃপর আমরা মূল কুরআনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। এখানে আমরা এমন কতক আয়াত উদ্ধৃত করব যা মানুষের মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বের কথা

www.amarboi.org

সুস্পষ্ট করে তোলে। তারপর আমরা এমন কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করব যা থেকে বিশ্বলোক ও বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে কুরআন কি ধারণা দেয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে কুরআন

কুরআন মজীদে মানুষ সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তা সর্বাত্মক, বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ও পুরামাত্রায় ভারসাম্যপূর্ণ। বস্তুবাদী দার্শনিকরা মানুষকে নিছক একটা রক্ত মাংসের জীব, নানা রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় এবং নিছক যন্ত্র-সর্বস্ব মনে করেছে। কিন্তু কুরআন তা স্বীকার করেনি। কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ বস্তুসর্বস্ব নয়—নয় বস্তুনিরপেক্ষ নিছক আত্মা-সর্বস্ব। কুরআন মানুষকে বস্তু ও রূহের সমন্বিত সত্তারূপে পেশ করেছে। আর এ দুটি জিনিস পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত, সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট এবং পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন। মানুষ নিছক জন্তু বা জীব নয়। জন্তু ও জীবগুলোর আয়ুষ্কালের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। দেহ-সত্তার বস্তুনিষ্ঠ বিচারে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মানুষ এমন সত্তাও নয়, যার ওপর অধিক সম্মানার্হ আর কেউ নেই বলে মনে করা যেতে পারে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কথাটি কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র সত্য নয়।

তবে কুরআনে মানুষের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে কেবল তখন, যখন সে নিজেকে সঠিক ও যথার্থভাবে জানতে ও চিনতে পারবে এবং জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি সমন্বিত হবে। মানুষ যদি এই গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরবৎ হয়ে যায়, তাহলে তার মনুষ্যত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে।

কুরআন ব্যক্তি মানুষের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করে। সে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হওয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ-সমষ্টি গড়ে ওঠে এসব দায়িত্বশীল ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। কুরআন ব্যক্তি-সত্তা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে কিছুমাত্র উপেক্ষা করেনি, ক্ষুণ্ন বা চূর্ণ করেনি তার সম্মান ও মর্যাদা। তার অস্তিত্বকে কোন দিক দিয়েই অস্বীকার করা হয়নি—অর্থহীন বা অন্তঃসারশূণ্যও বলা হয়নি। অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিসত্তাকে সমাজ-সমষ্টির যাঁতাকলেও নিষ্পেষিত হতে দিতে প্রস্তুত নয়। অবশ্য কুরআন ব্যক্তিকে সমাজ সত্তার অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছে আর এ সমাজ গঠিত হয় সমাজপ্রবণ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। মানুষ সম্পর্কে ধারণা দানকারী কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

www.amarboi.org

মানুষ বস্তু ও রূহ সমন্বিত :

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ – فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ
وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ –

(তখনকার কথা চিন্তা করে দেখ) তোমার রব্ব যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন : আমি মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব। তারপর তাকে যখন ভারসাম্যপূর্ণ করে তুললাম এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন তারা (ফেরেশতারা) তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে গেল। (সূরা সা'দ : ৭১ও ৭২)

কুরআনের ঘোষণানুযায়ী মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা এই পৃথিবীর বুকে। আর তা শধু এজন্যে যে, মানুষ জ্ঞান ও শিক্ষাসম্পন্ন সত্তা। বলা হয়েছে :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا
اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ – وَعَلَّمَ اٰدَمَ
الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ
بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا
مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ – قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ
بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ
اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ –

(সে সময়ের কথা চিন্তা করে দেখ) যখন তোমার রব্ব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা বানাব। তখন তারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কিছু বানাবে যা সেখানে অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার প্রশংসা করছি ও তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি? জবাবে আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। অতঃপর তিনি আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। বললেন, এগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও, যদি তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা বলল : হে আল্লাহ! পবিত্র ও মহান তুমি। আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি যতটুকু তুমি আমাদের জানিয়েছ। আসলে তুমিই সূক্ষ্মদর্শী, মহাবিজ্ঞানী।

www.amarboi.org

অতঃপর তিনি বললেন : হে আদম! তুমি এদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম জানিয়ে দাও। সে যখন তাদেরকে সেই নামগুলো জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমিই আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল অদৃশ্য বিষয় জানি; তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর তা-ও জানি।

(সূরা বাকারাহ : ৩০ — ৩৩)

এই সৃষ্টিলোকের বহু কিছুরই ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। ঘোষণা হয়েছে :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا –

আদম বংশকে আমরা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি স্থল ও জল ভাগে (চলাচলের জন্য) এবং তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন-উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি রিযিক হিসেবে দিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টিসমূহের অনেকেরই ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছি।' (সূরা বনী-ইসরাঈল : ৭০)

এ আয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ মর্যাদায় ভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কথাও ঘোষিত হয়েছে। তাকে সব কিছুর ওপর তুলে দেয়ার বা সব কিছুর নিম্নে রাখার মতো কোন বাড়াবাড়ি করা হয়নি, বরং যথার্থ স্থানই তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে।

মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا – لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا – وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا –

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝখানে যা কিছুই রয়েছে, তা সবই দয়াময় আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবে বান্দাহ্ হিসেবে। তিনি সর্বব্যাপক এবং তাদের সকলকে গণনা করে ও প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের সকলেই কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে উপস্থিত হবে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে। (সূরা মরিয়াম : ৯৩ — ৯৫)

মানুষ ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ –

প্রতিটি মানুষ যা কিছুই উপার্জন করবে, তা সে-ই পাবে। কোন বোঝা বহনকারীই

www.amarboi.org

অপর কারোর বোঝা বহন করবেনা। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদের সেই বিষয়ে সঠিক কথা জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করছিলে।

(সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا - اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰی بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا -

প্রতিটি মানুষের গলদেশে তার আমলনামা বেঁধে ঝুলিয়ে দেব। আর কিয়ামতের দিন তার জন্যে একখানি লিপিকা প্রকাশ করব, যাকে সে উন্মুক্ত কিতাব রূপে পাবে। (তাকে বলা হবে) তুমি পড় তোমার নিজের কিতাব। আজ তোমার নিজের হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩ ও ১৪)

সামষ্টিক প্রশিক্ষণে কুরআন

কুরআন মজীদ একটা সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। এ সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থাটি কুরআনী আইনের নির্দেশনা এবং ঐক্য, সংহতি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের ওপর স্থাপিত। কুরআনের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল মানবিক ব্যবস্থার মৌলিক ভাবধারা। কুরআন মজীদ ডিকটেটরী বা একনায়কত্বমূলক শাসন পদ্ধতি সমর্থন করেনি, যেমন সমর্থন করেনি গণতান্ত্রিক হট্টগোল ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

কুরআন পারিবারিক ব্যবস্থাকে একটা সুদৃঢ় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। ধনতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা তা স্থাপন করেছে নিছক জৈবিক চাহিদার ওপর আর কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র তা প্রতিষ্ঠিত করেছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর। কুরআন পারস্পরিক চুক্তি-প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তার স্বাধীনতা ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। তবে এ সবই সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির চেতনা সহকারেই সম্পন্ন করতে বলেছে। এক কথায় ইসলামী সমাজ কুরআনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাতে অগ্রগামিতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কোন স্থান দেয়া হয়নি। তা বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন ও লোকদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। বস্তুত ইসলামী সমাজ অতীব উচ্চমানের ও যথার্থ তাৎপর্যসম্পন্ন একটি মানবিক সমাজ। তাতে যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত মানবীয় সাম্য পুরোপুরি স্বীকৃত। দার্শনিক ও

www.amarboi.org

চিন্তাবিদগণ আজ পর্যন্ত মানবীয় সামাজিকতা পর্যায়ে যত উন্নত চিন্তা করতে সমর্থ হয়েছে, ইসলামী সমাজব্যবস্থা তার চাইতেও অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। অথচ তাতে না আছে কোনরূপ বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন আর না তা প্রয়োজনীয় মানেরও নিম্নে অবস্থিত। এই সব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব নিয়েই ইসলামী সমাজ আল্লাহ্‌র পরিচিতি পর্যন্ত পৌঁছায়। কুরআন উপস্থাপিত সমাজ সংগঠন ও প্রশিক্ষণে কুরআনের লক্ষ্য বুঝবার জন্যে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ বিবেচ্য ঃ

সামাজিক ঐক্য ও একাত্মতা

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ -

তোমাদের এই উম্মত এক ও অভিন্ন উম্মত আর আমিই তোমাদের রব্ব—প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার বান্দাহ্ হয়ে বসবাস কর।

(আম্বিয়া ঃ ৯২)

ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা

وَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

তোমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধরে থাক এবং কখনো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ো না। (আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

সমাজের লোকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মুমিনরা সব ভাই ভাই। (সূরা হুজরাত ঃ ১০)

সমাজের সব অংশের—দল-উপদল, জাতি ও নারী-পুরুষের সাম্য স্বীকৃত

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে আর তোমাদের বানিয়েছি বহু গোত্র ও বিভাগ সমন্বিত, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচিতি লাভ করতে পার। আসলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ্‌ভীরু। (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ -

www.amarboi.org

আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাত্রে ও দিনে নিদ্রা গমন এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। বস্তুত তাতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে। (সূরা রূম ঃ ২৩)

সামাজিক ও সামষ্টিক সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ...

তোমরা সকলে পরস্পরের সহযোগিতা কর পুণ্যময় ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে এবং সহযোগিতা করো না পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহদ্রোহিতামূলক কাজে আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। (সূরা মায়িদাহ ঃ ২)

পরামর্শ জীবনের ভিত্তি

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ .....

(হে নবী!) আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের জন্যে খুব নম্র হয়েছ। তুমি যদি রূঢ়ভাষী ও পাষাণ-হৃদয় হতে তাহলে লোকেরা তোমার পাশ থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে দূরে সরে যেত। অতএব তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর, ওদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত চাও এবং ওদের সাথে সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ কর।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ -وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

আল্লাহ্র নিকট যাকিছুই রয়েছে তা-ই অতীব উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রব্ব-এর ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করে, যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতার কাজ পরিহার করে চলে আর যখন ক্রুদ্ধ হয় ক্ষমা করে দেয়, যারা নিজেদের রব্ব-এর ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে ও নিজেদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ করে এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে। (আশ্-শূরা ঃ ৩৬ থেকে ৩৮)

www.amarboi.org

প্রেম-ভালবাসা ও সহৃদয়তাই পারিবারিক জীবনের ভিত্তি

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

আল্লাহ্‌র অন্যতম নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার নিকট থেকে সান্ত্বনা ও মনের প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার অনুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে রয়েছে বিপুল নিদর্শনাদি। (আর-রূম ২১)

ন্যায়পরায়ণতামূলক ধন-বন্টন ব্যবস্থা

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَامَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (অর্থাৎ সম্পদ) সঞ্চিত করে রাখে, তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে সুসংবাদ দাও পীড়াদায়ক আযাবের। একদিন এইসব স্বর্ণ ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে চিহ্ন দেয়া হবে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে। বলা হবে, তোমরা নিজেদের জন্যে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলে এ হচ্ছে তা-ই। অতএব এখন তোমরা তোমাদের সঞ্চয়ের স্বাদ আস্বাদন কর। (তওবা ঃ ৩৪ ও ৩৫)

وَفِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।

(সূরা যারিয়াত ঃ ১৯)

وَالَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ -لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

আর যাদের ধন-সম্পদে একটা সুনির্দিষ্ট হক্ রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের জন্যে। (সূরা মা'আরিজ ঃ ২৪ ও ২৫)

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -

www.amarboi.org

আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর সুদের লেন-দেন হারাম করেছেন। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৭৫)

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ –

আল্লাহ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-সদকায় ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৭৬)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْ –

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত-দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্যে নিজেদের রব্ব-এর নিকট অনেক শুভ ফল রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই—নেই কোন দুঃখ। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৭৪)

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَا سَعٰى – وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى–ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى –

মানুষের জন্যে কিছুই নেই, আছে শুধু ততটা যার জন্য সে চেষ্টা ও শ্রম করেছে আর তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবশ্যই নিরীক্ষণ করা হবে। অতঃপর তার পূর্ণমাত্রায় প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরা আন-নাজম ঃ ৩৯ থেকে ৪১)

চুক্তি অনুযায়ী কাজ করার বাধ্যবাধকতা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো। (সূরা মায়িদাহ ঃ ১)

সামষ্টিক জবাবদিহি ও দায়িত্ব বহন, পরস্পরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ –

তোমরাই উত্তম জনগোষ্ঠী, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে লোকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখ। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ –

www.amarboi.org

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত ও আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া পোষণ করত, তাহলে আমরা তাদের জন্যে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থেকে অফুরন্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা উল্টা অমান্য ও অস্বীকার করল। ফলে আমরাও তাদের কাজের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৯৬)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ –

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি জনপদ বড়ই শান্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তায় ভরপুর ছিল। তার নিকট সর্বদিক দিয়ে প্রশস্ত রিযিক আসছিল। তারপর তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের প্রতি না-শোকরী ও অমর্যাদা প্রদর্শন শুরু করল। ফলে আল্লাহ তাদের ওপর ক্ষুধা ও ভয়ের মুসীবত চাপিয়ে দিলেন আর এভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করল। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১১২)

সমাজ সংস্কারের কাজ অব্যাহতভাবে চালাতে হবে

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ –

যে জনপদের লোকেরা সংশোধন ও সংস্কারের কাজ অব্যাহতভাবে চালাতে থাকে, তোমার আল্লাহ সে জনপদকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না। (সূরা হূদ ঃ ১১৭)

আত্মরক্ষার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানও কর্তব্য

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ –

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত। তবে এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯০)

শত্রুর মুকাবিলায় সদা সতর্ক ও পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত থাকতে হবে

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ –

তোমরা শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার জন্যে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করো, চলাচলের ঘোড়া (অর্থাৎ যানবাহন) ইত্যাদি তৈরী রাখ। এসবের দ্বারা তোমরা

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র এবং নিজেদের শত্রুদেরকে ভয় দেখাবে এবং এমন সব শত্রুকেও ভীত শঙ্কিত করবে ...যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ্‌ জানেন।

(সূরা আনফাল : ৬০)

নরহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ -

হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! নরহত্যার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ 'কিসাসেই'—হত্যাকারীকে হত্যা করাতেই—তোমাদের জন্য জীবন নিহিত।

(সূরা বাকারাহ্‌ : ১৭৯)

সুখ-স্বচ্ছন্দে ভারসাম্য রক্ষা

يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ -

হে আদম বংশ! তোমরা প্রতিটি মসজিদের ক্ষেত্রে নিজেদের ভূষণে সুসজ্জিত হও এবং খাও, পান কর; কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। কেননা আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)

মদ ও জুয়াখেলা নিষেধ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! মদ্যপান, জুয়াখেলা, বলিদানের আস্তানা ও ভাগ্য জানার কলাকৌশল—এসবই শয়তানী কার্যক্রমমূলক অপবিত্রতাবিশেষ। অতএব তোমরা এর প্রতিটি কাজই পরিহার কর; তাহলে আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা মায়িদাহ্‌ : ৯০)

পরিবর্তন ও উন্নয়ন এবং স্থবিরতা প্রতিরোধ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

কোন জাতি নিজেরাই যদি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে তাহলে আল্লাহ্‌ও তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন না। (সূরা রা'দ : ১১)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا

www.amarboi.org

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ط اَوَلَوْكَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَايَهْتَدُوْنَ –

তাদেরকে যখন বলা হয়, আস আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে আমাদের জন্যে তা-ই যথেষ্ট যার ওপর চলমান পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষকে—যদি তাদের পূর্বপুরুষ কিছু না-ও জানত ও হেদায়েতপ্রাপ্ত না-ও হয়ে থাক........তা সত্ত্বেও। (সূরা মায়িদাহ ঃ ১০৪)

চিন্তা-বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –

দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই। কেননা প্রকৃত ও নির্ভুল সত্য-পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে ভিন্নতরভাবে সুস্পষ্ট ও শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৫৬)

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ –

তুমি কি লোকেদের ওপর জোর-জবরদস্তি চালাবে যেন তারা মুমিন হয়? (সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ –

বল হে জনগণ! তোমাদের নিকট মহাসত্য উপস্থিত হয়েছে তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে। কাজেই যে লোক হেদায়েত গ্রহণ করবে, সে হেদায়েত গ্রহণ করবে নিজেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে। আর যে লোক গুমরাহ হয়ে গেল, তার গুমরাহীর কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের উকীল নই।

(সূরা ইউনুস ঃ ১০৮)

এই আয়াতসমূহ থেকে মানুষের সমাজ জীবনের কোন-না-কোন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদের একটি সূরায় এক সঙ্গে 'দশটি উপদেশ' উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত মূসা'র শরী'আতের দশটি উপদেশ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর; কাজেই কুরআনে বিশ্বাসী লোকদের এ দশটি উপদেশ মন-প্রাণ দিয়ে শোনা ও গ্রহণ করা কর্তব্য। বস্তুত তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন পুনর্গঠনের জন্যে এ 'দশটি উপদেশ' যাতে ভিত্তি প্রস্তরের কাজ করতে পারে সে উদ্দেশেই এগুলো কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। উপদেশগুলো হচ্ছে ঃ

www.amarboi.org

১. আল্লাহ্‌র সাথে একবিন্দু শিরক করবে না, তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২. পিতা-মাতার সাথে অতীব উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

৩. দারিদ্রের কারণে সন্তান হত্যা করতে পারবে না—সন্তানের জন্মও বন্ধ করতে পারবে না। কেননা আমিই তোমাদের রিযিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি—তাদেরকেও আমিই দেব।

৪. নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশমান হোক কি গোপনীয়।

৫. নরহত্যা করবে না; কেননা আল্লাহ্ তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তবে সত্য বিধানের ভিত্তিতে হত্যা করা হলে স্বতন্ত্র কথা; তা করা যাবে। তোমরা বুঝবে ও অনুধাবন করবে, এই আশায়ই তোমাদেরকে এই উপদেশ দেয়া হচ্ছে।

৬. ইয়াতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাবে না। তবে উত্তম পন্থায় কিছু করতে হলে স্বতন্ত্র কথা—যতক্ষণ না তারা পূর্ণবয়স্ক ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে।

৭. পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ মাত্রায় সুবিচার সহকারে করবে। তবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত যতটুকু ততটুকু করারই দায়িত্ব, তার বেশীর জন্যে কোন চাপ নেই।

৮. তোমরা যখন কথা বলবে, ভারসাম্য, সুবিচার ও ন্যায়নীতিপূর্ণ কথা বলবে, যদিও তা তোমাদের নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেই বলা হোক-না কেন।

৯. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। তোমরা এ উপদেশ গ্রহণ করবে, এই আশায়ই এসব কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে।

১০. এই হচ্ছে আমার নির্দেশিত পথ ও জীবন পদ্ধতি। এটা সহজ, সরল ও সুদৃঢ়। অতএব তোমরাও এই উপদেশ মেনে চল—এই পথেরই অনুসরণ কর। এ ছাড়া আর যত পথ ও পন্থা রয়েছে, তার কোনটিরই অনুসরণ করো না। যদি কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র দেখানো ও রাসূলের অবলম্বিত এই পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমাদেরকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে এই আশায় যে, তোমরা এটি গ্রহণ করে ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।'

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১ থেকে ১৫৩ আয়াত)

এ সব আদেশ ও উপদেশ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআনী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হচ্ছে সমাজ এবং এ সবের মূলে নিহিত রয়েছে 'তাক্‌ওয়া'—আল্লাহ-বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র ভয়। আর এ তাক্‌ওয়ার পরিণাম হচ্ছে সামাজিক সুবিচার। এ সমাজ গঠিত হবে ব্যক্তিদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভূতি, অগ্রাধিকার দান, কল্যাণ কামনা, ক্ষমাশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের পবিত্র ভাবধারার সমন্বয়ে। তাতে অবশ্যই চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর

www.amarboi.org

থাকবে দায়িত্ব ও জবাবদিহির ব্যবস্থা। ব্যক্তি স্বাধীনতার আসল ও সঠিক ভাবধারা এখানেই কার্যকর হওয়া সম্ভব হবে। আর এ কারণেই এরূপ এক আদর্শ ও উন্নত সমাজই বিশ্বমানবতার লক্ষ্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এরূপ সমাজে যেমন জুলুম-শোষণ থাকতে পারে না, তেমনি আল্লাহদ্রোহিতা, সীমালংঘন, ধ্বংস-বিপর্যয় ও বঞ্চনারও কোন স্থান থাকবেনা। কুরআন যে-সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক আদর্শ উপস্থাপন করেছে, তার সাথে মানব রচিত কোন সমাজ ব্যবস্থারই তুলনা হতে পারেনা।

বিশ্বলোক সম্পর্কে কুরআন

কুরআন মজীদ বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশ্বচরাচর ও তার অন্তর্নিহিত ব্যবস্থাদির দিকে। বিশ্বলোক সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে অতি সহজেই নিম্নোদ্ধৃত সত্যসমূহ লাভ করা যায় ঃ

ক. এই বিশ্বলোক এক মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটা স্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান সদা কার্যকর এবং তাতে নিহিত রয়েছে শাশ্বত দৃঢ়তা, অবিচলতা ও অকাট্য যৌক্তিকতা তথা কার্যকারণ পরম্পরা। এই বিশ্বলোকের একটা নিয়ম ও ব্যবস্থা রয়েছে; সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমও আছে। এ কারণেই বলা যায়, এই বিশ্বলোক কিছুমাত্র অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয় এবং এটি নিতান্তই খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয় নি।

খ. সমগ্র বিশ্বলোক ও তার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিস, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্ব ও তথ্য যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করা মানুষের কর্তব্য। তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহান স্রষ্টার অত্যন্ত নিপুণ, কুশলী ও দয়ালু হস্ত ও কুদরতের সন্ধান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

গ. এই বিশ্বলোকে মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টবস্তুর (Beings) মাঝে একটি অটুট সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লাহ মানুষকে এই বিশ্বলোকের অনেক কিছুই নিজের আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন করার এবং প্রকৃতির বহু শক্তিকে নিজের কল্যাণে ব্যবহার করার শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন, যদিও এ ব্যবহারে কোনরূপ বাহুল্য ব্যয়ের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

চ. বিশ্বপ্রকৃতির গভীর ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও বিস্ময়াবিষ্টতা (Astonishment) প্রয়োগ করে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের মন-মানসিকতা লাভ করবে।

(ছ) মানুষকে আহ্বান জানান হয়েছে, সে যেন সৃষ্টির দাসত্ব ও বন্দেগীতে নিমজ্জিত না হয়; বরং সে যেন মহান স্রষ্টার দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তারই আরাধনা ও উপাসনায় ব্রতী হয়।

এ পর্যায়ে মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন মজীদ কোন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (Natural Science) গ্রন্থ নয়। কেউ কেউ অবশ্য তা-ই মনে করে মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে

www.amarboi.org

গেছে। কুরআন প্রাকৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যে প্রেরণা দেয়—উদ্বোধন সৃষ্টি করে। এই মহাগ্রন্থে জোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, জীব-জন্তু, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে বটে; কিন্তু আসলে কুরআন এ সবেরও উর্ধ্বস্থ এক মর্যাদাসম্পন্ন মহাগ্রন্থ। কুরআন মানুষকে বস্তুলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যয়ন ও গবেষণার স্তর পেরিয়ে আরও উর্ধ্বে, আরো উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায় এবং বাহ্যিক দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা মানুষের অবাক দৃষ্টির সম্মুখে উদঘাটিত করে দেয়। কুরআনে যে সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব ও জ্ঞানের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা স্বতঃই কোন লক্ষ্য নয়, তা মাধ্যম বা প্রসঙ্গত বলা কথা মাত্র । আসলে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের তুলনাহীন গ্রন্থ হচ্ছে এই কুরআন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা যন্ত্র আবিষ্কারের প্রক্রিয়া শিখানোর উদ্দেশ্যে এই কিতাব নাযিল হয়নি। তবে বিশ্বলোক সৃষ্টি এবং এর মধ্যে নিহিত তত্ত্ব-রহস্য ও বিজ্ঞানসম্মত কথা-বার্তার উল্লেখ রয়েছে এর কোন কোন আয়াতে। আমরা এখানে সে পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত তুলে দিচ্ছি ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ –

তিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন কোন দৃশ্যমান খুঁটি ছাড়াই এবং জমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন যেন তোমাদেরকে নিয়ে তা হেলতে দুলতে না পারে। আর তাতে নানা প্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছি ও তার সাহায্যে নানাপ্রকার সুন্দর ভাল জুড়ির উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি । (সূরা লুকমান ঃ ১০)

এ আয়াতটি অতি সংক্ষেপে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য প্রকার জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ সৃষ্টি ও এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করছে ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ –

তিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে পরম সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক কাঠামো দান করেছেন অতীব উত্তম ও সুন্দর আকার-আকৃতিতে। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

www.amarboi.org

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ – فَالِقُ
الْاِصْبَاحِ ج وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ط ذٰلِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ
لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ – وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَّمُسْتَوْدَعٌ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ – وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط اِنَّ فِىْ
ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জীব ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে।.....এই সব কাজেরই আসল কর্তা হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ। তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? রাত্রির আবরণ দীর্ণ করে তিনি প্রভাত-রশ্মির উন্মেষ করেন। তিনি রাত্রিকালকে শান্তিময় বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন। এ হচ্ছে পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নির্ধারিত পরিমাপ। তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা সেসব দ্বারা স্থল ও জলভাগের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে পথ বের করে নিতে পার। নিশ্চয়ই আমরা নিদর্শনাবলীকে খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছি জ্ঞানী-গুণী লোকদের জন্যে। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র প্রাণী (ব্যক্তি) থেকে। অতঃপর প্রত্যেকের জন্যেই একটি স্থিতি লাভের স্থান ও একটি গচ্ছিত রাখার স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা সমঝদার লোকদের জন্যে এই নিদর্শনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পেশ করলাম। তিনিই ঊর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন। অতঃপর তার সাহায্যে আমরা প্রতিটি উদ্ভিদ সাজিয়েছি । অতঃপর তা থেকে বের করেছি সবুজ-শ্যামল ক্ষেত-খামার এবং তা থেকে বের করেছি নানা

৮–

www.amarboi.org

কোষসম্পন্ন দানা আর খেজুর মোচা থেকে তার ভারনত ছড়াগুচ্ছ বানিয়েছি এবং আঙ্গুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছি, যেখানে ফলসমূহ পরস্পর সদৃশ কিংবা পরস্পর বিভিন্ন। তোমরা এ সবের ফল লক্ষ্য করে দেখ যখন তা বাহির হবে ও পাকবে। নিশ্চয়ই এ সবের মধ্যে ঈমানদার লোকদের জন্যে নিদর্শনাদি রয়েছে।

(সূরা আল্-আন'আম ৯৫ —৯৯)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - لَوْاَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ - بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তা আমরা নিতান্ত খেলার ছলেই সৃষ্টি করিনি। আমরা যদি এই সব খেলার সামগ্রীরূপে বানাতে চাইতাম, তাহলে আমরা তা-ই করতাম যদি তা করতে আমরা প্রস্তুত হতাম; বরং আমরা প্রকৃত সত্যকে দিয়ে বাতিলের ওপর আঘাত হানি, তা তার মস্তক চূর্ণ করে দেয় এবং চোখের সামনেই তা বিলীন ও নির্মূল হয়ে যায়। .. তোমরা যেসব কথা-বার্তা বলে বেড়াও সে জন্যে ধ্বংস তোমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী।

(সূরা আম্বিয়া ঃ ১৬—১৮)

স্রষ্টা সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য

কুরআন সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে যে কাজটি করে, তা হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে প্রকৃত সম্পর্ক নিরূপণ ও নির্ধারণ করা। এই মহাগ্রন্থ মানুষের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছে, মানুষ ও সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের দিকে, তাঁর নবোদ্ভাবন নীতির দিকে এবং তাঁর সুষ্ঠু সৃজনশীলতা ও অপার দয়-মায়ার অসীম সমুদ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব জীবন পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তোলার জন্যে মহান সৃষ্টার সঠিক পরিচিতি লাভ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভয়ভীতির অনুভূতি অর্জনই উচ্চতর প্রশিক্ষণের লক্ষ্য আর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনে তাঁর আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ কার্যকর করণই হচ্ছে তাঁর ইবাদতের মর্মার্থ। কুরআন আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে তওহীদী সিফাতের ওপর। তাতে মহান আল্লাহ্‌কে সর্বতোভাবে এক ও একক বলে মেনে নেয়া এবং সর্বপ্রকার শিরক থেকে তাঁর মুক্ত ও পবিত্র থাকার কথা স্বীকার করে নেয়ার প্রবল আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র স্থান কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তিনি অপরিবর্তনশীল। তাঁর শরীক বা সদৃশ কেউ নেই—নেই কেউ

www.amarboi.org

সমতুল্য, প্রতীক বা দৃষ্টান্ত কেউ নেই, প্রতিদ্বন্দী কেউ নেই; তিনি কারো জাত নন, তাঁর জাতও কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত, অক্ষয়; তিনি এক ও একক, স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ; তিনি অমুখাপেক্ষী, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি যা-ই চান তা-ই করতে সক্ষম, করতে পারার অধিকারী; তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তাঁর কর্মকুশলতা তুলনাহীন, জ্ঞান সীমাহীন, শেষহীন, ও সর্বব্যাপী। সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্যে তিনি অতুলনীয়। এ সব কথা প্রমাণকারী কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ – لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ –

এই হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেহ ইলাহ নাই। তিনি প্রতিটি জিনিসেরই স্রষ্টা, তিনি প্রতিটি জিনিসেরই দায়িত্বশীল; অতএব, তাঁর দাসত্ব কবুল কর। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে পারেনা, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি খুবই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

(সূরা আন'আম ঃ ১০২ ও ১০৩)

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ –

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিকারী; তিনি তোমাদের প্রজাতির মধ্য থেকেই তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন; জন্তুদের মধ্য থেকেও জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি তোমাদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে থাকেন। বিশ্বলোকে তাঁর সদৃশ কোন জিনিসই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ঃ ১১)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ – لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يُحْيِ وَيُمِيْتُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছুই আছে, সবই তাঁর তসবীহ—পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনিই মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব ও

www.amarboi.org

সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশমান এবং তিনিই অপ্রকাশিত। তিনিই প্রতিটি বিষয়ে অবহিত।

(সূরা হাদীদ ঃ ১—২)

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তোমরা যা কিছুই কর, তিনি তা দেখেন। (সূরা হাদীদ ঃ ৪)

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

যদি আকাশ ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া আরও বহু ইলাহ হতো তাহলে এ দুয়ের শৃংখলা ব্যবস্থাই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। অতএব আরশ অধিপাত মহান আল্লাহ পবিত্র, সেই সব থেকে যা এই লোকেরা যা বলে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২২)

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا - سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا -

লোকদেরকে বল, আল্লাহর সাথে আরও যদি মা'বুদ বা উপাস্য থাকত, তাহলে তারা আরশ-অধিপতির নিকট পর্যন্ত পৌছতে অবশ্যই চেষ্টা করত; অতএব আল্লাহ মহান ও পবিত্র, সেই সব বড়বড় কথাবার্তা থেকে যা এই লোকেরা বলে।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪২ ও ৪৩)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ-

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্যও নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক উপাস্যই তার সৃষ্টদের নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং তাদের কতিপয় অপর কতিপয়ের ওপর চড়াও হয়ে বসত। আল্লাহ মহান পবিত্র সে সব পরিচিতি থেকে যা এই লোকেরা তার প্রসঙ্গে বলে।

(সূরা মুমিনুন ঃ ৯১)

www.amarboi.org

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

বল, তিনি আল্লাহ এক ও একক। তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, বরং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ -

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা। সমগ্র বিশ্বলোককে তিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তাঁকে নিদ্রা বা তন্দ্রা কখনো স্পর্শ করেনা। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট কে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা লোকদের সামনে আছে আর যা আছে তাদের পিছনে সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কেউ তাঁর জ্ঞান থেকে কোন কিছুই আয়ত্ত করে নিতে পারেনা—তবে তিনি নিজে যদি চান। তাঁর আসন সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এদুটির সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান সুউচ্চ-বিরাট। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

কুরআন মজীদ উপস্থাপিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চরম লক্ষ্য কি? সংক্ষেপে বললে তা হচ্ছে, মানুষের নিজেকে নিজের চেনা-জানা, অনুধাবন ও উপলব্ধি করা, ইসলামের সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা জেনে নেয়া, মানুষের সামষ্টিক দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়ে জানা ও তদনুসারে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা, বিশ্বলোকের অবস্থান ও সৃজন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতি লাভ করা এবং তাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি জানা। সর্বোপরি বিশ্বস্রষ্টার সঠিক ও নির্ভুল পরিচিতি লাভ, তাঁর সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জন এবং তাঁর বন্দেগী দাসত্ব বা উপাসনা করা, তাঁর আদেশাবলী পালন ও অনুসরণ এবং তাঁর সব নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিহার করা ও সেসব থেকে বিরত থাকা।

www.amarboi.org

'শিক্ষা' বলতে বুঝায় যা জানা নেই—যে বিষয়ে কোন জ্ঞান ও ধারণা নেই, সেই বিষয়ে জানা, জ্ঞান অর্জন ও ধারণা লাভ করা। অবশ্য এই জানা-বুঝা, জ্ঞান অর্জন ও ধারণা লাভের জন্যে স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকা একান্তই জরুরী। সে যোগ্যতা না থাকলে জানা-বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভবই থেকে যাবে।

মানুষ মাত্রই এরূপ শিক্ষার মুখাপেক্ষী। কেননা সে যখন এই দুনিয়ায় আসে তখন এই দুনিয়ার জীবন ও পরিবেশ এবং এখানে জীবন ধারনের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকেনা। তাকে সবকিছুই এখানে এসে শিখতে হয়, জানতে হয়, বুঝতে হয়—নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং সেই অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাকে ধারণা পোষণ করতে হয় এই জগত সম্পর্কে—যেখানে সে বসবাস করে, নিজ সত্তা সম্পর্কে—কেননা জীবন যাপন তো তাকেই করতে হয় এবং নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে, কেননা সে ভবিষ্যত একান্তভাবে তার নিজের—তাকে নিজেকেই সে ভবিষ্যতের দায় বহন করতে হবে। অতএব নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণার ভিত্তিতেই তাকে বর্তমানের জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের দুটি দিক। এক দিক দিয়ে সে একটি জীব বা প্রাণী মাত্র। অতএব জীব হিসেবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হয়। এ জ্ঞান ব্যতীত দুনিয়ায় শুধু বেঁচে থাকাও সম্ভবপর হয় না। তার এ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন শুরু হয় মায়ের কোল থেকেই; মা-বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি নিকটাত্মীয়দের পরিমণ্ডল থেকেই সে এ পর্যায়ের জ্ঞান সচেতন বা অচেতনভাবে অর্জন করে। আমরা বলতে পারি এটি হচ্ছে নেহাত বস্তুগত ও বৈষয়িক জ্ঞান।

কিন্তু মানুষ তো শুধু জীবমাত্র নয়। তাই শুধু জৈবিক জ্ঞান, নিছক বেঁচে থাকার জন্যে জরুরী জ্ঞান অর্জনই তার জন্যে যথেষ্ট নয়—যথেষ্ট নয় পরিমণ্ডল থেকে অর্জিত স্থূল জ্ঞান। তাছাড়া তাকে এই জৈবিক জ্ঞানও খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও উচ্চতর মানে অর্জন করতে হয়। নেহাত পরিমণ্ডল থেকে অর্জিত যে জ্ঞান, তা জীব বা প্রাণীকুলের জন্যে যথেষ্ট , মানুষের জন্যে নয়। উপরন্তু মানুষকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করতে হলে শুধু পরিমণ্ডল থেকে অর্জিত জৈবিক জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট হতে পারে না; এমন কি, তৎসম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানও যথেষ্ট হবে না। কেননা সে জ্ঞান দ্বারা মানুষ হয়ত শুধু উন্নত মানের জীব হিসেবেই বাঁচতে পারে—পারে সুখ-সম্ভোগের বিলাস-সামগ্রী

www.amarboi.org

সংগ্রহ করতে; কিন্তু তাতে তার জৈবিকতা থেকে মুক্তি ও মানবীয় পর্যায়ে উন্নতি লাভ সম্ভব হয় না। তাই মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে হলে তার মানব প্রজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জীব-উর্ধ্ব বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সত্তা হিসেবে বেঁচে থাকা ও যথাযথভাবে মানবীয় দায়িত্ব পালন করে ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক জীবন যাপন করার জন্যে যে জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য, সেই জ্ঞান নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে অর্জন ও তা হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার ভিত্তিতে নিজ সত্তা ও এই বিশ্বলোক সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অনস্বীকার্য প্রয়োজন।

প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান মানুষ সাধারণভাবে অর্জন করতে পারছে। বর্তমান সভ্যতা মানুষকে সেই জ্ঞান সরবরাহের জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে আজকের মানুষ প্রকৃতি জয়ে ও নিয়ন্ত্রণে তাকে কাজে লাগানোর দিক দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই জ্ঞান কি মানুষের সঠিক মানবীয় বিশেষত্ব, প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে যথেষ্ট? এ জ্ঞান দ্বারা কি মানুষ নিছক জীবত্বের অক্টোপাশ থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছে? ..... না কি এ জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে জীবত্বের গৌরব অর্জন করেছে?......এখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষেরা কি হিংস্র-বন্য পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করছে না?

এ প্রশ্নের প্রথমাংশের না এবং শেষাংশের জবাবে 'হ্যাঁ' না বলে উপায় নেই। কেননা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতিসমূহ এবং বিভিন্ন দেশের শীর্ষ ব্যক্তিগণ তাদের ব্যক্তিগত, দলগত ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী দ্বারা পশুর চাইতেও অধিক হিংস্রতার পরিচয় দিচ্ছে। দুনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে পাশবিকতার জয়-জয়কার। সভ্য দুনিয়ার নানা অঞ্চলে চলছে দানবীয় শক্তির তাণ্ডব; প্রশান্ত পৃথিবী থর থর করে কাঁপছে তাদের পাশবিকতার দাপটে। সর্বত্র মানবীয় মূল্যমান, ন্যায়পরতা, সুবিচার ও নৈতিকতা তথা মানুষের মৌলিক অধিকার পদদলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আজকে সভ্যতার ধ্বজাবাহীরাই হচ্ছে মানুষের বড় দুশমন। তার একমাত্র কারণ, এই তথাকথিত সভ্য মানুষেরা বস্তুগত জ্ঞানে চূড়ান্ত মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করছে বটে; কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা কাকে বলে, সে জ্ঞান তারা পায়নি। তারা মানুষকে পশুর বংশধর বলে গণ্য করেছে, নিজেদেরকেও তারা তা-ই মনে করছে। ফলে 'পশুকুলে'র প্রতি 'পশুদের' আচরণ পাশবিক হবে, তা-ই তো স্বাভাবিক। কাজেই আজকের দুনিয়ার মানুষের অবস্থা দেখে হাঁ-হুতাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা যা কিছু দেখা যাচ্ছে, তা সব মানুষের নিজেরই উপার্জন। তেঁতুলের বীজ বপন করা হলে গাছটা তো তেঁতুলেরই হবে—এর ব্যতিক্রম হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

মানুষের মানবোচিত জীবন যাপনের জন্যে বস্তুগত জ্ঞান যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে—যদি সে জ্ঞান দ্বারা পাশবিকতারই চরম উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে মানবোচিত

www.amarboi.org

জ্ঞান কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি ধরনের সে জ্ঞান? এখন এ প্রশ্নেরই আমি জবাব দিতে চাই।

আমরা স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, মানবীয় সত্তা দুটি মৌল উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। একটি তার দেহ, অপরটি তার রূহ্ বা প্রাণ। দেহ মাটির নির্যাস থেকে তৈরী আর তারই মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয়েছে 'রূহ্'। রূহ্ মহান সৃষ্টিকর্তার একান্ত নিজস্ব একটি জিনিস। আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান প্রাণতত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা চালিয়েছে; কিন্তু তার কোন স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেনি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জীবনের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে এবং এর উৎস অন্বেষণ করতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সাজিয়েছেন, অক্ষরের পিঠে অক্ষরই শুধু বসিয়েছেন; কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা প্রাণ বা জীবনের একটা যান্ত্রিক ধারণা বা বস্তুগত বিশ্লেষণ দিয়েছেন বটে; কিন্তু প্রাণ বা জীবন 'বস্তু' নয় বলে তাঁদের সব চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক যেমন মানুষকে 'পশু' বা পশুর অধস্তন মনে করে মানবীয় সমস্যাবলী চিহ্নিত করতে ও তার সমাধান দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে 'মানুষ' নামক সত্তাটি তাদের চিন্তা-গবেষণার সম্পূর্ণ বাইরে রয়ে গেছে; তার নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়নি।

তাই 'মানুষ' সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করতে চাওয়া কার্যত লাঠি দ্বারা ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নশীল এ্যারোপ্লেনকে ঘায়েল করতে চাওয়ার মত পণ্ডশ্রমই হয়েছে। কোন ফলই তাতে পাওয়া যায়নি।

অতএব, মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান পেতে হবে মানুষের স্রষ্টার নিকট থেকে, যিনি শুধু মানুষেরই নন; বরং সমগ্র সৃষ্টিলোকেরই একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক। একালের সভ্যতাগর্বী ও বিজ্ঞানদর্শী মানুষের চরম দুর্ভাগ্যই এই যে, তারা মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে শুধু নিজেদের ইন্দ্রিয়লব্ধ ও কার্যকারণ-ভিত্তিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছে। ফলে আজ জ্ঞানের জগতে চরম দীনতাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব জ্ঞানগর্বী বড় বড় মূর্খ, অজ্ঞ ও জাহিল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত জ্ঞান বলতে ওদের কিছু নেই।

মহান স্রষ্টা এই বিশ্বলোক সৃষ্টির পর মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হিসেবেই এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষকে শুধু জীব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাকে মানুষ হিসেবে—মানুষের মর্যাদা নিয়ে, মানবীয় দায়িত্ব পালনসহ জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানও দান করেছেন। সে জ্ঞান কেবল মানুষের জন্যে, অন্য কোন সৃষ্টির জন্যে নয়।

আল্লাহ্ 'রাব্বুল আলামীন'—এর অর্থ তিনি কেবল সৃষ্টিকর্তা এবং লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাপক নন; বরং তিনি সবকিছুর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও

www.amarboi.org

শিক্ষাদাতা। তাই তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানের দুটি ধারা প্রবাহিত। একটি ধারা প্রাকৃতিক জগতের মাধ্যমে প্রদত্ত বস্তুগত জ্ঞান—শুধু প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকার জ্ঞান। আর দ্বিতীয়টি তাঁরই প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে 'অহী' সূত্রে প্রদত্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের মানবীয় মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

অতএব, মানুষ যদি এই দুনিয়ায় মানুষের মত বাঁচতে চায়—চায় মানবীয় মর্যাদা নিয়ে ও মানবীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে, তাহলে তাকে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করতে হবে। এই জ্ঞানের মাধ্যমেই সে জানতে পারবে এই বিশ্বলোক কি, কি তার উৎস—এই জগতে মানুষের স্থান কোথায়, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, তার জন্যে ভালো বা মন্দ কি, তার ভবিষ্যত কিসে উজ্জ্বল ও নিশ্চিন্ত হবে, কিসে হবে মর্মান্তিক ও দুঃসহ পরিণতি!

হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মহান আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত মানুষের প্রতি তাঁর যা কিছু বক্তব্য, সবই তিনি চূড়ান্তভাবে এই মহাগ্রন্থ কুরআনে বলে দিয়েছেন। তিনি নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতেই সব কিছু বলেছেন। তাঁর জ্ঞান মানুষের মতো ইন্দ্রিয় ও কার্যকারণ নির্ভর নয়—নয় আপেক্ষিক, পরীক্ষামূলক বা আনুমানিক। তাঁর জ্ঞান যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি কালাতীত—তা সর্বাত্মক, সর্বব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করার সাধ্য কোন মানুষের নেই। তিনি অনুগ্রহ করে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। অতএব নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ভিত্তি করেই রচিত হতে হবে মানুষের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা। তারই আলোকে প্রাকৃতিক জগতকে বিশ্লেষণ করতে ও বুঝতে হবে এবং তদনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের প্রতি মানুষের আচরণ।

বিশ্বনবী (স) প্রথম অহী লাভের পর মক্কার সঙ্কীর্ণ পরিসরে ও বিপদ-সঙ্কুল পরিবেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থারই সূচনা করেছিলেন। অতঃপর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেই শিক্ষাকে তিনি আরো সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করেছেন। এভাবে জীবনভর তিনি সেই শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে তৈরী করেছেন সর্বপ্রকার মৌলিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব দানের উপযোগী লোকদেরকে। ফলে তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদুন ও সাহাবায়ে কিরাম দুনিয়ায় যে উন্নতমানের জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন সমগ্র প্রতীচ্য সে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। দুনিয়ায় পাশবিকতা ও হিংস্রতামুক্ত এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল; সর্বত্র মানবিকতার নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক পরিবেশে মানুষ স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছিল।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই সোনালী যুগ অব্যাহত থাকার পর জাহিলিয়াত

www.amarboi.org

রাজনৈতিকভাবে ইসলামের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ইসলামী খিলাফত খতম হয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র থেকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ চতুর্দিক প্লাবিত করেছিল, তারই পরিণতিতে জ্ঞানচর্চার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি মূলত ঠিক সেই সময়ই রচিত হয়।

মূলত সেই আদর্শিক শিক্ষার ধারাই মুসলিম জাতির জন্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলিম বিজয়ের পর এতদঞ্চলেও সে শিক্ষার রেশ চলছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে শিক্ষা ব্যবস্থা ধসে পড়ে এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষা ও জ্ঞানের নিঃছিদ্র অন্ধকারে মুসলমানরা নিমজ্জিত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, এক বারের বদলে দু' বারের স্বাধীনতাও আমাদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সে অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করতে সক্ষম হলনা। সে অন্ধকার থেকে আমরা আদপেই মুক্তি লাভ করব কি না, সেটাই আজ বড় প্রশ্ন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গড়ে তোলার একমাত্র হাতিয়ার। শিক্ষাহীন বা শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ কোনদিনই মনুষত্বের সুমহান মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। মানুষের সন্তানকে যদি 'মানুষ' নামে অভিহিত করতে হয় তাহলে তার জন্যে শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অপরিহার্য।

শুধু তা-ই নয়। মানুষকে আপনি যে ধরনের বা যে গুণের অধিকারী দেখতে চান এবং যে স্বভাব-চরিত্রে ভূষিত করতে চান, সেই ধরনের মানুষ গড়ে ওঠে যে ধরনের শিক্ষা পেলে এবং সেই গুণ ও সেই স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টি করে যে শিক্ষা, তা-ই তাকে দিতে হবে। এটাই যুক্তি ও বাস্তবতার দাবি।

পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে মানবাকৃতির যে শিশু, তা একটি স্বভাবজাত সত্তা—যে স্বভাবের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই স্বভাবজাত সত্তাটি ঠিক পানির মত। পানির নিজস্ব কোন রঙ নেই। পানিকে যে রঙে রঙিন করার ইচ্ছা হবে, সেই রঙই তাতে গুলে মিশিয়ে দিতে হবে। সেই রঙ যখন পূর্ণমাত্রায় গুলে মিশে যাবে, পানি সেই রঙ নিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। মানুষের অবস্থাও ঠিক এই রূপ। মানুষ যেন মৃৎ শিল্পের কাঁচা মাল। কাঁচা মাটি দিয়ে যে-কোন আকার-আকৃতির পাত্র তৈরী করা যায়। মানুষকেও পারা যায় যে-রূপ ইচ্ছা তৈরী করতে। তার জন্যে সেইরূপ শিক্ষা দরকার, যেরূপ মানুষ আপনি তৈরী করতে ইচ্ছুক।

এই প্রেক্ষিতে 'আমাদের মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ কি হবে'—প্রশ্নের একটি মাত্র জবাবই হতে পারে। তা হল, যেরূপ মানুষ আপনি তৈরী করতে চান, তার জন্যে সেইরূপ শিক্ষারই ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, আপনার ইচ্ছামাফিক লোক তৈরী হয়ে গেছে। কথাটি ঠিক যান্ত্রিক অর্থে নয়, মানবিক দৃষ্টিতেই বলা হয়েছে। নেপোলিয়ন

www.amarboi.org

বোনাপার্টি বলেছিলেন : Give me good mothers I shall give you a good Nation. কথাটির যথার্থতায় কোন সন্দেহ নেই। আমার এই কথাটি অনুরূপভাবেই সত্য।

এখন প্রশ্ন, আপনি কোন্ ধরনের মানুষ তৈরী করতে চান? এই প্রশ্নটির পূর্বে আর একটি প্রশ্ন বিবেচ্য। তা হল, আপনি নিজে কিরূপ মানুষ হতে চান? আপনি নিজে যেরূপ মানুষ হওয়া পসন্দ করেন—ভালবাসেন, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন যে, ঘরে ঘরে সেই রূপ মানুষই গড়ে উঠুক। তাহলেই আপনার চাওয়াটা বাস্তবায়িত হবে; আপনার বাসনার প্রতিফলন ঘটবে বাস্তবে।

এই প্রশ্নটি নিয়ে কথা বললে বলা যায়, আপনি নিজে নিশ্চয়ই সৎ মানুষ হতে চান। কেননা সাধারণভাবে কোন মানুষই অসৎ হতে চায় না। যে ব্যক্তি অসৎ, সেও নিজেকে সাধারণভাবে অসৎ মনে করতে প্রস্তুত নয়। নিজের দোষ-ত্রুটি আর ক'জনে দেখে? সে যা-ই হোক, আপনি সৎ হতে চাইলে নিশ্চয়ই চাইবেন যে, ঘরে ঘরে সৎ মানুষ গড়ে উঠুক। তাহলে আপনাকে সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এমন শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে, যা লাভ করে ভবিষ্যত বংশধররা সৎ হয়ে উঠবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সৎশিক্ষা কোন্‌টি? এ সম্পর্কে যে ধারণাটি শাশ্বত, সে দৃষ্টিতে বলতে হয়, আপনার আমার ও এই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা যাকে সৎ বলেছেন, তা-ই সৎ এবং যাকে অসৎ বলেছেন তা-ই অসৎ। তাহলে আল্লাহ যেসব গুণকে সদ্‌গুণ বলেছেন, সেই গুণগুলো সৃষ্টি হতে পারে যে শিক্ষার দ্বারা, লোকদের জন্যে আপনাকে সেই শিক্ষারই ব্যবস্থা করতে হবে। আসলে সদাসৎ বিষয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা বিভিন্ন—অনেক সময় পরস্পর-বিরোধীও। আপনি যদি আপনার ধারণানুযায়ী সৎ শিক্ষা নিয়ে দাঁড়ান, তাহলে আর একজন দাঁড়াবে তার ধারণানুযায়ী সৎশিক্ষা নিয়ে। তার ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই নিজ নিজ ধারণা পরিহার করে সকলে মিলে আল্লাহ্‌র নিকট যা সৎ বলে বিবেচিত, সেই সৎকে সৎ বলে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয় কি? তাহলে তা নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকবে না। বলতে পারেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে নিয়ে এলে তো কুরুক্ষেত্র বা ক্রুশ-যুদ্ধের উদ্ভব হবে। হ্যাঁ, তা হতে পারে, অস্বীকার করছি না; কিন্তু আমরা যত লোক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী রয়েছি, আল্লাহ্ সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করি—সমস্ত মানুষ না হলেও—অন্তত তারা তো একটি বিন্দুতে ঐকমত্য পোষণ বা একতাবদ্ধ হতে পারি। আপাতত সেই ঐকমত্যকে ভিত্তি করেই এগুতে হবে। এভাবে একটি দেশে যারা আল্লাহ সম্পর্কে একমত, তারা একটি সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করবে। আর এভাবে সারা বিশ্বে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে একই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে, তারা সকলে মিলে এক অভিন্ন শিক্ষাদর্শন গ্রহণ করলেই, সারাবিশ্বে তদনুযায়ী সৎ মানুষ গড়ে উঠবে।

www.amarboi.org

বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রেক্ষিতেই বলতে চাই, এই মুহূর্তে দুনিয়ার মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যাতে করে আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা সত্যিকার 'মুসলিম' হয়ে গড়ে উঠতে পারে। প্রায় সব ক'টি মুসলিম দেশই এককালে পাশ্চাত্য খৃস্টান বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অধীন ছিল। সে শক্তিগুলি এসব দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন, তাতে দুটি লক্ষ্য অর্জনের বিষয় তারা অবশ্যই স্মরণ রেখেছে। প্রথমত তাদের সামাজিক ও প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে নিজস্ব কাজের উপযোগী 'শিক্ষিত' ব্যক্তি তৈরীর জন্যে তারা চেষ্টা করছে—যেমন উপমহাদেশে বৃটিশেরা তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করে দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরীর উদ্দেশ্যে নিজেদের মনোপুত শিক্ষাব্যবস্থা রচনা ও প্রবর্তন করেছে এবং দ্বিতীয়ত এই মনোভাব তারা বরাবর লালন করেছে যে, কোন দিন তারা যদি এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্যও হয়, তাহলেও যেন তাদের ভক্ত-অনুরক্ত, তাদের লালিত চিন্তা-বিশ্বাস ও চরিত্রের প্রতিমূর্তি এবং তাদের অন্ধ সমর্থক ও মানসিক গোলামরা এদেশে প্রধান্য লাভ করতে পারে। এভাবে তাদের অনুপস্থিতিতেই যেন এ দেশে সেই সব কাজ সম্পন্ন হয়, সেই সব নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়িত হয় এবং সেই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান চলতে থাকে, যা তারা নিজেরা করেছে বা থাকলে করত।

এককথায় বলা যায়, এসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের অধীনস্থ দেশগুলোতে তাদের উপযুক্ত গোলাম তৈরীর লক্ষ্যেই গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে তৈরী করেছে, প্রশাসনিক শক্তিবলে তা চালু করেছে এবং এই শিক্ষালাভ করা ছাড়া উন্নতির কোন উপায় নেই বলে অসহায় জনগণকে বুঝিয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত তারা এসব দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় তাদের তৈরী মানসপুত্রদের হাতেই দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে—তাদের শূন্য আসনগুলোতে তাদের তৈরী গোলাম মনোভাব ও গোলাম চরিত্রের লোকদেরকেই বসিয়ে গেছে। ফলে ঐসব দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারেনি। তারা যে গোলাম ছিল স্বাধীনতার পূর্বে, সেই গোলামই থেকে গেল স্বাধীনতা লাভের পরেও। তাই স্বাধীনতা অর্জনকারী মুসলিম দেশগুলোর জনগণ গোলামীর নাগপাশে কঠিনভাবে বন্দী হয়ে আছে।

কাজেই মানুষ গড়ার আসল হাতিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাস, আদর্শবাদ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে। এর ব্যতিক্রম হলে অবস্থার কোন পরিবর্তনই হবেনা।

www.amarboi.org

জাতীয় জীবনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষার তাৎপর্য

শিক্ষা অর্থ ঃ জানা, বোঝা, শেখা; যা জানা নেই—অজানা অথচ জানা দরকার, তা জানা, শেখা ও বোঝা-ই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার প্রশ্ন কেবল মানুষের বেলাই প্রযোজ্য : মানুষ ছাড়া অন্য কারোর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই, প্রয়োজনও নেই। জীব-জন্তু অন্ধকারেও দেখতে পারে। কিন্তু মানুষ তার দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও বাইরের আলোর প্রতিফলন না হলে কিছুই দেখতে পায় না। তাই মানুষকে বাইরে থেকে জ্ঞানের আলো দান একান্তই প্রয়োজন।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তুর জীবন যেহেতু নিতান্ত জৈবিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই তাদের যা কিছু শিক্ষার প্রয়োজন তা স্বাভাবিকতা বা প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যেই অর্জিত হয়ে থাকে। যেমন মুরগীর বাচ্চার কুটকুট করে খাদ্য আহরণ কিংবা হাঁসের বাচ্চার পানিতে সাঁতার কাটা শেখার ব্যাপার মায়ের পথ প্রদর্শনেই সমাপ্ত হয়। অতঃপর এদের আর কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

জন্তুর ক্ষেত্রে ঘাস খাওয়া বা অন্য জীব ধরে খাওয়ার শিক্ষাটাও স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের শিক্ষা নিছক স্বাভাবিকতার মধ্যেই সীমিত থাকতে পারেনা। স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে বাইরের অনেক কিছুই শেখা-জানা-বোঝা তার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তার জীবন জৈবিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ তো শুধু জীবমাত্র নয়। জীবের উর্ধ্বে তার জীবন সম্প্রসারিত। জীবের জগত তার চতুঃপার্শ্বের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু মানুষের জগত পৃথিবী ও গোটা বিশ্বলোক। তা জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। তাই মানুষ শুধু নিজেকে জেনেই ক্ষান্ত হতে পারে না। তাকে জানতে হয় নিজেকে, এই পৃথিবীসহ গোটা বিশ্বলোক এবং এই সবের স্রষ্টাকেও। মানুষের জ্ঞান শুধু বাহ্যিক প্রপঞ্চ (Phenomenon) পর্যন্ত সীমিত থাকলেই চলবেনা, তাকে জানতে হবে অন্তর্নিহিত সত্তাকে, বাহ্য লোকের অন্তরালে অবস্থিত মহাসত্যকে তথা Absolute reality এবং Absolute truth-কে।

মানুষের আছে মন, যা জীবদের নেই। সে 'মনে'র আছে নানা জিজ্ঞাসা, কৌতুহল, আশা-আকাংক্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও বৈধ-অবৈধের বোধ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষ পশু; কিন্তু শুধুমাত্র জন্তুর ক্রিয়া সম্পন্ন করাই তো আর মানব ধর্ম হতে পারে না। সে দিক দিয়েও নৈতিকতার প্রশ্ন অনপেক্ষণীয়।

www.amarboi.org

মানব মনের মৌলিক জিজ্ঞাসা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. প্রথম জিজ্ঞাসা তার নিজের সম্পর্কে, তার গোটা পারিপার্শিকতা তথা পিতামাতা, ভাইবোন সম্পর্কে—যাদের সে নিজের চারপাশে দেখতে পায় জন্মের পর থেকেই। এরা কারা, এদের সাথে তার কি সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক কিভাবে রক্ষা করতে হবে।

২. জিজ্ঞাসা আছে এই পৃথিবী, সূর্য-চন্দ্র, পানি, বাতাস, বৃক্ষ-গুল্ম ইত্যাদি সম্পর্কে; এগুলোর প্রকৃত অবস্থান কোথায় এবং তার সাথে এগুলোর সম্পর্ক কি? সে সম্পর্ক রক্ষার নিয়ম পদ্ধতি-ইবা কি?

৩. জিজ্ঞাসা আছে তার নিজের জীবন প্রণালী, দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভবিষ্যত সম্পর্কে—এই সব জিজ্ঞাসার জবাব তার জানা নেই। অথচ এগুলো না জানতে পারলে তার মনের কৌতুহল যেমন মিটেনা, তেমনি তার জীবনও সঠিক রূপে চলতে পারে না।

কিন্তু অন্যান্য জীব বা উদ্ভিদের স্ত র এসব জিজ্ঞাসা কিংবা কৌতুহলের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আর এটাই হচ্ছে মানুষ ও জীব-জন্তু তথা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি।

অতএব মানুষের জন্যে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন, যা তাকে এই সব বিষয়ে অবহিত করবে এবং এ ক্ষেত্রে জেগে-ওঠা সব সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেবে। এতে যেমন জানার প্রশ্ন আছে, তেমনি আছে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার এবং শেখারও প্রশ্ন।

শিক্ষার মাধ্যমে কেবল জ্ঞান আহরণই কোন কল্যাণ সাধন করে না; সে জ্ঞানের বাস্তব ও সুষ্ঠু প্রয়োগও দরকার। তাই জানা ও বুঝা দরকার সে জ্ঞান প্রয়োগ করার সঠিক পদ্ধতি কি।

তাই A.N. Whitehead তাঁর The Aims of Education and other Essay's গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge. অর্থাৎ শিক্ষা হল জ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করা।

ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ

اَلْعِلْمُ اِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقِيْقَتِهٖ

জ্ঞান হচ্ছে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা।

এই ادراك বা Allainment-reaching-understanding (আহরণ বা অনুধাবন) দুই পর্যায়ের। একটি হচ্ছে ঃ اِدْرَاكَ ذَاتِ الشَّيْءِ কোন বিষয়ের বা জিনিসের অন্তর্নিহিত সত্তাটি জানা বুঝা বা অনুভব করা।

www.amarboi.org

আর দ্বিতীয় হচ্ছেঃ

اَلْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِوُجُوْدِ شَيْءٍ هُوَ مُوْجِدٌ لَهُ اَوْنَفِى شَيْءٍ هُوَ مُنْفِى عَنْهُ

একটি জিনিস সম্পর্কে অপর জিনিসের সাহায্যে সেই জিনিসের থাকা বা না থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ইমাম রাগেবের দৃষ্টিতে علم -এর আর একটি বিভক্তি হচ্ছেঃ তা نَظَرِىْ বা Theomical এবং عَمَلِى বা Practical.

نَظَرِىْ مَااِذَا عِلْم فَقَدْ كَمَلَ —নীতিগত জ্ঞান যখন অর্জিত হল তখন তা পূর্ণত্ব পেল।

আর عَمَلِىْ مَالاَيَتِمُّ الْاَبَانَ يَعْمَلَ—বাস্তব জ্ঞান সম্পূর্ণতা পায়না যতক্ষণ তা কাজে পরিণত করা না হবে।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত: عِلْم بِمَوْ جُوْدَاتِ الْعَالَم—এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব বা অবস্থিতি সম্পর্কিত জ্ঞান বা জানা । তা জানা হয়ে গেলে এ সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে তার করার কিছু থাকেনা। কিন্তু দ্বিতীয়টি হল ঃ

عِلْم بِالْعِبَادَات—ইবাদত সংক্রান্ত ইলম। তা শুধু জানলেই হবেনা, তা বাস্তবে প্রয়োগও করতে হবে। ইমাম রাগেবের দৃষ্টিতে এর আরও একটি বিভক্তি রয়েছে ঃ عَقْلِىْ وَسَمْعِى—বিবেক-বুদ্ধিগত ও ঐতিহ্যগত। বিবেক-বুদ্ধিগত বলতে বুঝায় সেই জ্ঞান যা মানুষ চিন্তা-গবেষণা ও অনুমিতির (Inference)-এর মাধ্যমে অর্জন করে। আর ঐতিহ্যগত জ্ঞান বলতে বুঝায়, মানুষ যা জানতে পারে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে। আল্লাহ্‌র কুরআন, রাসূলের সুন্নাত এবং ইমাম, মুজতাহিদ ও চিন্তাবিদদের নিকট থেকে লাভ করা জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতেও শিক্ষা দু'ধরনের অর্থাৎ দুটি সূত্র থেকে লব্ধ। একটি Fomal বা আনুষ্ঠানিক আর অপরটি Informal বা অনানুষ্ঠানিক

বালক-বালিকারা নিজেদের পরিবেশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা শেখে তা Informal—এ জ্ঞান স্বতঃই অর্জিত হতে থাকে; এর জন্যে কোন চেষ্টা বা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়না। আর যা বই-পুস্তক পড়ে ও শিক্ষালয় থেকে তারা শিক্ষকদের মাধ্যমে শেখে তা Formal বা আনুষ্ঠানিক ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য থাকা একান্তই আবশ্যক। অর্থাৎ শিক্ষা কেন—শিক্ষার

www.amarboi.org

মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করব? কিংবা শিক্ষা না হলে ক্ষতি কি? সে ক্ষতির কারণই বা কি? এ বিষয়গুলো আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকা দরকার।

আগেই বলেছি, মানুষের জন্যে শিক্ষার একান্তই প্রয়োজন। এর অর্থ, শিক্ষা না হলে মানুষ 'মানুষ' পদবাচ্য হতে পারে না। মানুষ যেহেতু নিতান্ত জীব নয়, জীবেরও বহু ঊর্ধ্বে তার স্থান, তাই প্রতিটি মানুষের স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে আপন দায়িত্ব ও-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে এবং নিজের উজ্জ্বল সুখময় ভবিষ্যত নিশ্চিত করে জীবন যাপন করা একান্ত অপরিহার্য। আর এজন্যে তার এমন শিক্ষার দরকার যে শিক্ষা তাকে উপরোক্ত তিনটি কাজ সম্পাদনে সাহায্য করবে, তাকে যোগ্য বানাবে। ফলে তার পক্ষে একাকী জীবন যাপন করা নয়, বরং একটি জনসমষ্টি এবং আধুনিক ভাষায় একটা জাতি হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব হবে।

বস্তুত মানুষের জন্যে শিক্ষা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে দুনিয়ার সর্বকালের জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাবিদদের পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। এ বিষয়ে কখনো কোন মত-পার্থক্য হয়নি; কখনই কোন লোক বলেনি যে, মানুষের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মানুষের জন্যে কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, কোন্ ধরনের শিক্ষা দ্বারা মানুষের উপরিউক্ত তিনটি দিক সার্থক হতে পারে?....... অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ও মানুষের উজ্জ্বল সুখময় ভবিষ্যত নিশ্চিতকরণ সম্ভব হতে পারে, এ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

এ মতভেদের কারণ হচ্ছে, প্রধানত মানব সত্তা ও মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণার বিভিন্নতা।

কারো কারোর মতে মানুষ কোন স্বতন্ত্র বা উন্নত ধরনের জীব নয়। মানুষ সাধারণ জীব পর্যায়েরই একটি সত্তা (Beings)—জীবেরই বংশধর। তাই তাদের মতে মানুষের মর্যাদা, কর্তব্য বা ভবিষ্যত ঠিক তা-ই যা সাধারণ জীবের।

কারো কারোর মতে মানুষ জীব পর্যায়েরই সত্তা, তবে পার্থক্য এই যে, মানুষ উন্নত ও ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত জীব (Evolued Animal); অতএব মানুষের মর্যাদা, কর্তব্য ও ভবিষ্যতও সেই অনুপাতে উন্নত ও বিকাশপ্রাপ্ত মান অনুযায়ী হবে।

এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, মানুষ একটা Rational Animal বা বুদ্ধিমান জীব। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক আছে, সাধারণ জীব-জন্তুর তা নেই; এই যা পার্থক্য। অতএব, সাধারণ জীব-জন্তুর তুলনায় মানুষের মর্যাদা, কর্তব্য ও ভবিষ্যত শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বা যুক্তিভিত্তিক হবে মাত্র। তাদের জীবন একান্তভাবে বুদ্ধি-নির্ভর। আর বুদ্ধি-নির্ভর বলেই তারা আল্লাহ্‌কেও অস্বীকার করেছে, তাকে অমান্য করে চলেছে। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন বিধান আসার প্রয়োজন বোধও তারা হারিয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগত—তা

www.amarboi.org

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ হোক বা ধর্মহীন স্বৈরতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ—সর্বত্র মানুষ সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণা প্রকটভাবে বিরাজমান। ফলে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি জীবতাত্ত্বিক পর্যায়ের। সে শিক্ষার ফলে উন্নত মানের যোগ্যতাসম্পন্ন জীবই তৈরী হচ্ছে এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিও নিতান্তই পাশব প্রকৃতির। অন্যকথায়, বুদ্ধিমান ও উন্নত মানের পশুরাই এসব সমাজের নাগরিক, রাষ্ট্রনায়ক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সেনাধ্যক্ষ ও সাধারণ যোদ্ধা।

এ সমাজের সাধারণ ব্যক্তিরা এই চেতনারই ধারক। ফলে তাদের সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত, সে জাতিও পাশবিকতার মধ্যেই নিমজ্জিত। আর একারণেই তাদের তৈরী দর্শন ও বিজ্ঞান পাশবিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রে পাশবিকতারই প্রকাশ। পশু জগতে যা স্বভাবতঃই আচরিত, তাদের জগতে তা-ই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনুসৃত। মৌলিকতার দিক দিয়ে এ দু'য়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। ফলে তাদের শিক্ষায় শকুনীর মতো উড্ডয়নশীল, কুমীরের মতো শিকারী, শৃগালের মতো ধূর্ত, ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র প্রাণী গড়ে উঠছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী ও মানবিক গুণ-সম্পন্ন মানুষ গড়ে ওঠেনি।

ইসলামের দৃষ্টি বিশ্বলোক

ইসলাম বিশ্বস্রষ্টার নিকট থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্যে অবতীর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেদিন থেকে দুনিয়ায় মানুষের বসবাস শুরু ইসলামেরও সূচনা সেদিন থেকেই। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিশ্বলোক স্বয়ম্ভূ বা স্বতঃস্ফূর্ত ও বিকাশপ্রাপ্ত নয়। এর নির্দিষ্ট সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং তা বহু বা একাধিক নয়; তিনি এক ও একক—লা-শরীক।

মানুষ সেই এক ও একক সৃষ্টিকর্তারই একটি বিশেষ সৃষ্টি—উদ্দেশ্যপূর্ণ মাখলুক।

বিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বিশেষভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি নিজেই বলিষ্ঠ ভাষায় এর ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার দাসত্ব করবে। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

কোন জিনিসের স্রষ্টা বা নির্মাতা, যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে জিনিসটি সৃষ্টি বা নির্মাণ করে তার গোটা সত্তায় সেই উদ্দেশ্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে, এটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি যুক্তিসঙ্গতও বটে। অতএব, আল্লাহ্ যখন বলেছেন মানুষ সৃষ্টির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেবল তাঁরই দাসত্ব করা, তখন সেই দাসত্বের

www.amarboi.org

বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ রূপ মানব জীবনের সর্বদিকে ও বিভাগে প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটাও যেমন স্বাভাবিক, তেমনি যুক্তিসঙ্গতও।

এই প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সমগ্র জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা' যেন তারা শিক্ষা লাভ করে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে, আল্লাহ্র দাস হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয় এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে আলোকমণ্ডিত ও সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। সে শিক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে এমনসব জ্ঞান যা অর্জন করার মাধ্যমে মানুষের সমগ্র জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করার যোগ্যতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এক-একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকারকারী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত জাতি হিসেবেও এ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

অতএব, যে শিক্ষা মানুষকে মনে-প্রাণে ও বাস্তব জীবনে আল্লাহ্র দাস বানায়না, আল্লাহর দাস হওয়ার মর্যাদা শেখায়না, আল্লাহ্র দাস হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে না এবং আল্লাহ্র অনুগত দাস হিসেবে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন উজ্জ্বল ও সুখময় হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে না তা যেমন মানুষ-উপযোগী শিক্ষা নয়, তেমনি নয় ইসলামী শিক্ষাও। বস্তুত ইসলামই মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ বানায়, তাকে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে নিষেধ করে এবং তার মনে পশুত্বের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করে।

মুসলিম জাতি গঠনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা

মানুষের ব্যক্তি জীবনে ইসলামী শিক্ষার যে ভূমিকা, জাতীয় জীবনেও ইসলামী শিক্ষার ঠিক সেই ভূমিকা। ইসলামী শিক্ষা প্রথমে ব্যক্তিকে আল্লাহ্র প্রকৃত দাস তথা অনুগত বান্দাহ বানায়। তারপর সেই অনুগত বান্দাহদের সামষ্টিক জীবনকে প্রকৃত বান্দাহ হিসেবে যাপন করতে অভ্যস্থ করে তোলে। ইসলামী শিক্ষা একটি জাতিকে সর্বতোভাবে—জাতীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এবং সকল শাখা ও প্রশাখায় সুষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য বানায়। তাকে সকল প্রকার পাশবিক চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। এভাবে ইসলামী শিক্ষা মানব মনে বিশ্বলোক নিহিত সকল শক্তি ও উপকরণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মায় এবং তা সন্ধান ও আহরণ করে সর্ব মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষাই মানব মনের যাবতীয় জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব দিয়ে তার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় (عَيْنُ الْيَقِيْنِ) সৃষ্টি করে যা অন্য কোন শিক্ষা দ্বারাই সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে কেবল আইনই দেয় না, দেয় একটা শাশ্বত মূল্যমান (Permanent value)—যা তার জীবনকে সকল পর্যায়ে ও অবস্থায় এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার সামর্থ্য দান করে।

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ –

এবং তাদের (রাসূলগণ) সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যেন জনগণ ন্যায়পরতা ও সুবিচার সহকারে বসবাস করতে পারে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দাসে পরিণত করে এবং অন্য সব শক্তি ও ব্যক্তির দাসত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। এ শিক্ষা মানুষকে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত বানায়, তাকে অন্য সব কিছুর প্রতি বিদ্রোহী করে তোলে; ফলে সে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতে, অন্য কারোর আনুগত্য করতে এবং অন্য কারোর সম্মুখে মাথা নত করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। শুধু অস্বীকার করেই সে ক্ষান্ত থাকতে পারে না, বরং সে জনশক্তি সংগঠিত করে, প্রচলিত সব কিছুই উল্টিয়ে দিয়ে ও উৎপাটিত করে এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই বিপ্লবী পদক্ষেপের লক্ষ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

حَتّٰى لَايَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ –

যেন বিপর্যস্ত অবস্থার চূড়ান্ত অবসান ঘটে এবং সার্বভৌমত্ব ও জীবন বিধান কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ্‌র এই দাসত্ব স্বীকারকারী ব্যক্তিরা স্বভাবতই একটি সমষ্টি বা জাতিরূপে সংগঠিত হবে। কেননা আল্লাহতে বিশ্বাসী ও তাঁর অনুগত নয়, এমন লোকদের সমন্বয়ে যে জাতি বা জাতীয়তা তাকে মেনে নিতে বা তাতে শামিল হতে তারা কখনই প্রস্তুত হতে পারে না।

সামষ্টিক জীবনের একটি বড় প্রয়োজন হচ্ছে রাষ্ট্র। ইসলামী শিক্ষা আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকারকারী জাতিকে এমন রাষ্ট্র কায়েমে উদ্বুদ্ধ করে, যার সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট এবং যেখানে আইন মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান এবং যাবতীয় বাধ্যবাধকতা ও সীমা-নিয়ন্ত্রণ রাসূলে করীম (স)-এর প্রবর্তিত শরী'আতের ভিত্তিতে কার্যকর। যে রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ওপর স্থাপিত নয়—নয় রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া শরী'আত দ্বারা চালিত, তা মেনে নিতে বা তার খেদমত করতে ইসলামী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও জাতি কখনই প্রস্তুত হতে পারে না।

ইসলামী শিক্ষায় উদ্ভাসিত ব্যক্তি ও জাতি হবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বাস্তব প্রতীক—ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী। যেখানে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত নয়, জনগণ নয় ইসলামী আদর্শের অনুসারী, এই চেতনার অগ্রণী সৈনিকরা সেখানকার ব্যক্তি

www.amarboi.org

ও জাতিকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে—তাকে মুক্ত করবে সব অজ্ঞতা, মূর্খতা ও নির্যাতন থেকে।

যে-রাজনীতি ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক নয়, যার লক্ষ্য নয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী আইন প্রবর্তন, ইসলামী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে রাজনীতি করতে কখনই রাজী হতে পারে না; সে এমন দলের সদস্য হতে বা কর্মী হতেও প্রস্তুত হতে পারে না, যে দল ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি করে না, করে সিকিউলার বা সমাজতন্ত্রী রাজনীতি।

ব্যক্তি পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায় সে এমন কোন অর্থ ব্যবস্থা মেনে নিতে ও অনুসরণ করতেও প্রস্তুত হতে পারে না, যার ভিত্তি একান্তভাবে আল্লাহ্‌র মালিকানা ও মানুষের আমানতদারীর ধারণার ওপর ভিত্তিশীল নয়, যা নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানার পুঁজিবাদ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-ভিত্তিক, যা শোষণ ও বঞ্চনা চালায় ব্যক্তি পর্যায়েও, সামষ্টিক ও জাতীয় পর্যায়েও; বরং সে ব্যক্তি ও জাতি এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কর্তব্য বলে মনে করে, যা মহান আল্লাহ্‌র নিরংকুশ মালিকানা ও মানুষের আমানতদারীর (খিলাফতের) আকীদা-ভিত্তিক ও সর্বপ্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বস্তুত এইরূপ এক শিক্ষা ব্যবস্থাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থাই মানুষের জন্যে মুক্তির সনদ।

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে এই জাতির কথাই বলা হয়েছে আর এ জাতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য হবে আল্লাহ্‌র ঘোষণা ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জনসমষ্টি। সমগ্র মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই তোমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরাই তো সকল ন্যায়ের আদেশ প্রতিষ্ঠা কর, সকল অন্যায়ের করো নিষেধ ও প্রতিরোধ আর সর্বাবস্থায়ই তোমরা ঈমানদার থাকো এক আল্লাহ্‌র প্রতি। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এমনিভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যম নীতি অনুসরণকারী উত্তম জনসমষ্টি বানিয়েছি যেন তোমরা সমস্ত মানুষের সাক্ষী ও পথপ্রদর্শক হতে পার আর রাসূল হন তোমাদের পথ-প্রদর্শক ও সাক্ষী।

www.amarboi.org

বস্তুত মুসলিম জাতিকে এই সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন ও এই সুমহান দায়িত্ব পালনে নিরত রাখতে হলে কিংবা জনগোষ্ঠিকে অনুরূপ আদর্শের অনুসারী বানাতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে পূর্ণরূপে কার্যকর করা একান্তই কর্তব্য।

এক কথায়, ইসলামী শিক্ষা ছাড়া ইসলামী জাতি অর্থাৎ মুসলিম জাতি গড়ে তোলা এবং মুসলিম জাতিরূপে তাকে রক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চালু রয়েছে—বিশেষ করে 'আধুনিক শিক্ষা' নামে যা পরিচিত তা-ই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী এবং আমাদের এককালের শাসক ইংরেজদের দ্বারা প্রণীত ও প্রবর্তিত। এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড মেক্‌লে সুপারিশ করেছিলেন এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্যে যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা হবে Indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in intellect. অর্থাৎ রক্ত ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিবোধ মনোভৃতি ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ।এ সুপারিশ যে গৃহীত হয়েছিল এবং এরই ভিত্তিতে উপমহাদেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই যে চালু করা হয়েছিল, তাতো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু তা-ই নয়, সে আমলে তারা সকল স্তরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের চাবিটিও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার-দেশে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তার বাস্তব অর্থ এই ছিল যে, বৃটিশ শাসনে যদি কেউ সামাজিক দিক দিয়ে মর্যাদা, রাজনৈতিক দিক দিয়ে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চাকুরী বা ব্যবসা করে সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সনদ লাভ করতে হবে। এই সনদই হবে তার উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে সর্ববিধ সুযোগ বা স্বীকৃতি লাভের একমাত্র হাতিয়ার।

বাস্তবে হয়েছেও তা-ই। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই বৈষয়িক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে। ফলে গোটা উপমহাদেশীয় জনতা স্বাভাবিকভাবেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এতদাঞ্চলের লোকেরা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নামে চিহ্নিত ও অভিহিত করে আসছে। দুই দুই বারের 'স্বাধীনতাও' ইংরেজ শাসকদের প্রবর্তিত গোলাম তৈরীর এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমাদেরকে 'স্বাধীন' ও মুক্ত করতে পারেনি।

ইংরেজদের প্রবর্তিত এই 'আধুনিক' শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব ফল অবিলম্বেই দেখা দিয়েছিল। তার গুরুতর ফল ছিল এই যে, বিশেষ করে মুসলমানদের সার্বিক জীবনে চরম বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা দিল।

www.amarboi.org

এখানে স্মর্তব্য, ইংরেজরা যে সময়ে উপমহাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল ইউরোপ তখন সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পর্যায় অতিক্রম করে ধর্মহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। গীর্জার প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেছে তাদের রাষ্ট্র রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৈদেশিক নীতি—এক কথায় তাদের গোটা ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবন। শুধু তা-ই নয়, গীর্জার এই প্রভাব-মুক্তির সাথে সাথে আল্লাহদ্রোহী চিন্তা-বিশ্বাস ও ভাবধারা সমন্বিত নানা মতবাদ তাদের গোটা জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছিল। ডারউইনী বিবর্তনবাদ তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছিল আল্লাহ-অবিশ্বাসী, মার্কসীয় দর্শন তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছিল নবুয়্যাত, আখিরাত ও কিতাবের প্রতি চরম বিদ্রোহী। মেকিয়াভেলীর রাষ্ট্রদর্শন তাদেরকে বানিয়েছিল ধোকাঁবাজ-প্রতারক ও সুবিধাবাদী এবং ফ্রয়েডীয় নীতিদর্শন তাদের বানিয়ে দিয়েছিল যৌনতাবাদী ও ব্যভিচারী। মোটকথা, ধর্মবিবর্জিত মূল্যমান (Values) তখন তাদের সকল কাজের মানদণ্ড হয়ে গেছে এবং তাদের প্রবর্তিত এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায়ও এই সকল ভাবধারা উদারভাবে প্রবেশ করেছে। ফলে কথিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের ধর্মবিশ্বাসী মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধদের কোন্ রসাতলে ঠেলে দিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

তারা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উপরিউক্ত চিন্তা-বিশ্বাস ও ভাবধারা সমন্বিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও খগোলশাস্ত্রকে শামিল করেছিল। ফলে এই সব চিন্তা-দর্শন বিজ্ঞানের নামাবলী পরে এদেশের জ্ঞান-পিপাসু মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ ছেলে-মেয়েদের মনে-মগজে শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল।

এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া এদেশের শিক্ষিত লোকদের মননে, জীবনে ও চরিত্রে অবিলম্বে দেখা দিল। মুসলিম পরিবারের ঈমানদার ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার নামে ঐসব শাস্ত্র গলধঃকরণ করে সম্পূর্ণরূপে বিগড়ে গেল। আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও পরকালের প্রতি তারা ঈমান হারিয়ে ফেলল। ইসলামের হালাল-হারাম তাদের নিকট প্রথমে হল অস্বীকৃত এবং পরে উপহাসের বস্তু। অতঃপর এদেশে যে ধরনের বিদ্বজ্জনদের জন্ম হতে লাগল, তাদের সাক্ষাত নমুনা স্বরূপ একটি ব্যক্তিত্বের কলম-চিত্র এখানে উদ্ধৃত করছি। কাজী আবদুল অদুদ প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন ঃ

> "কাজী আবদুল অদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালী, ধর্মে মুসলমান, জীবন দর্শনে মানবতাবাদী, মতবাদে রামমোহনবাদী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যান-ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল।"(বিচিত্রা ঃ ২১ জানুয়ারী ৭৭)
> বলুনতো এই ব্যক্তিটি আসলে কি?

www.amarboi.org

কিছুই নয়; কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয়ই তাঁর নেই।[১] এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণতি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা লাভ করে এদেশের মুসলিম সন্তানরা আত্ম-পরিচিতিই হারিয়ে ফেলছে। এ শিক্ষার পরিকল্পনা রচনাকারীর মূল লক্ষ্যই ছিল এদেশে এইরূপ লোক তৈরী করা।

এ শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা শিক্ষার নামে স্বীয় ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য আত্মপরিচিতি ও বিশেষত্ব সবই হারিয়ে ফেলছে। এরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত নয়; বরং মূর্খ। এদেরকে শুধু মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

এরা হারিয়েছে নিজেদের ঈমান, মূল্যমান ও চরিত্র। তদুপরি ইংরেজ প্রবর্তিত সহশিক্ষা সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। ছাত্র-ছাত্রী তথা যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক লজ্জা-শরমও হারিয়ে ফেলেছে। ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বোধ হারিয়ে এরা আসলে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। তাদের ইংরেজ প্রভুরা নিজেদের তৈরী পুতুলদেরই লাগিয়েছে এ দেশে তাদের নীতি চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার কার্যে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরাই চালু করেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং অর্থনীতিতে চালু করেছে জুলুম-শোষণ, সুদ-ঘুষ ও লুঠতরাজ। ইংরেজের চলে যাওয়ার পর এরাই এই সব অপকর্ম চালিয়েছে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে। এরা সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে এদেশের মানুষের ওপর চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। এরা প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অহমিকায় সাধারণ মানুষকে মনে করছে ছাগল বা ভেড়ার পাল। এরাই সর্বত্র চরিত্রহীনতার সয়লাব বইয়ে দিয়েছে; মদ্যপানকে ব্যাপক করেছে, ব্যাভিচারে দেশটাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে। এদেরই প্রভাবে জাতির নব্য যুবকরাও একই পথে এগিয়ে চলেছে। ফলে মানুষ বানাবার বড় বড় কারখানা তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির ভবিষ্যত বংশধরকে ভেড়া ও গাধা বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। বড় বড় শিক্ষাঙ্গনে আজ যা কিছু ঘটছে তা সেই শিক্ষা ও পরিবেশেরই অনিবার্য ফল। এ শিক্ষা থেকে প্রকৃত মানুষ তৈরী হতে পারেনা। মানুষকে গাধা-ভেড়া বা শিয়াল-কুমীর বানানো যায় আর তা-ই চলছে বছরের পর বছর ধরে। বর্তমানে জনগণ যে চরম দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত, তার মূলে রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা; অথচ একেই আমরা জাতীয় শিক্ষা বলি আর এরই জন্যে জাতীয় বাজেটের এক বিরাট অংশ ব্যয় করি। আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা এর সাথে যুক্ত করতে চান প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা কুরআন শিক্ষা। অথচ কাকের পুচ্ছের সাথে ময়ুরের দুটি পালক জুড়ে দিলেই কাক কখনো ময়ুর হতে পারেনা।

জাতীয় শিক্ষা নামে এদেশে বৃটিশ আমল থেকে চলে এসেছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক পরিবর্তন সাধনের জন্য ১৯৪৭ পরবর্তীকালে দেশের

---

১. অথচ এই ধরণের পরিচয়হীন লোকেরাই একালে বুদ্ধিজীবী নামে খ্যাত। এরাই জাতির কাণ্ডারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে সদা প্রয়াসী।—সম্পাদক

www.amarboi.org

আদর্শ-সচেতন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বার-বার দাবি উঠেছে। কোন কোন সময় সে দাবি এতটা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছে যে শাসনদণ্ড ধারণকারী বৃটিশের অন্ধ গোলামরা পর্যন্ত তার কাছে নতি স্বীকার করে শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক পরিবর্তন আনার প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ ওয়াদা করতে বাধ্য হয়েছে। সে ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে; সেসব কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে একের পর এক রিপোর্টও তৈরী করেছে। কিন্তু সে সব রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ও আদর্শিক পরিরর্তনের কোন প্রস্তাব হয় আদপেই আসেনি অথবা কখনো কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকলেও কার্যত তার দ্বারা সেই কাকের পুচ্ছে ময়ূরের দু-একটি পালক জুড়ে দিয়ে 'সম্পূর্ণ ময়ূর' নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এভাবে কাককে ময়ূরে পরিবর্তিত করা যে আদৌ সম্ভব নয়; বরং তা করতে চাওয়া যে নিতান্তই ধোঁকাবাজি, তা অনুধাবন করার মতো সাধারণ বুদ্ধিটুকুও দেখা যায়নি সে কমিশন সদস্যদের মধ্যে। ফলে এ পর্যায়ের সমস্ত অর্থ ও সময় ব্যয়ই সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়ে গেছে। জাতীয় শিক্ষায় সত্যিকার অর্থে কোন আদর্শিক পরিবর্তনই আসেনি—আসা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু কেন তা সম্ভব হয়নি, প্রশ্ন করা হলে তার একটিমাত্র জবাবই হতে পারে। আর তাহল, গঠিত শিক্ষা কমিশন বা কমিশনের সদস্যগণ প্রচলিত শিক্ষায়ই শিক্ষিত বলে তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন আদর্শের কথা চিন্তাই করতে পারেন নি। জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে তাঁরা কিছুমাত্র অবহিতও নন এবং ছিলেনও না। জনগণের চিন্তা-ভাবনা ও দাবি-দাওয়ার সাথে তাঁদের কোন পরিচিতিও ঘটেনি। ফলে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলনই ঘটাতে সক্ষম হননি। এই কথা কেবল যে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেই সত্য তা-ই নয়, এর পূর্বেও যতবারই এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, ততবারই এটা প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত আদর্শহীন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যেমন শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনায় কোন রূপ আদর্শিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম নয়, তেমনি জনগণের চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদের পক্ষেও সম্ভব নয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় তার কিছুমাত্র প্রতিফলন ঘটানো। বর্তমানেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে বড় বড় গালভরা বুলি কপচানো হচ্ছে তারও পরিণতি যে একইরূপ হবে, তা এ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। একেতো যাঁরা জাতীয় শিক্ষা পর্যায়ে নতুন পরিকল্পনা বা পরিবর্তনের কথা বলছেন, তাঁরা নিজেরাই কোন আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত নন—তদুপরি শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কেও তাঁদের আদৌ কোন ধারণা নেই। কাজেই এহেন ব্যক্তিরা শিক্ষায় কোন আদর্শিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত তাঁরা এ-ও জানেন না যে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার গণ-দাবির মূলে কোন্ আদর্শের প্রেরণা কাজ করছে এবং কিরূপ পরিবর্তন জনগণের কাম্য। তাঁরা

www.amarboi.org

যা পারবেন তা তো দেখাই গেছে—প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার কথা বলে তাঁরা একদিকে সাধারণ মুসলিম জনতাকে ও অপরদিকে আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্যপন্থীদের তুষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুসলিম জনগণের দাবি যে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা আরবী পড়িয়ে দেয়া নয়, বরং নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাই যে একান্তভাবে কাম্য, তা এখনকার শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আদৌ বুঝতে পারেন না। আসলে আরবী ভাষাই কেবল নয়, পুরোপুরি ইসলামী আদর্শ-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করাই হচ্ছে জনগণের দাবি। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু কুরআন-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই এ দাবি পূরণ হতে পারেনা। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নীচ থেকে ওপর এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঢেলে সাজানোর দাবি করে আসছে এদেশের মুসলিম জনতা। কিন্তু আগের কালের মতো এখনকার শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা ও দেশের কর্তাব্যক্তিরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করছেন না। আর ভ্রূক্ষেপ করবের্ন-ই বা কি করে। ডারউইনী থিওরী মতে, মানবাকৃতি লাভের পর মগজের যত উৎকর্ষই হোকনা কেন 'বানরত্ব' থেকে তো মুক্তি ঘটেনি এই কর্তাদের। তাই তাঁদের নিকট থেকে 'মানবত্ব' তথা প্রকৃত মানবোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা পাওয়ার আশা করাই বৃথা। তাঁরা পারেন ঝগড়া বাঁধাতে, ঝগড়ার সৃষ্টি করতে এবং যাদের পক্ষ থেকে ঢিল-পাথর বেশী আসে তাদের নিকটই মাথানত করতে, যদিও দূরে বসে ভ্যাংচাতেও তারা ভোলেন না।

আসলে শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক ও আদর্শিক পরিবর্তন আনা ছাড়া উপায়ান্তর নেই এবং তা সম্ভব এক সর্বাত্মক বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে। তাই ইসলামী বিপ্লব একান্তই অপরিহার্য যা একই সাথে সমগ্র জীবনকে—জীবনের সব দিক ও বিভাগকে শুরু থেকেই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে।

ইসলামী শিক্ষা জাতীয় মুক্তির সোপান

পূর্বেকার আলোচনায় আমি একথা সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছি যে, আমাদের বর্তমান জাতীয় শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা নয়; এ শিক্ষা বিদেশী ও বিজাতীয়—আমাদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক দুশমনদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা মাত্র। এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা উপমহাদেশের অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা উপকৃত হয়েছে কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা তাদের বিবেচ্য। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা উপমহাদেশের মুসলমানদের শুধু মারাত্মক ক্ষতিই করেনি, তাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্য সম্পদ—তাদের ঈমান ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছে; তাদের জাতিসত্তার মূল ভিত্তিটাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আমরা একটি আদর্শ-ভিত্তিক জাতি হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা আদর্শহারা, আদর্শ-বিচ্যুত ও আদর্শ-বঞ্চিত। আমরাই ছিলাম দুনিয়ার সেরা চরিত্রবান

www.amarboi.org

জনগোষ্ঠী। কিন্তু ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা আমাদের চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করেছে। চরম নৈতিক বিপর্যয় এনে দিয়েছে আমাদের জীবনের সর্বদিকে।

জাতি হিসেবে আমরা আজ এক কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা চিন্তার ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা একদিকে বলছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি একান্তই অপরিহার্য; এ ন্যে প্রাথমিক স্তর থেকেই কুরআন পাঠ ও তরজমা শিক্ষা দিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ষ্টি করতে হবে ছাত্রদের মধ্যে। কিন্তু তাঁরাই আবার কোন সঙ্গীত আসরে গানের সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ও দিক-দিশা হারিয়ে ঘোষণা করেন ঃ প্রাথমিক স্তরেই সঙ্গীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। অন্যদিকে আবার কোন নৃত্যশিল্পীর জন্মোৎসবে যোগ দিয়ে তারা অকপটে বলে ফেলেন ঃ নৃত্যশিক্ষা অবশ্যই শিক্ষার অংশ রূপে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এসব কথাবার্তার মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে, একটি মুসলিম দেশের মুসলমান ছেলেমেয়ের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের কোন নীতি বা আদর্শ নেই; কর্তাব্যক্তিরা যখন যেটা ভাল লাগে, তখন সেটারই জয়গান করেন এবং সেটাকেই শিক্ষার অঙ্গরূপে শামিল করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এ থেকে তো এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, চিন্তার দিক দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছি। এমনকি, এরূপ একটি দেউলিয়া জাতি যে দুনিয়ায় বেশী দিন নিজেদের অস্তিত্বটুকুও টিকিয়ে রাখতে পারেনা—প্রাকৃতিক নিয়মে বরং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই অবধারিত, তা বুঝবার মত কাণ্ডজ্ঞানও আমাদের কর্তা-ব্যক্তিদের নেই। এরকম ঘোষণাকারীরা আসলে বানরের উপযুক্ত বংশধরের ভূমিকাই পালন করছে। যে যেরকম নাচায়, সেই রকমই এরা নাচে; যে যেরকম ঘোষণা আমাদের দ্বারা দেয়াতে চায়, এরা নির্লজ্জভাবে সেই রকম ঘোষণাই মুখে উচ্চারণ করে। এই প্রেক্ষিতেই বলতে চাই, জাতীয় জীবনে নৃত্য আর সঙ্গীত নিশ্চয়ই এমন কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষা নয়, যা না দিলে জাতি চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে যাবে। এযাবত তো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এগুলোই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে জাতির দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া একবিন্দু লাঘব হয়নি; বরং সত্যকথা এই যে, নাচ আর গান শিখিয়েই জাতির নব্য বংশধরদের চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে। তারা সাধারণ মানবীয় লজ্জা-শরমও হারিয়েছে, সমাজে নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যারা এখনো এই বংশধরদেরকে সঙ্গীত নৃত্যকলা শিক্ষা দিতে চায়, তারা এজাতিকে চিরদিন 'কলা'ই দেখাবে, তার একবিন্দু কল্যাণ সাধন করতে পারবেনা।

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান। এদেশে কিছু সংখ্যক অমুসলিমও বাস করে বটে; কিন্তু তাই বলে সেই স্বল্প সংখ্যক অমুসলিমের দোহাই দিয়ে যারা দেশের বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 'মুসলিম' রূপে বিবেচনা করতে ও বিশেষভাবে তাদের সার্বিক কল্যাণের চিন্তা করতে প্রস্তুত নয়, তারা আসলে মুসলিম নামধারী হয়েও মুসলমানদের দুশমন। এই দুশমনির তাগিদেই তারা মুসলিম সমাজে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র

www.amarboi.org

দর্শন আওড়ায়। কিন্তু এই দর্শনটি যে মূলত মুসলিমদের মুসলমানিত্ব খতম করার লক্ষ্যে প্রচারিত, তাদেরকে 'অমুসলিম' বানানোর কুটিল উদ্দেশ্যে রচিত এবং দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তা আজ আর কারোর বুঝতে বাকী নেই। তাই এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সচেতন মুসলমানদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলিম রূপে গড়ে তুলতে হলে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। এজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগাগোড়া নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্রমবিকাশ অনুপাতে ইসলামের বিশ্বদর্শন, মানব-দর্শন ও সমাজ-দর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিবেশনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তা করতে হবে সহজ থেকে ক্রমশ কঠিন ও উচ্চতর মানে। শিক্ষার স্তর যত উচ্চ হবে জ্ঞানের মানও সেই অনুপাতে উচ্চ হতে থাকবে। অতীব সহজ-সরল বিষয় ক্রমশ উচ্চ মানে উন্নীত হয়ে জটিল ও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতি এবং গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতার সাথে পুরামাত্রায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতা ও গভীরতা আনতে হবে, তেমনি আনতে হবে জটিলতা ও সূক্ষ্মতার উচ্চমান। শিক্ষার্থীদের বয়সের সাথেও বিষয়বস্তুকে অবশ্যই সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে উপরোক্ত তিন পর্যায়ের জ্ঞানের সাথে স্থূল পরিচিতি দানই যথেষ্ট। তাতে শিক্ষার্থীদের মনে বিষয়গুলো আরও গভীর, সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে জানবার আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

এ জ্ঞান-দান পদ্ধতিকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। এদেশের একজন অধিবাসী কারোর মুখে মক্কা শরীফের কথা শুনল। সে জানতে পারল মক্কা শরীফ নামে একটা শহর আছে; সেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত। অতঃপর পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক পড়ে মক্কা শহরের ইতিবৃত্ত ও বিস্তারিত বিবরণ জানল। মক্কা থেকে ফিরে আসা লোকদের মুখে সে আরও বিস্তারিতভাবে অনেক কথা জেনে নিল। তারপরে একসময় সে নিজেই মক্কায় উপস্থিত হল এবং নিজ চোখে মক্কা শহর, কা'বা গৃহ ও অন্য সব কিছু দেখতে পেল। এভাবে বলা যায়, মক্কা সম্পর্কে সে লোকটির জ্ঞানের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় শুধু জানা বা শোনা জ্ঞান। দ্বিতীয় পর্যায় সুদৃঢ় ও প্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান—'ইলমে ইয়াকীন'। আর তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ বা সর্বোচ্চ পর্যায় প্রত্যক্ষদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান—'আইনুল ইয়াকীন'।

একটি বিষয়ের জ্ঞানকে প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহজ-সরল থেকে ক্রমশ ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও জটিল পর্যায়ে উন্নীত করা এবং শিক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধির ক্রমিক ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার অনুধাবন, গ্রহণ ও ধারণ

www.amarboi.org

ক্ষমতার ক্রমবিকাশের সাথে মিল রেখে পরিবেশন করাই ইসলামের শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা না হলে শিক্ষার্থীর মানসিক তথা জ্ঞানগত বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির বিধানও তা-ই।

এই পর্যায়ে স্মর্তব্য, সাধারণত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে অজানাকে জানা। কিন্তু ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু অজানাকে জানাই নয়, বরং সব চাইতে বেশী অজানা অথচ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য হচ্ছে আল্লাহকে জানা। আল্লাহকে জানা যায় তাঁর ঘোষিত গুণাবলীর সাথে গভীর ও ব্যাপক পরিচিতি লাভের মাধ্যমে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তত্ত্ব ও সৃষ্টি-কৌশল এবং বিশ্বলোককে জানার সাহায্যে। বিশ্বলোককে যথার্থভাবে জানতে না পারলে মানুষ নিজেকেও জানতে পারে না। আর মানুষ নিজেকে যদি যথার্থভাবে জানতে না পারল, তাহলে তার জন্ম ও জীবনটাই অর্থহীন।

তাই ইসলামী শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রথমেই শামিল হতে হবে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী জানা—তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি তথা আদেশ ও নিষেধগুলো জানা। সেই সাথে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষের জীবন—মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং একদিকে আল্লাহ ও অপরদিকে বিশ্বলোক ও তার মধ্যকার যাবতীয় জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ ও আচরণ-বিধি ইত্যাদি জানাও আবশ্যিক বিষয় রূপে গণ্য থাকবে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষণীয় বিষয়ের এই ব্যাপকতা একান্তই অপরিহার্য। যে শিক্ষা ব্যবস্থা উক্ত বিষয়গুলো এই বিন্যাস সহকারে শিক্ষাদান করছে না, তা ইসলামী শিক্ষা নয়—তা নয় মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে চালু নেই। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় হয়ত অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে অনেক তথ্য শেখানো হচ্ছে; কিন্তু উপরিউক্ত জরুরী বিষয়গুলো উক্তরূপ বিন্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে শিক্ষা দান করা হয় না বলেই তা সাধারণভাবে মানুষের এবং বিশেষভাবে মুসলমানের কোন কল্যাণেই আসেনা, বরং মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, বর্তমানে প্রচলিত এই অকল্যাণকর বরং মারাত্মক ক্ষতিকর শিক্ষা ব্যবস্থাকে খতম করে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তন করাই জনকল্যাণকামী যে কোন সরকারের কর্তব্য। বাংলাদেশের মুসলিম জনতার এটাই ঐকান্তিক দাবি।

এই ভূখণ্ডের মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে ইংরেজ শাসন আমল, পাকিস্তান আমল, এবং বর্তমান বাংলাদেশ আমলে বার বার এখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে সম্ভাব্য সকল উপায়েই দাবি জানানো হয়েছে। এ জন্যে অসংখ্য সভা-সম্মেলন, সেমিনার, আলোচনা সভা ও বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এইসব দাবি-দাওয়া উক্ত তিন আমলের কর্তৃপক্ষকে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনে রাজী করাতে সক্ষম হয়নি। শাসকরা গণদাবির প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়নি। তারা মুখে ওয়াদা

www.amarboi.org

করলেও সে ওয়াদার বার বারই খেলাফ করা হয়েছে। গণদাবিকে পাশ কাটানোর জন্যে তারা সুস্পষ্টভাবে মুনাফেকী করেছে। ইসলামী জনতাকে নির্লজ্জভাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। এ দিক দিয়ে পরাধীন আমল ও স্বাধীন আমলের মধ্যে কোনই পার্থক্য হয়নি।

বৃটিশ আমলে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তিত না হওয়ার বোধগম্য কারণ হল ইংরেজ শাসকরা তা কিছুতেই করতে পারে না। কেননা এদেশে যে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন মুসলিম শাসন কাল থেকে চলে এসেছিল তাকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে নিজেদের মনোপূত দর্শন ও অসদুদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই তারা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। তারা মুসলিম সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ও নিজেদের পরিকল্পিত শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে 'খৃস্টান' বা 'অমুসলিম' বানাতে চেয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান আমলে এই দাবি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ ছিল, শাসকবর্গ ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্তারা ছিলেন বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা কি করে তাঁদের মন-মানস ও চরিত্রের বিপরীত ইসলামী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁদেরই সন্তানকে? আর শেষকালে স্বাধীন বাংলাদেশেও এই দাবি অস্বীকৃত হওয়ার কারণ হল, স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের শাসন ক্ষমতা ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃত্ব এমন লোকদেরই কুক্ষিতগত রয়েছে যারা নিজেরাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বৃটিশের অন্ধ গোলাম এবং নিজেদেরকে ডারউনী দর্শন অনুযায়ী লাঙুলবিহীন বানরের বংশধর বলে বিশ্বাস করেন। কাজেই এহেন শাসকরা 'পরাধীন' বা প্রায়-স্বাধীন এবং স্বাধীন—এই তিনও অবস্থায় একই প্রকারের ভূমিকা পালন করবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু বর্তমান সময়ের ব্যর্থতা যে এর পূর্বের দুই আমলের ব্যর্থতার তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা বিদেশী বা বিধর্মীরা যে এদেশের মুসলিম জনগণের দাবির প্রতি কোন গুরুত্ব দেবে না, তা সহজেই বোঝা যায়। পাকিস্তান আমলের ব্যর্থতাও কম বেদনাদায়ক নয়। কেননা পাকিস্তান অর্জিতই হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র তথা ইসলামী তাহ্‌যীব ও তামাদ্দুন কায়েমের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে, এটা সকলেরই জানা ছিল। তখনকার প্রকৃত শাসকরা বাংলাদেশী ছিলেন না বটে, কিন্তু মুসলমান তো ছিলেন! সে হিসেবে পাকিস্তান আমলেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছিল তাদের দ্বীনী দায়িত্ব। আর সর্বশেষে বাংলাদেশের ব্যর্থতা সর্বাধিক দুঃখজনক এই কারণে যে, এখানকার শাসকরা সকলেই এদেশী—বিদেশী নয়। এ দেশীয় শাসকরা এই দেশেরই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত, ঐকান্তিক ও ঐক্যবদ্ধ দাবি মানবে না, তা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে! শাসকরা সব সময়ই 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে চিৎকার করেন। দেশের জনগণের দাবি অনুযায়ী কাজ করাই নাকি গণতন্ত্র। তা হলে জনগণের ঐক্যবদ্ধ দাবি দেশী শাসকদের দ্বারা অস্বীকৃত হলে সেটাকে কিভাবে 'গণতন্ত্র' বলা যেতে পারে? তার অর্থ, বাংলাদেশের শাসকরা 'গণতন্ত্রের' বুলি কপচালেও কার্যত তা অনুসরণ করতে

www.amarboi.org

প্রস্তুত নন। আসলে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করাই হচ্ছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যথার্থ রূপ। এটাই ম্যাকিয়াভেলীয় শাসন-নীতি। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়। এদেশের শাসকরা তো মুসলিমও। শুধু মুসলিমই নন, তাঁরা নামায পড়লে তাঁদেরকে "নামাযী" এবং হজ করলে তাদেরকে "হাজী" না বললে রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়ে বসেন। তাঁরা যখন বলেন ঃ 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' কিংবা "এ দেশে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামকে বাস্তবায়িত করা হবে" তখন এদেশের মুসলিম জনতা শুধু খুশীই হয়না, রীতিমত আশাবাদী হয়ে ওঠে। তাই শাসকরা যখন বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ রূপায়িত হবে, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হবে ইত্যাদি, তখন তাকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কার্যত যখন দেখা যায় যে, তাদেরই মতো বানর বংশজাত ছেলে-পিলেদের ইট-পাটকেল পড়লে তাঁরা তাঁদের বলা সব কথা রীতিমত ভুলে যান, তখন চরমভাবে হতাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এই প্রেক্ষিতে আমি দেশবাসীর নিকট চূড়ান্তভাবে বলতে চাই, যারা নিজেদেরকে বানর বংশজাত বলে বিশ্বাস করে এসেছে তাদের দ্বারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব নয়। আসলে অতীতের ন্যায় এখনও আমরা মারাত্মক ধরনের গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। বানর-বংশজাত লোকদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি না পেলে এ গোলকধাঁধাঁ হতে নিষ্কৃতি লাভ কোনদিন সম্ভব হবে না। অতএব মুসলিম জনগণের জন্য একটিমাত্র পথই এখন খোলা আছে আর তা হচ্ছে চূড়ান্তভাবে ইসলামী বিপ্লব সংঘটন। এই আবর্জনার স্তুপ থেকে এদেশকে—এদেশের মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, দিতে পারে ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ইসলামী শাসন পদ্ধতি, ইসলামী অর্থনৈতিক ইনসাফ ও নিরাপত্তা এবং ইসলামী সংস্কৃতি একটি সফল ইসলামী বিপ্লব।

এই কথা দেশবাসীর পক্ষে যতশীঘ্র অনুধাবন করা সম্ভব হবে ততশীঘ্রই ইসলামী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হবে।

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিশেষত্ব

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের দুটি বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয়। একটি তার সর্বজনীনতা (Universality) আর দ্বিতীয়টি তার নিরন্তর-নিরবচ্ছিন্ন সত্যানুসন্ধান প্রবণতা (Continuous search for Truth)।

সর্বজনীনতা বা সর্বাত্মকতার অর্থ—নারী-পুরুষ, শহরবাসী-গ্রামবাসী সকলেরই জন্যে শিক্ষার অবাধ ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা বিধান, সকলকেই শিক্ষা-দীক্ষায় ভূষিত করে তার নিজের এবং গোটা সমাজ ও জাতির জন্যে কল্যাণকর করে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে কোন রূপ শ্রেণী-বর্ণ-গোত্রের পার্থক্য বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধক হতে পারেনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষাকে জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সংক্রান্ত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বীন ও দুনিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়েও কোন ব্যবধান গ্রাহ্য হবেনা। জীবন ও জগতের সমগ্র দিককেই শিক্ষার আওতার মধ্যে আনতে হবে। তাকে বৈষয়িক ও নৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত হতে হবে; সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার যোগ্যতাসম্বলিত হতে হবে। তাতে জীবনকে এক অবিভাজ্য একক (Unit) রূপে গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য তাতে জাগতিক বিষয়াদির ওপর আধ্যাত্মিক দিককে—বস্তুগত দৃষ্টিকোণের ওপর নৈতিক দৃষ্টিকোণকে বিজয়ী ও প্রভাবশালী হতে হবে। কেননা ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

ইহজীবন পরকালীন জীবনের জন্যে কর্মক্ষেত্র স্বরূপ।

এই ঘোষণার তাৎপর্য হল, শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের পক্ষেই পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্যকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে পুরোমাত্রায় অংশ গ্রহণ সম্ভবপর, যেন এক্ষেত্রে কোনরূপ কূপমন্ডুকতা, অবিমৃষ্যকারিতা এবং অবসাদ ও অসতর্কতা স্থান পেতে না পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধান ও তত্ত্বানুসন্ধানে গভীর চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োগের প্রবল তাগিদ থাকতে হবে। উপরন্তু এখানে কোন একটা স্তর বা পর্যায়কেও চূড়ান্ত মনে করা যাবেনা। ইসলামের মৌল দর্শন হচ্ছে এই সমগ্র বিশ্বলোক এক মহান স্রষ্টার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত মহাসত্য ও রূপ-সৌন্দর্য এখনো সম্যকভাবে লোকসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠেনি। বিশ্ব-প্রকৃতিতে নিহিত কল্যাণময় দ্রব্য-শক্তি-সম্ভার এখনো মানুষের কল্যাণে

www.amarboi.org

পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার ও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। সেই প্রচ্ছন্ন সত্য ও সৌন্দর্য এবং সেই অব্যবহৃত দ্রব্য ও শক্তি-সম্ভারকে উদ্ঘাটিত ও আবিষ্কৃত করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার ও প্রয়োগ করার যোগ্যতা সৃষ্টিকারী জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে মানুষকে ইহকালে সুখময় জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে হবে।

বস্তুত দুনিয়ার সবগুলো সমুদ্রের পানি যদি মসি হয় আর সমস্ত বৃক্ষ যদি হয় কলম, তা হলেও বিশ্বলোকে বিরাজিত নিয়ম-কানুন ও শক্তি-সামগ্রীর বর্ণনা লিখে শেষ করা যাবেনা। তাই তত্ত্ব অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা ইসলামী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ববহ।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ্-অবিশ্বাস ও বস্তুবাদী ভাবধারার ওপর বিকাশ লাভ করেছে। বস্তুগত সভ্যতা ও সংস্কৃতিই এর প্রাণ। বৈষয়িক সুখ-সুবিধা ও স্বাদ আস্বাদনই এর একমাত্র লক্ষ্য এবং তাকেই মনে করা হয় একমাত্র চরম সাফল্য। তাতে আধ্যাত্মিকতা ও দ্বীনী মূল্যমান (Values) হচ্ছে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। মুসলিম সমাজ নির্বিচারে এই শিক্ষা গ্রহণ করে তার দ্বীনী ভাবধারা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে গোটা সমাজ বর্তমানে এক দুঃখজনক অবস্থার সম্মুখীন; তার জাতিসত্তা আজ সুসংবদ্ধতা, নৈতিক বিশেষত্ব ও উন্নত আদর্শবাদিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপর্যয়ের চরম সীমায় উপস্থিত। প্রকৃত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের সব পথ তার জন্যে সম্পূর্ণ বন্ধ।

বলা বাহুল্য, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ—একথা বলা হচ্ছেনা। আমার বক্তব্য হল, বর্তমানে জীবন ও সমাজ পূর্বের তুলনায় অনেক বিস্তীর্ণ—সম্প্রসারিত আর এই জীবন সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছে পাশ্চাত্যের খোদা-দ্রোহীমূলক দর্শন ও জীবন-বিধান। জীবনকে এ রাহু-গ্রাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আল্লাহ্-বিশ্বাস ও আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা ইসলামী শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলেই মুসলিম ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে প্রকৃত কল্যাণে ধন্য করা সম্ভব হবে। তারা বর্তমান পাশ্চাদপদতার পরিবর্তে অত্যাধুনিক ও প্রাগ্রসর জাতিগুলোকেও অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে—লাভ করতে পারবে প্রকৃত উন্নতি ও স্থায়ী অগ্রগতি। কেননা ইসলামী শিক্ষা-সূচীর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মন ও মানসিকতার পরিশুদ্ধি, নির্মলতা ও স্বচ্ছতা বিধান এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা মুক্তকরণ, অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-সাধনার ফলে কল্যাণ-প্রস্রবনের উৎস-মুখ উন্মোচন এবং সমগ্র মানুষকে সে কল্যাণের অংশীদার বানানো।

এ লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠক্রম ও বিষয়-সূচী সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে বিন্যাস করতে হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যারাই তৈরী হবে,

www.amarboi.org

তারাই ভবিষ্যত মানব সমাজের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে এবং দ্রুত অগ্রসরমান মানব-বংশের যথার্থ নেতৃত্ব দান কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব হবে।

অতএব ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হল, আধুনিক কালের উপযোগী যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও পুরাপুরি ইসলামী আদর্শবাদী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরী করা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামী শিক্ষাদর্শনের দৃষ্টিতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র প্রেম-ভালোবাসা এবং আল্লাহ্নুগত্যের প্রবল ভাবধারা জাগ্রত করে তোলা। এ পর্যায়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথাটি যথার্থ। তিনি বলেছেন ঃ 'ইসলাম শুরু থেকেই এক রাজনৈতিক ধর্ম-মত'। আমরা বলব ঃ ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের ওপর তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বর্তমান থাকা অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানরা হবে উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ, আদর্শনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও আদর্শানুসারী মানুষ, জনদরদী ও সার্বিক কল্যাণকামী মানুষ এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক—পরকালে যারা হবে মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত বিচারে সর্বতোভাবে উত্তীর্ণ, আল্লাহ্র সর্বাধিক সন্তুষ্টিতে ধন্য।

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য তালিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও অনন্যতার প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে মানব মনে ও আত্মায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়-মনে আল্লাহ্র ভয়কে সদা জাগ্রত ও সক্রিয় প্রভাবশীল রাখা ও প্রত্যয়কে জীবন নিয়ন্ত্রণকারী চেতনায় পরিণত করা যেন প্রতিটি মানুষ তার বাস্তব জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নিষিদ্ধ কোন কাজ সম্পাদন না করে। বস্তুত দ্বীন-ইসলামের মূল লক্ষ্যও এটাই।

এই উদ্দেশ্য লাভের জন্যে প্রয়োজন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা, যা অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্যে বাধ্যতামূলক। এরূপ শিক্ষালাভ ব্যতীত ব্যক্তির মন-মানস, জীবন, চরিত্র ও বৈষয়িক কর্মতৎপরতা কখনই ইসলামী আদর্শানুযায়ী উত্তীর্ণ হতে পারেনা। ফলে তার শুধু পরকালীন জীবনই নয়, বর্তমান বৈষয়িক জীবনও প্রকৃত তাৎপর্যের দৃষ্টিতে নিতান্তই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

ইসলামী শিক্ষাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিটি ব্যক্তিকে গভীরভাবে সুপরিচিত করা :

ক. এই বিশ্বলোক এবং এখানকার অপরাপর সৃষ্টিকুলের সাথে তার সম্পর্ক,

খ. জীবনের কর্মকাণ্ডে তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য,

গ. অন্যান্য মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য,

চ. বিশ্বলোক প্রপঞ্চ অনুধাবন এবং তার পিছনে সদা কার্যকর নিয়মাবলী পুংখানুপুংখ রূপে অধ্যয়ন,

জ. মহান স্রষ্টার সৃষ্টিধর্মী বুদ্ধিমত্তা বা কৌশল, যা মানুষের সৃষ্টিকর্মে পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়েছে —গভীরভাবে অনুধাবন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অনুরূপ এক পাঠ্যতালিকা রচনা করা এবং আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিম্নশ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা পড়ানোর ব্যবস্থা করা প্রকৃত মুসলিম নাগরিক তৈরীর জন্যে একান্তই আবশ্যক এবং সে রূপ একটি পাঠ্যতালিকা আমরা কুরআন মজীদকে ভিত্তি করে সহজেই রচনা করতে পারি।

www.amarboi.org

এ পর্যায়ের পাঠ্যতালিকায় এমন বিষয়াদি শামিল করতে হবে, যা শিক্ষার্থীর হৃদয় মনে মহান আল্লাহ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করবে; এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, তিনি এক, একক ও লা-শরীক। তিনিই সমগ্র সৃষ্টিলোকের একমাত্র স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, পরিচালক ও শিক্ষাদাতা এবং প্রতিটি জীব ও প্রাণীর রিযিকদাতা। কেবল তিনিই মানুষের একমাত্র মা'বুদ, তিনি ছাড়া আর কেউই মা'বুদ নেই—হতে পারেনা। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি শাশ্বত—চিরন্তন। তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, ক্ষমাকারী, প্রার্থনা কবুলকারী ও বিপদ থেকে উদ্ধারকারী।

কুরআন মজীদে এই পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক আয়াত রয়েছে। সে আয়াতসমূহ একত্রে পড়ানো ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠদান আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে :

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ -

স্মরণ করো তোমার রব্ব যখন ফেরেশ্‌তাদের বললেন, আমি মানুষকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করব, যখন তাকে পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবয়ব দান করলাম এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন সকলেই—সবকিছুই তার জন্যে সিজদায় পতিত হল। (সূরা সা-দ ৭০ ও ৭১)

এ আয়াতের সাহায্যে আল্লাহ্, মালায়িকা বা ফেরেশ্‌তা, কাদামাটি দিয়ে প্রথম মানুষটির সৃষ্টি, তাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেয়া এবং সবকিছুরই তার আনুগত্য স্বীকার সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এ থেকে মানুষ সম্পর্কে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, মানব দেহ মাটির মৌল উপাদানে তৈরী হলেও তা একান্তভাবে জড় পদার্থ নয়, তাতে রয়েছে আল্লাহ্র দেয়া বিশেষ রূহ—যা নিছক জীবন বা প্রাণই নয়—আত্মাও। তাই মানুষ জড় (Matter) ও চেতনা (Sprit) উভয়ের সমন্বিত এমন এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা, যার আনুগত্য করতে—বরং সঠিক কথায় তার হাতে ব্যবহৃত হতে প্রস্তুত গোটা সৃষ্টিলোক। ফলে মানুষ সৃষ্টির জড়বাদী ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের মানব সম্পর্কিত ধারণা একান্তই ভুল। সেই সঙ্গে মানুষের আত্মাসর্বস্ব সৃষ্টির ধারণাও কিছুমাত্র সত্য নয়।

অনুরূপভাবে এই বিশ্বলোকে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা আমরা নিঃসন্দেহে নির্ধারণ করতে পারি আল্লাহ্র ঘোষণা اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً। (আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি) থেকে। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য সব জীব-জন্তু-প্রাণীর মত লক্ষ্যহীন ও দায়িত্বহীন নয়—নয় কোন স্বেচ্ছাচারী সত্তা, বরং তাদের থেকে

www.amarboi.org

সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং উন্নততর এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সে মর্যাদা হচ্ছে, মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করাই তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সব কিছুই তার সহযোগী।

পরবর্তী বাক্যাংশ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا থেকে আমরা মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উৎস সম্পর্কেও জানতে পারি যে, সে জ্ঞান আল্লাহ্‌র দেয়া শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত, উত্তরকালে যা ওহীর মাধ্যমে সময়-সময়ে মানুষকে দান করা হয়েছে। ফলে মানুষের জ্ঞানের উৎস দু'টি। একটি স্বভাবজাত বা বংশানুক্রমিক আর অপরটি ওহী।

মানুষের জীবন-লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা স্থির-নিশ্চিত ধারণা গ্রহণ করতে পারি সূরা আয-যারীয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াত وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ থেকে। সেই সাথে মানুষের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি সূরা মরিয়মের শেষ তিন আয়াত থেকে:

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا – لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا – وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا –

আসমান ও জমিনে বসবাসকারী সকলেই মহান দয়াবানের সমীপে একান্ত দাস হিসেবেই আসবে। তিনি তাদের বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ভালোভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর তারা সকলেই কিয়ামতের দিন তার সমীপে একক ও নিঃসঙ্গভাবে আসবে। (সূরা মারিয়াম : ৯৩-৯৫)

তাই ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য-সূচীতে মানুষের ব্যক্তিগত—ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি শামিল থাকা উচিত। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের ধারণ ক্ষমতার মান অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমিক ধারায় শামিল থাকতে হবে।

এ শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহির পূর্ণাঙ্গ ধারণার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে, ভাল কি, মন্দ কি, হালাল কি, হারাম কি, কোন্ কাজ কিভাবে করলে পরকালে শান্তি বা শাস্তি হবে। এর ফলে তার মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি ও বাছাই করার যোগ্যতা বাড়বে। তাদেরকে ভাল স্বভাব-চরিত্র এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও শিক্ষাদান জরুরী, যেন তারা এ ক্ষেত্রে উন্নত মানের শোভন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। সুস্বাস্থ্য রক্ষার দিকেও তাদেরকে সচেতন বানাতে হবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরতে হবে। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য আয়াত:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

www.amarboi.org

হে ঈমানদার লোকেরা! এই মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও পাশা—এ সবই না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা ইহা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা মায়িদা : ৯০)

এই দৃষ্টিতে দুনিয়ার খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবান ও সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় ও ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা মানুষ সাময়িকভাবে আনন্দ-স্ফূর্তি বা সুখ পেলেও পরিণামে তা মানব জীবনে নিয়ে আসে গভীর দুঃখ ও বেদনা, সামাজিকতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে তিক্ততা, শত্রুতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ।

শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা এবং যুক্তিবিদ্যা শেখাতে হবে, যা নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র সৃষ্টিকর্মে। বিশ্বলোক, বিশ্বলোকে নিহিত প্রকাশমানতা (Phenomena), প্রকৃতিতে নিহিত রহস্য-জ্ঞান ও নিয়মাদি কুরআনের উপস্থাপনকে অনুসরণ করে তাদেরকে বোঝাতে হবে। বিশ্বলোকে আল্লাহ্র কুদরাত, অনুগ্রহ ও মুজিযা কিভাবে কাজ করছে, সে বিষয়ে তাদের সচেতন বানাতে হবে। প্রকৃতিতে বিরাজিত আল্লাহ্র নিদর্শনাদিরও বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক পাঠ্য-তালিকায়।

ইসলামী পাঠ্যতালিকা চিন্তার স্বাধীনতাকে উদ্বোধিত করবে। যখন তাকে ভালো-মন্দ ও হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান পরিবেশন করা যাবে, তখন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে নিজের জীবনকে সঠিক পথে চালাতে সক্ষম হবে। সে একজন দায়িত্ব-সচেতন ও সক্রিয় নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠতে পারবে। কাজেই বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে প্রতিটি মানুষকেই স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্ম-নির্ভরশীল বা পর-মুখাপেক্ষীহীন করে গড়ে তোলা এবং গড়ে ওঠতে পূর্ণ সহযোগিতা দান একান্তই আবশ্যক।

সামাজিক দায়িত্ববোধ

ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য-বিষয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ ও বিশ্বাস জাগাবে যে, ইসলামে সামাজিক শৃংখলা মূলত ঐক্য-একতা, সমতা-সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তিশীল। তা স্বৈরতন্ত্র ও স্বৈরাচার এবং একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন; ভাষা-বর্ণ, বংশ-অঞ্চল, অর্থ সম্পদ—প্রভৃতির দিক দিয়ে মুসলিমে মুসলিমে কোন পার্থক্যই স্বীকার করেনা। দুনিয়ার মুসলিম—যেখানেই যার বাস—সকলে একই ঈমান ও একই অকৃত্রিম সহানুভূতির অংশীদার। গোটা মুসলিম উম্মাহ যেন একটি ব্যক্তিসত্তা। তারা ন্যায়পরায়ণতা, সত্যানুসরণ ও আল্লাহ্র বিধান পালনে পরস্পরের সহযোগিতা করবে এবং খোদাদ্রোহিতা ও শরী'আতের আইন লঙ্ঘনে কোন সহযোগিতা বা সমর্থনকে বরদাশ্ত করবেনা।

www.amarboi.org

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ -

আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। (সূরা রূম ঃ ২২)

تَعَوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

আর গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ, তাতে কাউকে একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা, তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

(সূরা-মায়িদা ঃ ২)

অনুকম্পা ও পরামর্শ গ্রহণ

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের দুটি আয়াত উল্লেখ্য ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْكُنْتَ فَظًّاغَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

(হে নবী!) এটা আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এই সব লোকের জন্যে খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, এদের মাগফিরাতের জন্যে দো'আ কর এবং দ্বীন-ইসলামের কাজ-কর্মে এদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা কর। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

www.amarboi.org

আর যা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রব্ব-এর ওপর নির্ভরতা রাখে, যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজকর্ম হতে বিরত থাকে। আর ক্রোধের সঞ্চার হলে ক্ষমা করে দেয়, যারা নিজেদের রব্ব-এর হুকুম মানে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

(সূরা শূরা ঃ ৩৬ — ৩৮)

ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় অবশ্যই এমন বিষয়াদি শামিল থাকতে হবে যা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অনুকম্পাশীল ও দয়ার্দ্রহৃদয় বানাবে এবং অভ্যস্ত বানাবে সাথীদের থেকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে। নিজের মতকে অন্য লোকের ওপর চাপিয়ে দেয়ার বা অন্য সবকে নিজের মতের অন্ধ অনুসারী বানানোর প্রবণতা কখনো লালন করবেনা।

একজন শিক্ষিত মুসলিম পারিবারিক জীবনে পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি শুভ আচরণ ও প্রত্যেকের হক আদায়ে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়ে গড়ে ওঠবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

তোমার রব্ব ফায়সালা করে দিয়েছেন (এক) তোমরা কারও ইবাদত করবে না- কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ!' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে।

(সূরা-বনী ইসরাইল ঃ ২৩ ও ২৪)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً-

তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই জাতির

www.amarboi.org

মধ্যে থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। (সূরা রূম ঃ ২১)

সমাজের অসহায়, অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন লোকদের প্রতি সে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে ঃ

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ ط لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا -

নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করিও না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রব্ব-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭

সামাজিক সংহতি

ইসলামী সমাজের নাগরিকগণ পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। কেউ কারোর আইনসঙ্গত অধিকার, মালিকানা ও মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবেনা। প্রত্যেকেই স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করবে। কেউ কাউকে শোষণ করবে না—ঠকাবেনা । পাঠ্য বিষয়বস্তু দিয়ে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ এভাবেই গড়ে তুলতে হবে। কেউ কাউকে অপমানিত, লাঞ্ছিত বা বিদ্রূপ করবে না, কারোর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবেনা, কারোর দোষ রটিয়ে বেড়াবেনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَاتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে—হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোন মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে—হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিসম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। (সূরা হুজরাত ঃ ১১)

www.amarboi.org

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ –

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। (সূরা-হুজরাত ঃ ১২)

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ক

ইসলামে সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ ও প্রবণতা, বিশেষ করে অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তাই পাঠ্যপুস্তকে এ পর্যায়ের বিষয়াদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক, সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সরকারকে শুভ নীতি-ভঙ্গি, আদর্শ ও কল্যাণময় আইন মেনে চলতে বাধ্যকরণ পর্যায়ের জ্ঞানও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সরকার ও সরকার-চালক সঠিক ও শুভ না হলে জন-মানুষের জীবন কখনই শুভ হতে পারেনা। তাই ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যতালিকায় এই পর্যায়ের বিষয়াদি অবশ্যই শামিল থাকতে হবে। কেননা কুরআন মজীদ উক্ত বিষয়াদির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে।

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ –

বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যই নয়। তাঁর নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা আর কারোরই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। (সূরা-ইউসূফ ঃ ৪০)

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ – مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ –

www.amarboi.org

হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখ, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব্ব ভালো, না সেই এক আল্লাহ যিনি সবকিছুরই ওপর বিজয়ী—মহাপরাক্রমশালী। তাঁকে বাদ দিয়া তোমরা যাদের বন্দেগী কর, তারা ক'টি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রাখিয়া লইয়াছ। আল্লাহ ওদের জন্য কোনই সনদ নাযিল করেন নাই।

(সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ –

যারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।

(সূরা-মায়িদা : ৪৪)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ –

এরা সেই সব লোক, যাদেরকে আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, যাবতীয় ভাল কাজের হুকুম দিবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্জ : ৪১)

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ –

হে লোকসকল! তোমাদের রব্ব-এর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আরাফ : ৩)

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ –

আমরা তোমাদেরকে জমিনে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্যে এখানে জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় কর। (সূরা আ'রাফ : ১০)

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ – قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ –

www.amarboi.org

এই লোকেরা যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই সব কাজ করতে দেখেছি আর আল্লাহ্ই আমাদেরকে এরূপ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে বল, আল্লাহ্ লজ্জাকর কাজের হুকুম কখনই দেন না।

(সূরা আরাফ ২৮-২৯)

আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ زوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى زوَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্কে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল রয়েছেন। (সূরা মায়িদা : ৮)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফিরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফিতনা খতম হয়ে যায়। (সূরা আনফাল : ৩৯)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন একটি সৈন্য-বাহিনী রূপে কাফিরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনই পশ্চাদমুখী হবে না।

(সূরা আনফাল : ১৫)

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ -

আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তাদের ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে ছুঁড়ে মারো; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পসন্দ করেন না। (সূরা আনফাল : ৫৮)

www.amarboi.org

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ
بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ –

আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত ঘোড়া (বাহন) তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত করে রাখ, যেন তার সাহায্যে আল্লাহ্র এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পারো যাদেরকে তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কক্ষণই জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল : ৬০)

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ
اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ –

আর মুশরিকদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় (আল্লাহ্র কালাম শুনার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছিয়ে দাও। এটা এই জন্যে করা উচিত যে, এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না। (সূরা তওবা : ৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا
فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ –

হে ঈমানদার লোকেরা! যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন।
(সূরা তওবা : ১২৩)

ইসলামী পাঠ্যতালিকায় এমন বিষয়বস্তু থাকতে হবে যা শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতায় আদর্শবাদ, আদর্শিক বলিষ্ঠতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার সৃষ্টি করবে এবং নিজেদের আদর্শিক বিজয় সাধনে নির্ভীক ও অগ্রসরমান বানাবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি-রক্ষা ও পরস্পরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে ইসলামের নীতি অত্যন্ত দৃঢ়। বিশ্বশান্তি রক্ষায় এ নীতি অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু কোন রাষ্ট্র যদি সেদেশের মুসলিম সংখ্যালঘুকে দুর্বল ও অসহায় পেয়ে নির্যাতনের শিকার বানায় তা হলে মুসলিম মাত্রই সক্রিয় প্রতিবাদী হয়ে ওঠবে। তখন সে ব্যাপারটি আর সেদেশের 'আভ্যন্তরীন ব্যাপার' থাকবেনা। বরং সে দেশটি আন্তর্জাতিক চুক্তি

www.amarboi.org

লংঘনের অপরাধে দায়ী হবে। এ বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদেরকে অত্যন্ত অনমনীয় বানাবার উপযোগী বিষয়াদি শিক্ষা দিবে।

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَ انِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

কি কারণ থাকিতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে এ জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী। (সূরা আন-নিসা : ৭৫)

মানুষ ও বিশ্বলোক

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ -

তিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন কোনরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি জমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু জমিনের বুকে ছড়িয়া দিয়াছেন আর আমরা আসমান হতে পানি বর্ষণ করিয়েছি এবং জমিনের বুকে রকমারি উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করিয়েছি। (সূরা লুকমান : ১০)

ইসলামী শিক্ষার পাঠ্য-তালিকার জন্যে অনেকগুলো জরুরী বিষয় এ আয়াতটিতে রয়েছে যা প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ানো যেতে পারে। যেমন, আকাশ-মার্গ , যা কোনরূপ সমর্থন ছাড়াই উর্ধ্বলোকে দাঁড়িয়ে আছে; গ্রহপুঞ্জের নক্ষত্র ও উপগ্রহাদি, গতি ও গতির নিয়মাবলী, আলো ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু, দিন ও রাত—এ সবই আল্লাহ্‌র কুদরাতের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। পর্বতমালা, যা পৃথিবীকে দোদুল্যমানতা থেকে রক্ষা করছে। অপরিমেয় খনিজ পদার্থ যা মাটির তলায় লুকিয়ে রয়েছে, যেমন রয়েছে লাভা বা প্রস্তরের স্তর। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র সৃষ্ট অসংখ্য জাতি-প্রজাতি, আকাশে মেঘের সঞ্চার, বৃষ্টিপাত, বৃক্ষ, গুল্মলতার উদ্‌গম ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় এখানে পাওয়া যাচ্ছে, যার গভীর ও ব্যাপক শিক্ষাদান আবশ্যক।

www.amarboi.org

মোটকথা ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি শামিল করার কথা কুরআন থেকেই জানা যায় ঃ

১. একটি ভালো সমাজ গড়ে তোলা সৎকর্মশীল আদর্শ ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, যেখানে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও সুবিচার কার্যকর থাকবে।

২. এমন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রীতি-ভালোবাসা, সহৃদয়তা, দয়া-অনুগ্রহ, কল্যাণ কামনা ও সত্যানুসন্ধানের ভাবধারা প্রভাবশালী হবে ।

৩. এমন সমাজ, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ গ্রহণ ও প্রদান এবং ব্যক্তির মেধা ও কর্মশক্তি তথা যোগ্যতার পূর্ণমাত্রার বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব হবে ।

৪. এমন সমাজ, যেখানে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করবে চিন্তায় ও প্রকাশে এবং সামষ্টিক দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে।

৫. এমন সমাজ, যেখানে ব্যক্তি নিজ আদর্শ রক্ষা করে পবিত্র, নিষ্কলুষ ও সুখী জীবন যাপনে সক্ষম হবে।

সর্বোপরি, সে সমাজ হবে আল্লাহ্‌র অনুগত, আল্লাহ্‌র আইন পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিকামী। এরূপ সমাজ গড়ার উপযোগী জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে পর্যায় ও মান অনুপাতে এবং সে শিক্ষা লাভ সহজ হবে প্রতিটি শিক্ষার্থী নাগরিকের জন্য।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সাহিত্য

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সাহিত্যে আদর্শবাদ

মানুষের জীবন একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক সত্তা। তার অসংখ্য দিক ও বিভাগ এবং অগণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। অপরিমেয় কার্যকারণ মানব জীবনে প্রতিনিয়ত কর্মরত। সাহিত্য এই পর্যায়েরই একটি বিষয় মাত্র। কিন্তু মানব জীবনে সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থান কোথায়, তা সন্ধান করে দেখা আবশ্যক। খুঁজে দেখা দরকার যে, জীবনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক কতটা ওতপ্রোত, সাহিত্য কিভাবে লালিত-পালিত হয়, উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করে এবং তখন তা কিরূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের সঙ্গে কোন্ কোন্ দিক সম্পর্কিত, তার কল্যাণের দিকগুলো থেকে বেশী বেশী ফায়দা লাভ কিভাবে সম্ভব হতে পারে—সম্ভব হতে পারে তার ক্ষতির দিকসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

হৃদয়-মনের অনুভূতির ভাষাগত রূপায়ণকেই বলা হয় সাহিত্য। আবেগ ও চেতনাকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক শব্দের বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই সাহিত্য। তা যেমন বক্তৃতা ও ভাষণরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি কাব্য ও কবিতার ছন্দময় পরিচ্ছদেও সজ্জিত হতে পারে। গদ্য রচনার সম্ভারে বিভিন্ন রূপ নিয়েও আসতে পারে তা জনগণের সম্মুখে।

মানব সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ ও বিনির্মাণে তার ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল। মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য চেতনাকে তা উজ্জীবিত, উচ্ছ্বসিত ও উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম। সৌন্দর্য চেতনাকে ভারসাম্যময় এবং জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বানাতে এবং উচ্চ মানসম্মত লালিত্য ও সুধাময় করে তোলাও সাহিত্যেরই অবদান। মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তার লালন ও উৎকর্ষ সাধন সাহিত্যেরই কীর্তি। কুপ্রবৃত্তির ওপর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির বিজয় অর্জন এবং পরিশীলিত রুচিবোধ সৃষ্টি ও তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য অসামান্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানকে উন্নত করার দায়িত্বও তারই ওপর অর্পিত। মানব চিত্তের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দুর্বলতাসমূহকে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেয়াও সাহিত্যেরই কাজ।

সাহিত্য আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণ ও প্রতিটি দিকের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তা আমাদেরকে আনন্দের সামগ্রী পরিবেশন করে এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ভেঙে

www.amarboi.org

পড়া মনকে হাত ধরে উর্ধ্বে তুলে দেয়। দরিদ্র ও সর্বহারার পর্ণকুটিরে যেমন তার স্থান, তেমনি ধনবান ও ক্ষমতাসীনদের বিলাস-বহুল প্রাসাদেও তার অবাধ গতি। সাহিত্য মূলত আমাদের হৃদয় স্পন্দনের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি; শব্দের চাক্‌চিক্যময় পোশাক পরে তা আমাদের সামনে শরীরী হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন একটা অংশ, যাকে উপেক্ষা করা যায় না—বিচ্ছিন্ন ও অপ্রয়োজনীয় মনে করাও সম্ভব নয়।

সাহিত্য জীবন ও জীবন-প্রেক্ষিতের প্রতিবিম্ব। একারণেই প্রতিটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ও সমাজের সৃষ্ট সাহিত্য কিছু-না-কিছু ভিন্নধর্মী বিশেষত্বের ধারক হয়ে থাকে. একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সমাজের এমন কিছু ঐতিহ্য গড়ে ওঠে যা তার সাহিত্যের জীবনদায়িনী রস হয়ে থাকে। পরিবেশগত স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্যের বিশেষত্ব এবং চিন্তা ও বিশ্বাসগত সাযুজ্য ও অভিন্নতা সম্মিলিত হয়ে এক-একটি বিশেষ ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, যা ভিন্নতর সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে কখনই সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না। দৃষ্টিকোণ ও চিন্তা-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশভঙ্গিতে স্বতঃই একটা বিশেষত্ব এনে দেয়। তাই 'বিশ্বের সব সাহিত্যই এক ও অভিন্ন'—কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ ও সাহিত্য দার্শনিকের এই কথা আদৌ সত্য নয়। বৈষয়িক জীবনের মৌলিক সমস্যা অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সমস্যার বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন ও নীতিগতভাবে তার সমাধান বের করা এবং বাস্তবে সে সমস্যার সমাধান করা, সর্বোপরি তার ফলাফল দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পন্থা-পদ্ধতি ও ধরন কখনই অভিন্ন হতে পারে না। এ কারণে তওহীদ-বিশ্বাসী সমাজের সাহিত্য বহুত্ববাদে বিশ্বাসী সমাজের সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হওয়া অবধারিত।

তওহীদ-বিশ্বাসী সমাজের জীবনাদর্শ ইসলাম। তা যেমন ব্যাপক, তেমনি পূর্ণাঙ্গ। তা জীবন যাপনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ও ধারাক্রমে জীবন একটি অবিভাজ্য সমগ্র হিসেবেই আচরিত ও প্রবাহিত। দ্বীন ও দুনিয়া কিংবা ইহকাল ও পরকালের কোন বিভক্তি এ পদ্ধতিতে অগ্রহণযোগ্য। বাউল-সন্ন্যাসী ও পাদ্রী-পুরোহিতের জীবনধারা এখানে সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডাকারে যাপিত হওয়ার কোন অবকাশই ইসলামী পদ্ধতিতে স্বীকৃত নয়। আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীতে ইসলামী রীতি পালন, কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় তাকে অস্বীকার করার একবিন্দু অনুমতি নেই এ জীবন পদ্ধতিতে। যে সাহিত্য মানুষকে আদর্শহীন চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ বানায়, তার ফসল ফলানো দূরের কথা, তার চাষ করাও এখানে সম্ভব নয়—তার প্রকাশ ও প্রচলনের তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১] শুধু তওহীদী

১. এক শ্রেণীর সাহিত্যসেবী মনে করেন যে, শিল্প-সাহিত্য হচ্ছে নেহাত আনন্দের সামগ্রী; তার কোন সামাজিক বা মানবিক ভূমিকা নেই। তাই শিল্প-সাহিত্যকে তাঁরা শুধু চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম রূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু ইসলাম এইরূপ দায়িত্বহীন মনোভাবকে কিছুমাত্র সমর্থন করেনা। —সম্পাদক

www.amarboi.org

জীবন-পদ্ধতির কথা নয়, যে বিধি-বিধানই জীবন ও সমাজের জন্য গৃহীত, তারই অনিবার্য দাবি হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা—জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রার অনুসরণ। এ যেমন সত্য, তেমনি এও অনস্বীকার্য যে, জীবনের এক-একটি ক্ষেত্রে এক এক ধরনের আদর্শ ও মূল্যমানের অনুসরণ অবাঞ্ছনীয়, যা পরস্পর-বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। কোন সুস্থ মানুষ জীবনকে নৈরাজ্যের মধ্যে তো ঠেলে দিতে পারে না। নৈরাজ্যের মধ্যে জীবন-বিকাশ সম্ভব মনে করা বুদ্ধি-বিকৃতিরই পরিচায়ক। সেটা যদি সম্ভব হয়ও তাহলে তা নিশ্চয়ই মানুষের জীবন নয়—সেরা সৃষ্টির জীবন নয়, নিতান্তই বন্য ও পাশবিক জীবন। কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষই তার কামনা করতে পারেনা, সে রূপ জীবনের কারণ হতেও প্রস্তুত হতে পারেনা—তার আহ্বায়ক বা উদ্ভাবক হওয়া তো দূরের কথা।

জীবনের জন্যে কোন আদর্শ ও নীতির প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। এমন একটা আদর্শ জীবনের জন্যে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যা বিশ্বলোকে—এই অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রকৃত অবস্থানকে সুনির্ধারিত করবে। মানুষ তো বৃক্ষ গুল্ম-লতা বা ঝর্ণা-নদী-সমুদ্র নয় যে, তা স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। মানুষ পশু নয়; তাই পাশব-বৃত্তিই তার চালিকা শক্তি হতে পারে না। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধসম্পন্ন সত্তা। তাই তার জীবন এসবের সুস্পষ্ট নির্ধারণকারী এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ ছাড়া চলতেই পারে না। সে আদর্শই বলে দেবে, এই জীবনে মানুষের দায়িত্বের পরিসীমা কতদূর। তা-ই নির্ধারণ করবে প্রত্যেকের অধিকার ও কর্তব্য। পারস্পরিক বিরোধ-বিসম্বাদ ও মত-বৈষম্যের মীমাংসা করা সেই সর্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতেই সম্ভব। আমাদের আলোচ্য সাহিত্যের দর্শন ও রূপরেখাও তারই আলোকে নির্ধারণ করতে হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে।

তওহীদী ধর্ম (দ্বীন) ইসলামকে সম্মিলিত জীবনের একক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হলে সমগ্র জীবন তথা ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন দিয়ে তার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে হবে—তার ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তাই জীবনের কোথাও—সাহিত্য চর্চায়ও—বহুত্বের প্রতি একবিন্দু সমর্থন থাকতে পারবে না। তওহীদ-বিশ্বাসের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধান। তার সেই সন্তুষ্টি বিধানে যেমন নিয়োজিত করতে হবে ব্যক্তি-সত্তার অন্তর্নিহিত তাবৎ শক্তি ও প্রতিভাকে, তেমনি এই বিশ্বলোকের সমস্ত দ্রব্য ও সামগ্রীকে। এর কোন একটিকেও তার অসন্তোষ ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজে ও নিয়মে ব্যবহার করা যেতে পারে না—তার অধিকারও কারোর নেই।

ক্রোধ, লোভ ইত্যাকার প্রবৃত্তি মানব সত্তায় নিহিত বিভিন্ন গুণ। এই গুণসমূহের শক্তি অদম্য। তাই ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে এই গুণ ও তার শক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংযত রাখা, তাকে কোনক্রমেই বল্গাহীন না করা—বল্গাহীন হতে না

www.amarboi.org

দেয়া বরং নির্দেশিত পথে ও নিয়মে তাকে চরিতার্থ করা। এগুলোর উৎপাদন ও নির্মূল সাধন বৈষ্ণব বা বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা। ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে অসমর্থিত।

ক্রোধকে সংযত করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করা কুরআনের শিক্ষা। মানুষের জন্যে তা এক অতীব উচ্চ মানের নৈতিকতা। যারা ক্রোধকে সংযত রাখে এবং অপরাধীকে ক্ষমা করে, তারা মহান স্রষ্টার প্রিয়জন। সাহিত্যের (গদ্য বা কবিতার) সাহায্যে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে হিংসার আগুন জ্বালানো মানব সমাজের জন্যে ক্ষতিকর এবং এই গুণটিরও চরম অপব্যবহার। জাহিলী যুগে কবি-সাহিত্যিকরা তাদের কাব্য ও সাহিত্য দ্বারা গোত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার আগুন উৎক্ষিপ্ত করে তুলতো; প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করতো। অপরাধকে যে ক্ষমা করা যায়, তা ছিল তখনকার মানুষের কল্পনারও অতীত। ইসলাম কাব্য ও সাহিত্যের এই অপব্যবহার বন্ধ করে দেয় এবং মানুষে মানুষে বন্ধুতা-ভালোবাসা ও সদ্ভাব-সম্প্রীতি সৃষ্টির কাজে তার ব্যাপক ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। মানুষের জীবনকে তা সম্মানিত ও সম্মানার্হ করে তোলে। এহেন মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, অপমান এবং তার ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানোর প্রতি সমর্থন জানানো হয় যে সাহিত্যে কিংবা যে সাহিত্য মানুষকে এই কাজে প্রলুব্ধ করে, সে সাহিত্য মানুষের জন্যে কিছুমাত্র কল্যাণকর নয়। ইসলামে এরূপ সাহিত্যের কোন স্থান নেই।

লোভ মানুষকে অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত করে। পরাস্বাপহরণ, শোষণ ও বঞ্চনার মূলে সর্বাধিক কাজ করে এই লোভ। তাই মানুষকে লোভাতুর, শোষক ও বঞ্চনাকারী বানানো সাহিত্যের কাজ হতে পারে না। সাহিত্যকে এ কাজে ব্যবহার করা হলে তা যে মানবতার জন্যে চরম দুঃখের কারণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ইসলামে লোভকে সংযম ও বৈধতার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার শিক্ষা অবিস্মরণীয়।

প্রবৃত্তি মানুষের প্রধান চালিকা শক্তি। তাকে অবশ্যই আদর্শের নিগড়ে বন্দী করতে হবে। অন্যথায় তা মানব সমাজে সেই কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে, যা একটি ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ শার্দুলকে পিঞ্জরমুক্ত করে দেয়া হলে অনিবার্যরূপে সংঘটিত হতে পারে। এই কারণে ইসলামে শুধু ব্যভিচারই নিষিদ্ধ নয়, ব্যভিচার ঘটাতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টির আয়োজনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তার সহায়ক বা সমর্থক কোন পথই উন্মুক্ত থাকতে পারে না ইসলামের দৃষ্টিতে। তাই যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সাহিত্যও ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল এবং সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। জাহিলী যুগের আরবী কাব্য ইসলামে কোন স্থান পায়নি। তার পরিবর্তে এমন উন্নতমানের কাব্য রচিত হয়েছে যা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন হতে দেয় না; বরং মানুষকে বানায় উন্নত ও পবিত্র চরিত্রে ভূষিত। তখনকার সাহিত্য—কাব্য ও গদ্য রচনা উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে এই লক্ষ্যে। প্রধানত গদ্য

www.amarboi.org

সাহিত্যের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষকে ইসলামী আদর্শের আহ্বানের সঙ্গে সুপরিচিত ও একাত্ম করার কাজে। অনেক বড় মাপের কবিও তাঁদের কাব্য প্রতিভাকে এই কাজে ব্যবহার করেছেন।[১] কেননা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালনই একজন তওহীদ-বিশ্বাসীর কাজ নয়, দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের নিকট তার দাওয়াত পৌঁছানোও তার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারা। তাই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং শ্লীল-অশ্লীলের মানদণ্ড কুরআন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত।

মানুষ ও মানুষের মধ্যে বংশ-ধারা, গাত্র-বর্ণ অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে পার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি মানবতার চরমতম অপমান। ইসলাম তা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে, দুনিয়ার সব মানুষ একই পিতা ও মাতার সন্তান। সকল মানুষের দেহে এক ও অভিন্ন শোণিতধারা প্রবাহমান। সুতরাং মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে যদি কোথাও কোনরূপ পার্থক্য করা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে মানবতার শত্রুদের সৃষ্টি—মহান স্রষ্টার নয়। কেউই অন্য কারোর তুলনায় অভিজাত, শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ মর্যাদা লাভের কিম্বা অন্যদের থেকে ভিন্নতর হওয়ার অধিকারী নয়। এ ধরনের চিন্তা, বিশ্বাস বা মতাদর্শ মৌলিকভাবেই মানবতা-বিরোধী। তাই যে সাহিত্য মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তির প্রেরণা যোগায়, সে সাহিত্য মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। প্রশ্ন ওঠতে পারে, তবে কি কোনরূপ পার্থক্যই করা যাবে না মানুষে মানুষে? করা যাবে, তবে কুরআনের দৃষ্টিতে সে পার্থক্য হবে শুধু নৈতিকতার। আল্লাহ্‌মুখিতার মাত্রা ও মানগত অবস্থার ভিত্তিতে পার্থক্য করা যেতে পারে, করা হবেও। এ পার্থক্য কোন মানুষের নিকটই চিরস্থায়ী বা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নয়। আজ যে মন্দ, কাল সে সবার তুলনায় ভালো হতে পারে। আজ যে অসৎ, কাল সে হতে পারে সততায় শীর্ষস্থানীয়। আবার এর বিপরীতটাও সম্ভবপর। এসবই মানুষের আয়ত্তাধীন—ইচ্ছাধীন। এ পার্থক্যকরণ ব্যক্তির উন্নতি বিধানের সহায়ক; উন্নত মানের সমাজ গঠনের জন্যে এটি অপরিহার্যও বটে।

যে সমাজ-সমষ্টি ও তার ব্যক্তিগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, সে সমাজ সার্বিক কল্যাণে ধন্য হবে—ইহকালেও, পরকালেও। কিন্তু কোন জাতি যদি দুষ্কৃতি, চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমগ্ন হয়, বিশ্বস্রষ্টার আদেশ লংঘনে মেতে উঠে, বৈধ-অবৈধ বা ন্যায়-অন্যায়ের সব বন্ধন ছিন্ন করে—অতিক্রম করে যায় নীতি-নৈতিকতার সব সীমা, তখন সে জাতি দুনিয়ার বুকে টিকতে পারে না, তার পতন ও ধ্বংস অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। কেননা এই বিশ্বলোক একটি নিরেট ভারসাম্যের ওপর স্থিত। সে ভারসাম্য বিনষ্ট হলে বিপর্যয় অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটি জাতি যতই উন্নতির

১. এই প্রসঙ্গে মহাকবি রুমী, জামী, সা'দী ও ইকবালের অসামান্য খেদমতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

উচ্চাসনে, ক্ষমতার শীর্ষে বা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন, তার ক্ষেত্রেও এ শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাই ইসলামে আদর্শ ব্যক্তি গঠনের সাথে সাথে উন্নত মানের চরিত্র ও ন্যায়-নীতির ধারক সমাজ গঠনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কুরআন মজীদে এই পর্যায়ের কোন কথাই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি, বলা হয়েছে সমাজ-সমষ্টিকে সম্বোধন করে—বহু বচনে। তাই সাহিত্যকে অবশ্যই এই কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত করতে এবং রাখতে হবে।

আদর্শহীন জনগণকে আদর্শবাদী বানানো, অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্ভুল জ্ঞান পরিবেশন এবং সাহস ও হিম্মতহীন মানুষকে সাহসী ও নির্ভীক করে গড়ে তোলা সাহিত্যেরই কাজ। সাহিত্যকে এই কাজে ব্যবহার করা কবি-সাহিত্যিকদের মানবিক দায়িত্ব। আদর্শহীন ও বিশৃংখল চিন্তার কুহেলিকা সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও তাদেরকে নিরুদ্দেশের যাত্রী বানানোর কোন অধিকার কবি বা সাহিত্যিকদের থাকতে পারে না। কবি-সাহিত্যিকরা জাতির মেধা ও মননের প্রতিনিধি। জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি তাঁরা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন, এটাই একান্তভাবে কাম্য। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই ভূখণ্ডের মুসলিমগণ ছিল প্রায় সর্বদিক দিয়েই পশ্চাদপদ এবং জাতিত্ববোধ ও আত্মচেতনাহীন। এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকের সৃষ্ট কাব্য, গান ও সাহিত্যই যে মুসলিম জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তার ফলে উত্তরকালে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?[১] বর্তমানে যখন বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে মানবতা বিরোধী নানা ভ্রান্ত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও জীবনাচরণ আমাদের বংশধরদেরকে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত ও কলুষিত করে চলছে, তখন এখনকার কবি-সাহিত্যিকদের কর্তব্য যে তাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং নির্ভুল চিন্তা-দর্শন, মতবাদ ও আচার-আচরণে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করা, তা নির্দ্বিধায় বলতে চাই। সর্ব প্রকার নীচতা-হীনতা, ক্ষুদ্রতা, কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা থেকে এ জাতিকে রক্ষা করতে পারে আদর্শবাদী কাব্য ও সাহিত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনীশক্তি রহিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত এ জনতার দেহে জীবনবাদের বলিষ্ঠ ভাবধারা সৃষ্টি করা হলেই এর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব। অন্যথায় ইতিহাসের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জাতিসমূহের পরিণতি আমাদেরও নিয়তি হয়ে দাঁড়াবে, তা রোধ করার শক্তি কারোরই নেই। প্রবল শক্তি-সামর্থ্য ও বলিষ্ঠ মন-মানসিকতা এক-একটি জাতির প্রাণশক্তি বা আত্মা স্বরূপ এবং তা মৃতপ্রায় এ জাতির দেহে নতুন করে ফুঁকতে হবে আমাদের লেখক, কবি, সাহিত্যিকদেরকেই। আজ যে জুলুম, পীড়ন, শোষণ, অপচয়, দুর্নীতি, লুটপাট, অশ্লীলতা ও ব্যাভিচারের সয়লাবে গোটা জাতি ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কবি-সাহিত্যিকদেরই কর্তব্য হচ্ছে তার মুখে বাঁধ নির্মাণ, পানি সেঁচা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কুরআন তারই নির্দেশ দিয়েছে এ ভাষায় ঃ 'তোমরা শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করো,

www.amarboi.org

যুদ্ধযান প্রস্তুত করে রাখো, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র ও তোমাদের এবং অন্যান্য অজানা বহু শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পার।'

বর্তমান যুগ চিন্তা, দর্শন ও মতবাদের যুগ। তওহীদ-বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে এবং এ যুগের চলমান সংগ্রামে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করার জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। ভুল চিন্তা ও দর্শনকে খণ্ডন করতে হবে, ভ্রান্ত মতাদর্শের সৃষ্ট বিভ্রান্তির মুকাবিলা করতে হবে নির্ভুল চিন্তা-বিশ্বাস ও সত্য-ভিত্তিক মতাদর্শ দ্বারা। এই কাজ মূলত ও প্রধানত সাহিত্যের। এর বিপরীত কাজে সাহিত্যকে ব্যবহার করা হলে তা হবে আত্ম-বিধ্বংসী ব্যাপার। বিশেষ করে তওহীদ-বিশ্বাসী সাহিত্যিকদের আজ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালনের জন্যেই এগিয়ে আসতে হবে। একমাত্র নিরেট ইসলামী আদর্শবাদী ও ইসলামী বিপ্লবী ভাবধারাসম্পন্ন সাহিত্যের পক্ষেই আজকে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। কেননা, ইসলাম সম্পর্কে একথা চূড়ান্ত যে, তা সামগ্রিক জীবনের জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী আদর্শ, এক বিশ্বজনীন পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, এক সর্বাত্মক সংগ্রামের নাম। তা একটি চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন বিধান—একটি আপোষহীন সংগ্রাম। আর প্রতিটি বিপ্লবী আদর্শ সর্বাত্মক সংগ্রাম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই তার পয়গাম সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছাবার জন্যে কাব্য ও সাহিত্যকে ব্যবহার করে, কাব্য ও সাহিত্যকে স্বীয় ভাবধারায় সঞ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করে—দেয় তাকে নতুনতর ভাষা ও পরিভাষা। তাই একজন সচেতন তওহীদবাদী লেখকের পক্ষে আকীদা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী চিন্তা-বিশ্বাস, মতবাদ ও ভাবধারা গ্রহণ ও অবলম্বন কোনক্রমেই চিন্তাযোগ্য হতে পারেনা। ইসলামী কাব্য ও সাহিত্য তো তা-ই, যাতে মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্যে ইসলাম-নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে উন্নতমানের ভঙ্গিতে ও ভাষায়, যার মাধ্যমে কুরআন-কাংক্ষিত মানুষের চরিত্র ও বিশেষত্বের নিদর্শনাদিকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে তোলা হয়েছে, ইসলামের জীবনবাদী মূল্যমানসমূহ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং নৈতিকতার অনৈসলামী মূল্যমানসমূহ পরিত্যাগ করার জন্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বস্তুত 'শিল্প শিল্পের জন্যে' এ ধারণার পরিবর্তে শিল্প জীবনের জন্যে এ তত্ত্ব এখন সাধারণভাবে গৃহীত হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে 'শিল্পসহ জীবনের সবকিছুই চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে' এই তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য হতে পারে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্যে এবং তারই আহ্বান জানাতে চেষ্টা করা হয়েছে এই স্বল্পপরিসর আলোচনায়।

www.amarboi.org

সাহিত্যে প্রগতি

সাহিত্য চিরকালই প্রগতিশীল। প্রগতি সাহিত্যের মৌল ধর্ম—স্বাভাবিক প্রবণতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক-এক সময় এক-একজন দিক্‌পালের আবির্ভাব ঘটে, যিনি সাহিত্যকে নব ধারায় প্রবাহিত করেন। ফলে সাহিত্যে যেমন গতানুগতিকতা টিকতে পারেনা, তেমনি থাকেনা স্থবিরতা ও অনগ্রসরতা। সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নবতর রস ও প্রবাহ। কেননা কোন সাহিত্যিকই সাধারণভাবে প্রগতি-বিরোধী হননা। কাল ও প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ-বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে নিত্য-নব উন্মেষিত ভাবধারাকে সম্বল করে তিনি সৃষ্টি করেন নবতর সাহিত্য। পদ্ধতি, স্টাইল ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ভিন্নতা ও পার্থক্য সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তোলে। ফলে সাহিত্য অতীতকে অনেক পশ্চাতে ফেলে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায় দ্রুত গতিতে। তাই সাহিত্যে প্রগতি অনস্বীকার্য।

তবে প্রগতি সম্পর্কিত ধারণা সব সময় একইভাবে অনড় ও স্থিতিশীল থাকেনা। তা চিরকালই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত হতে থাকবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যেসব মূল্যমানের প্রশংসায় সমাজ উচ্চকণ্ঠ, আগামীকালই তা হতে পারে পরিত্যক্ত। সাহিত্যে যৌনতার চর্চা অতি প্রাচীন; কিন্তু তার সীমালঙ্ঘনমূলক বা অত্যধিক প্রয়োগ সুস্থ মন-মানসিকতায় অনিবার্যভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে; ফলে ক্রমে তা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বিলীন হয়ে যায়, যেমন ফাল্গুনের ছোঁয়ায় গাছ থেকে ঝরে পড়ে পুরাতন পত্রপল্লব। তা কোন স্থায়ী মূল্যমানের ধারক হয়না বলে শ্রেয়বোধের তাড়নায় আপনা-আপনি খসে পড়তে বাধ্য হয়।

এক কালে 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল সাধারণভাবে কবি-সাহিত্যিকের 'মটো'। পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয় এবং সে স্থান দখল করে নেয় 'শিল্প জীবনের জন্যে'—এই আদর্শ। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে উভয় আদর্শই অসম্পূর্ণ এবং অযথার্থ। কার্যকারণের এই জগতে কোন জিনিসই নিজের 'কারণ' হতে পারেনা। প্রতিটি সাহিত্য-কর্ম অবশ্যই লক্ষ্যাভিসারী হয়ে থাকে—তা অনুভবযোগ্য হোক আর না-ই হোক। দ্বিতীয়ত বিশ্বলোকের হুবহু চিত্রাঙ্কন এবং ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনাকে কখনই সাহিত্য নামে অভিহিত করা যায় না। তাতে শিল্পীর নিজস্ব ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার প্রতিফলন একান্তই অনিবার্য। কোন পাঠকই ঘটনার যথাযথ প্রতিবেদনকে সাহিত্যের যথাযথ মানে উন্নীত বলে স্বীকার করতে রাজী হবেন না যতক্ষণ না তাতে

www.amarboi.org

সাহিত্যস্রষ্টার কল্পনার চিত্তাকর্ষক রং মিশ্রিত হয়। একজন সুসাহিত্যিক শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারেননা যে, 'বস্তুটি কি' বরং কি হওয়া উচিত বা কি হতে পারতো তা বলাও তাঁর নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন। এটা তাঁর গভীর মননশীলতা ও চিন্তাশীলতার বিশেষত্ব। অন্যকথায় সাহিত্য জীবনের শুধু দর্পনই নয়, তা জীবন-কাফেলার পথ-প্রদর্শকও। জীবনের গতির সাথে তাল রেখে চলাই তাঁর ধর্ম নয়, জীবনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বও তারই। নিছক বস্তুনিষ্ঠ রচনার প্রাচীরের ওপর আসীন হয়েই প্রগতি বিপ্লব বা পশ্চাদপদতার ছবি তোলা যেতে পারেনা। সমাজের পরিবর্তনকামী সাহিত্যই জীবন্ত ও শাশ্বত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাপ্রবণতা, ব্যবহারিকতা, বাস্তবতা ও সামষ্টিকতা একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এগুলোর সাযুজ্যই শিল্প বা সাহিত্যকে পূর্ণ রূপে ও উচ্চ মানে উন্নীত করতে পারঙ্গম। একজন সফল সাহিত্যিক বা শিল্পী আমাদের সৌন্দর্য-বোধকেই শুধু চরিতার্থ করেন না, আমাদের চিন্তার রুচিশীলতা ও কর্মের প্রেরণাকেও গতিশীল রাখেন। আমরা যেমন 'কাল'কে প্রভাবিত করি, তেমনি কালও প্রভাবিত হয় আমাদের দ্বারা। সফল সাহিত্যিক কাল-স্রোতে ভেসে যাওয়াতেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা নিহিত বলে মনে করেন না; বরং কাল-স্রোতের গতি পরিবর্তন করে তাকে স্বনির্ধারিত লক্ষ্যপানে প্রবাহিত করাকে নিজের একটা বড় কর্তব্য বলেও মনে করেন।

চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে অতিশয় গুরুত্বের অধিকারী। স্বাধীনতা ব্যক্তির জন্মগত অধিকার, তা-ও কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু স্বাধীনতার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন এবং তার নীতিমালা ও রূপরেখা নির্ধারণ যার-তার কর্ম নয়। Freedom means responsibility বা "স্বাধীনতার অর্থ দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা" একথা অবশ্যই স্বীকৃত।

এই দৃষ্টিতে বলা যায়, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই মৌলিক অধিকার বিশেষ, একথা সত্য; কিন্তু তা একটা নিয়মতান্ত্রিকতা ও নৈতিকতার বিধান দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। মানব জীবনে এমন সব অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে ঘটে, যা পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা হলে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন ও আহত হবে। অতএব যে বক্তব্য কেবল পাশবিক কামনা-বাসনাকেই উত্তেজিত করে, তা কখনোই সার্থক ও স্থায়ী মূল্যমানসম্বলিত সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে যৌন-সম্পর্কের একদম প্রবেশাধিকার থাকবেনা, এমন কথা নয়। অনেক সময় রোমান্টিক গল্প, উপন্যাস বা কবিতায় যৌন-সম্পর্কের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কেননা আমাদের জীবন-বৃক্ষের শিকড় যৌন কামনার মৃত্তিকা-গভীরে বিস্তীর্ণ হয়ে

www.amarboi.org

আছে। কিন্তু সাহিত্যে যৌন-সম্পর্ককে উপস্থাপন করতে হবে অত্যন্ত শালীন ও রুচিসম্মতভাবে, তার অশ্লীল ও নগ্নভাবে উপস্থাপন সাহিত্যের মান সংরক্ষণে কখনই সহায়ক হতে পারে না।[১]

আসলে মানব জীবনের অন্যান্য সব দিকের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে যে সাহিত্য, তা যেমন কালজয়ী হয়না, তেমনি তা মানুষের কোনরূপ কল্যাণ সাধনে কিংবা মানব মনে কোন মহৎ প্রেরণা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষের ঐতিহ্য তার অস্তিত্ব ও ইতিহাসের মূলদর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার অস্তিত্বের মূলদর্শন হল ঃ মানুষ এই বিশ্বলোকে উদ্দেশ্যমূলক এক বিশেষ সৃষ্টি। এখানে তার বিশেষ মর্যাদা তার এই বিশেষ জন্ম-সত্যেরই স্বাভাবিক ফসল। কাজেই বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে তার গোটা জীবনই নিবেদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার সাহিত্য যখন সে উদ্দেশ্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দিবে তখনই মানব সমাজে তা সাগ্রহে গৃহীত ও আদৃত হবে এবং গণ-মানুষের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সাহিত্য মানুষের এ ভাবধারার পরিপোষক নয়, যে সাহিত্য মানুষকে হিংস্রতা পাশবিকতা বা লালসার প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করে, সমাজে নিয়ম-শৃংখলার পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতা ও বিপর্যয়ের ইন্ধন যোগায়, তা মানবোপযোগী সাহিত্য হতে পারে না। যেসব রচনা মানুষের মধ্যে যৌন আবেগকে বল্গাহীন করার প্রয়াস পায়, যেসব কবিতা বা গল্প মানুষের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে, তাকে নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতায় উদ্বুদ্ধ করে, সে সাহিত্য মানুষের কল্যাণের সঠিক বাহন বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতে সাহিত্যকে অতি সহজে এবং অনিবার্যভাবে দু'ভাগে ভাগ করতে হয়। একটি গঠনমূলক সাহিত্য আর অপরটি বিপর্যয়মূলক সাহিত্য। প্রথমটি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ইতিহাসে মানবতার বিরাট কল্যাণ সৃষ্টিকারী সাহিত্য রূপে চিহ্নিত এবং চিরস্থায়ী মূল্যমানসম্পন্ন আর দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য যৌন উত্তেজক মাদকের ন্যায় ধ্বংসের কাজ করে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে; মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, সুস্থ মন-মানস, পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা এবং পরিশীলিত রুচিবোধকে ক্ষতবিক্ষত করে। তাই প্রথমোক্ত সাহিত্যের সাথে তার নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যের সাথে তার স্থায়ী কোন একাত্মতা অকল্পনীয়

---

১. নরনারীর যৌন সম্পর্কের বিষয় পবিত্র কুরআনেও উল্লেখিত হয়েছে। সে উল্লেখ এতই শালীন ও শোভন যে, তা পাঠক চিত্তে কোনরূপ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেনা। আমাদের সাহিত্য চর্চায়ও কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।—সম্পাদক

www.amarboi.org

সাহিত্যের একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকা একান্তই অবশ্যক। লক্ষ্য না থাকলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তা ঝরা পাতার মতই ক্ষয়িষ্ণু। বায়ুপ্রবাহে তা একদিক থেকে অন্য দিকে, ওপর থেকে নিচের দিকে তাড়িত হতে বাধ্য। তা বগ্গাহীন অশ্বের মত যে দিকে ইচ্ছা উদ্দাম গতিতে ছুটতে শুরু করবে এবং যেখানে ইচ্ছা মুখ লাগিয়ে দিয়ে যা-ইচ্ছা গ্রাস করবে। তার যা ভালো লাগবে, তাতেই সে মন লাগাবে এবং তার প্রশংসায় চারদিক মুখরিত করে তুলবে। তা যেন পাল তোলা নৌকা—হাওয়ার গতিই তার মূল গতি। এই সাহিত্য মানুষকে কোন শাশ্বত মূল্যমান দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে তা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যেতে বাধ্য।

বস্তুত সাহিত্য মানব জীবনের জন্যে অতীব মূল্যবান সম্পদ। সাহিত্য মানুষ বা সমাজের প্রতিবিম্বই শুধু নয়, তা মানুষের চরিত্রও। তাই প্রগতির নামে সাহিত্যকে কলুষিত করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। কেননা সাহিত্যকে কলুষিত করার অর্থ মানব চরিত্রকে ধ্বংস করা।

বর্তমান সময়ে সাহিত্য কোন্ ভূমিকা পালন করছে তা বিচার করে দেখা একান্তই কর্তব্য। এখনকার সৃজনশীল সাহিত্য যদি বাস্তবিকই মানুষের জন্যে কোন কল্যাণময় অবদান রাখতে অক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলা তো সাহিত্যিকদের দায়িত্ব। একথা সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্মরণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

www.amarboi.org

সাহিত্যে বাস্তবতা

একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, কোন সাহিত্যই স্থান-কালের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে হোক, কি সাহিত্য জীবনের জন্যে—উভয় ক্ষেত্রেই সাহিত্যিককে তার চারপার্শ্বে নিত্য-সংঘটিত ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির নিকট থেকে চিন্তার উপকরণ গ্রহণ করতে হয়। মূলত জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বিষয়াদির ভিত্তিতেই সাহিত্যিক তার রচনার অবকাঠামো নির্মাণ করেন। অতপর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে সে অবকাঠামোর ওপর রচনার অবয়ব নির্মাণে স্বভাবতঃই পার্থক্য সূচিত হয়। যারা 'সাহিত্য জীবনের জন্যে' মতাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা সে অবকাঠামোর ওপর রচনার পূর্ণ অবয়ব নির্মাণ করেন বাস্তবতা ও যথার্থতার উপকরণ দ্বারা। পক্ষান্তরে 'সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে' মতাদর্শের ধারকগণ কৃত্রিমতা, চিন্তার উচ্চমার্গতা ও কল্পনার আতিশয্যের সাহায্যে প্রস্তুত উপকরণাদির সমাহারে সে অবকাঠামোর ওপর রচনার প্রাসাদ গড়ে তোলেন। তখন রচনাটির অতল গহবরে নিহিত বাস্তবতা (Realiy) পর্যন্ত দৃষ্টি পৌছানোর জন্যে সে কৃত্রিমতা ও কল্পনার আবরণকে উন্মোচিত করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন মনে হয়, 'সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে'র পক্ষপাতীরা সম্ভবত জীবনের প্রকৃত বাস্তবতার খুব একটা ধার ধারেন না। পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উর্ধ্বে অবস্থিত বিষয়াদিই তাদের রচনাবলীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মূলত এটা একটা মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে প্রায় সব সাহিত্যিকই এই কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। সকলেই অকপটে স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য যে মতাদর্শ ভিত্তিকই হোক—চিন্তার যে ধারারই অনুসারী হোক, জীবনের প্রকৃত বাস্তবতার সাথে তা কোনক্রমেই সঙ্গতিহীন হতে পারেনা।

তাছাড়া সাহিত্য জীবনের শুধু একটিমাত্র দিক বা অংশেরই প্রতিবিম্ব হতে পারেনা। সাহিত্য সমগ্র জীবনেরই ভাষ্যকার। জীবনের সমগ্র রূপই প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হবে সাহিত্যের দর্পনে। ফলে তাতে জীবনের শুধু ভালো-ভালো দিকগুলোরই রূপায়ণ হবেনা, সেই সাথে জীবনের পদস্খলন ও কলংকময় দিকগুলোও সাহিত্যের উপজীব্য হবে। এই কারণে আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের রচনাবলীতে অশ্লীলতা ও পাপ-স্পৃহার উল্লেখ থাকবেনা, এমন কথা স্বীকৃতব্য নয়। কেননা, সমাজের পুঞ্জীভূত দোষ-ত্রুটি ও পাপানুষ্ঠানগুলোকে সমুখে উপস্থাপন করে তার পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা এবং জনমনে এক কলুষমুক্ত ও কল্যাণময় সমাজ গঠনের পিপাসা ও প্রয়োজনীয়তা বোধ তীব্র করে তোলা সাহিত্যের মৌল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শানুসারী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। তারা সাহিত্যে যৌনতা ও অশ্লীলতার উল্লেখ করবেন কি করবেন না আর তার উল্লেখ যদি অপরিহার্যই অনুভূত হয়, তা হলে তা কিভাবে, কতটা এবং তাতে.কোন সব সীমা রক্ষা করতে হবে, এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

বস্তুনিষ্ট সাহিত্য রচয়িতাবৃন্দ পাপানুষ্ঠানাদির যথাযথ উল্লেখকেই বাস্তবতাবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য মনে করেন এবং এই ধারণার ভিত্তিতে সাহিত্যে অশ্লীলতা ও নগ্নতার সয়লাব প্রবাহিত করার আদর্শকে একটি আন্দোলনের রূপদান করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, পাপের প্রচ্ছন্ন ও আসল রূপটিকে নগ্ন করে সম্মুখে উপস্থাপন করা না হলে জনগণ সে বিষয়ে অবহিত হতে পারবে না এবং তা দূর করারও প্রয়োজন বোধ তীব্র হয়ে জাগবেনা তাদের মনে।

বাহ্যত এ যুক্তিকে অকাট্যই মনে হবে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, এরূপ যুক্তি দাঁড় করানো পাপানুষ্ঠানের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণারই ফসল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পাপানুষ্ঠান কোন প্রচ্ছন্ন ও অদৃষ্টিগোচর ব্যাপার নয়। সেদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষনের মাধ্যমে তার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়াদিকে প্রতিভাত করে তোলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। তার যথাযথ রূপায়ন ও বিস্তারিত বর্ণনা শুধু অবান্তরই নয়, মারাত্মক ধরনের দৃষ্টিকটুও বটে। তা এতই বিদিত ও সর্বজন পরিচিত যে, তাকে সাহিত্যের রঙীন পরিচ্ছদে মুড়ে চাক্‌চিক্যময়, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে তোলা মূল উদ্দেশ্যের পক্ষে মারাত্মকই হয়ে দেখা দিতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবে। ইসলামী আদর্শবাদের দৃষ্টিতে বলা যায়, এ ধরনের বিষয়ের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। 'মল'কে 'ময়লা' বললে তা বুঝতে কারোর একবিন্দু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তাকে যখন সোনার চামচে তুলে এনে সবার সম্মুখে পেশ করার চেষ্টা করা হয়, তখন তা শালীনতার সীমা লংঘন করে যায়। যৌনতা ও অশ্লীলতার প্রতি শুধুমাত্র ইঙ্গিত করা হলে সমজদার পাঠকের পক্ষে তা সহজেই বোধগম্য হতে পারে। অতএব, পাপানুষ্ঠানের পূর্ণ দৃশ্যের ছবি অঙ্কিত না হলে সাহিত্যের বাস্তবতা রক্ষা পায়না কিংবা বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে, এরূপ বলা দৃষ্টিসংকীর্ণতারই পরিচায়ক অথবা রচয়িতার পংকিল হৃদয়াবেগের উদঘাটক মাত্র।

উপরন্তু এরূপ তথাকথিত বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের চর্চায় হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এর প্রভাবে চতুর্দিকে পাপানুষ্ঠানেরই প্রাবল্য ও ব্যাপকতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ানোর কথা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেননা। আর তার পরিণতি সমাজ-মানসে, বিশেষ করে যুব চরিত্রের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়েনা। তাছাড়া পাপানুষ্ঠানের রসালো চর্চা যে পাপ-স্পৃহাকে অনেকাংশে চরিতার্থ করে তা-ও অস্বীকার করার উপায় নেই।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়ত বাস্তবতার সফল ও পুংখানুপুংখ চিত্রায়নের জন্যে তার গভীর ও সূক্ষ্ম অধ্যয়ন একান্ত জরুরী—তা সমাজের কোন সৌন্দর্যমণ্ডিত বাস্তবতা হোক, কি কলংকলিপ্ত। সাহিত্যিক যখন তার রচনায় পাপানুষ্ঠানের পুংখানুপুংখ চিত্রায়নের নীতি অবলম্বন করবেন এবং তার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা-বিশ্লেষণে দক্ষতা প্রমাণে উদ্যোগী হবেন, তখন তার জন্যে অবশ্যই পাপিষ্ঠ ও দুরাচারী লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং যে সব পথে সাধারণত এই সব ঘটনা ও কার্যকলাপ সংঘটিত হয়ে থাকে সেই সব পথের—পথের প্রতিটি বাঁক ও কোণের সাথে নিবিড় পরিচিতি অর্জন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। অন্যথায় তাঁর এ চেষ্টা সফল হবেনা—তাঁর বাসনা পূর্ণ পরিণত হতে পারবেনা। কিন্তু কোন সচেতন, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী সাহিত্যিকই কি নিজেকে সেই পথের পথিক বানাতে প্রস্তুত হতে পারেন?

পাপানুষ্ঠানের প্রকৃত রস আস্বাদন কেবল তখনই সম্ভব, যখন পাপ-পংকে আকণ্ঠ অবগাহন লাভ কারোর পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটির ভয়াবহতা সীমিত বা নিঃশেষিত নয়, বরং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যিকের নিজের মন-মানসিকতা ও চরিত্র সে প্রভাবকে কখনই এড়িয়ে যেতে পারবেনা। ফলে এর পরিণতি তার নিজের জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা কল্পনা করাও হয়ত তার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিতে অন্যায় ও পাপের প্রতি ঘৃণা এবং ভালো ও কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ বোধ স্বভাবতই বিদ্যমান। স্পষ্টত বুঝা যায়, মানুষকে বিচ্যুতি, পদস্খলন ও চরিত্রহীনতার পংকিল আবর্ত থেকে রক্ষা করার এবং উন্নত মানবিক পবিত্রতা ও সদাচরণের পথে পরিচালিত করার জন্যে বিশ্বস্রষ্টার এ এক মহাকল্যাণময় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যতদিন সুস্থ ও কার্যকর থাকবে, মানুষ ততদিন নৈতিকতার উচ্চতর মানের প্রতি দ্রুতগতিতে ও ক্রমাগতভাবে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে থাকবে। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থায় যখনই বিকলত্ব বা বিপর্যয় দেখা দেবে, তখন তার নৈতিকতা ও মানবিকতায় ঠিক ততটাই বির্পযয় দেখা দেয়া অবধারিত। বস্তুত এ এমন এক মহাসত্য যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এর যৌক্তিকতা বোঝাবার জন্যে খুব বেশী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও অপ্রয়োজনীয়।

দুর্গন্ধময় পরিবেশে ক্রমাগত বসবাস কিংবা তার মধ্য দিয়ে বার বার যাতায়াতের ফলে ব্যক্তির মনে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ভাবধারা দুর্বল হয়ে পড়ে অতি স্বভাবিকভাবেই। প্রথম দিক দিয়ে তা যতটা দুঃসহ মনে হতো, শেষের দিকে তা-ই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে পাপানুষ্ঠানের আনুপূর্বিক বর্ণনা-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কনের ফলেও মানুষের চারিত্রিক অনুভূতি ও নৈতিক সৌন্দর্যচেতনা ভোতা হয়ে যায়। অতঃপর পাপের প্রতি তার মনে কোন ঘৃণাবোধ থাকে না, জাগেনা ভালো ও মঙ্গলের প্রতি কোন আগ্রহ-ঔৎসুক্য আর চরম অবস্থা দেখা দেয় তখন যখন

www.amarboi.org

তার দৃষ্টিতে পাপ আর পাপ থাকে না। পাপকে পাপ মনে না করার মানসিক অবস্থা রোগকে রোগ মনে না করা কিংবা মারাত্মক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা—তাকে সুস্বাস্থ্যের নিয়ামক মনে করা একই ধরনের ও সমান মাত্রার মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতির এ ভয়াবহতা যে কতখানি সাংঘাতিক, তা ভাষায় বর্ণনা করাও কঠিন। প্রতিটি সচেতন মানুষেরই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করা কর্তব্য।

বস্তুত এরূপ সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ মানুষের আদর্শিক লক্ষ্যের পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। জনগণ খারাপকে খারাপ এবং অন্যায়কে অন্যায় ভাবুক এবং তার মূলোৎপাটনে দায়িত্ববোধ সহকারে তৎপর হোক, সাহিত্যিক মাত্রেরই তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রকৃত কল্যাণ অত্যন্ত প্রবল—অতীব প্রভাবশালী হোক, তা সকলেরই কাম্য। কিন্তু সেজন্য যে দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই কামনা ও বাসনাকে সফল করতে পারে না। সেজন্যে কেবলমাত্র সে দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় যা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। যাতে তা ব্যাহত বা ক্ষুণ্ন হয়, তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা উচিত হতে পারে না।

এই মৌলনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমাদের সম্মুখে এ মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজ ও পাপানুষ্ঠানে কিছুটা আনন্দ ও তৃপ্তির সংমিশ্রণ থাকে। ফলে তার অবিকল চিত্র অঙ্কনে শুধু মুখে বা কাগজের ওপর তার উল্লেখের মধ্যেই সেই আনন্দ ও তৃপ্তি সীমিত থাকে না, তার চিত্রায়ণকারী সাহিত্যিক বা শিল্পীও তার প্রভাব বলয়ে জড়িয়ে পড়ে।[১] বাস্তবভাবে সে আনন্দ আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ হওয়া একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে যুব সমাজ তার প্রত্যক্ষ প্রভাবকে কিছুতেই এড়াতে পারে না। তার অনিবার্য ফল এই দাঁড়াবে যে, মূল লক্ষ্য তো অন্তরালে পড়ে থাকবে সেদিকে কারোরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না; বরং যে উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তা-ই সে উদ্দেশ্যের ওপর আঘাত হানবে ও তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেবে। তা সত্ত্বেও বাস্তবতার নামে এহেন বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই সুস্থ বুদ্ধি-বিবেকের পরিচায়ক নয়।

তবু একটি প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়। সাহিত্যিককে মানবীয় জীবনের সমস্যাদি নিয়েই লেখনী চালনা করতে হয় আর তা করতে গেলে মানব জীবনের অপরিহার্য দিক হিসেবে অন্যায় ও পাপানুষ্ঠানেরও উল্লেখ করতে হয়। এরূপ অবস্থায় কোন্ বর্ণনাভঙ্গি ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে?

---

১. সাতিহ্যকে বাস্তবধর্মী করার অজুহাতে আমাদের এদেশেরই কোন কোন কবি-সাহিত্যিকের পতিতালয়ে যাতায়াতের ঘটনা কোন গোপন ব্যাপার নয়। ফরাসী দার্শনিক আগস্ট কোঁতে তো দর্শনের মাহাত্ম্য(?) বুঝানোর নামে পতিতালয়েই পড়ে থাকতেন। এ ধরনের কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকরা যে মানবতার জন্যে কতখানি বিপজ্জনক, তা সহজেই অনুমেয়।—সম্পাদক

www.amarboi.org

প্রশ্নটি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবে তা নিশ্চয়ই এমন নয়, যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানব জীবনের সর্বপ্রকার বাস্তব সমস্যার ন্যায় এই সমস্যাটিরও সঠিক ও যথার্থ সমাধান কুরআন মজীদ থেকেই আমরা পেতে পারি। কুরআন মজীদ এই ধরনের ব্যাপারে সব সময়ই ইশারা-ইঙ্গিতকেই আদর্শিক ভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেছে; কোন ক্ষেত্রেই খুঁটিনাটির বর্ণনা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি। যে সাহিত্যিকই কুরআনী প্রকাশ-ভঙ্গি ও বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করবেন, সঠিক ও নির্ভুল পথ তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে; তার ফলে তিনি একটি কলংকমুক্ত পথ ও ভঙ্গি গ্রহণ প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনে সক্ষম হবেন। বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্ট করে তোলার মানসে কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছে, যা প্রত্যেক চিন্তাশীল সাহিত্যিকের জন্যেই যথেষ্ট হতে পারে। আরবী ভাষায় নারী-পুরুষের যৌনমিলনকে বোঝাবার জন্যে অসংখ্য শব্দ রয়েছে। কিন্তু কুরআন সে-সবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যবহার করেছে এমন একটি শব্দ যার অর্থ 'স্পর্শ করা'। অপর এক স্থানে এই বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে আবৃত বা আচ্ছন্ন করা শব্দ দ্বারা। স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়ার কথা বলেও এই ব্যাপারটিই বুঝানো হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সূরা ইউসুফ-এর একটি অংশে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা এক নারীর যৌন আকাংক্ষার তীব্রতা বোঝাবার জন্যে এই বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বিত হয়েছে ঃ "ইউসুফ যে মহিলার ঘরে অবস্থান করছিল সে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করল। একদিন সে দরোজা বন্ধ করে বলল ঃ এস, এটাই তোমার জন্যে একটা মস্ত সুযোগ। ইউসুফ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠল ঃ খোদা-ই আমার সহায়। তিনিই আমাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আর জালিম কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না। মহিলাটি পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেছিল। ইউসুফও সংকল্প করে বসতো যদি সে তার খোদার অকাট্য দলীল প্রত্যক্ষ না করত। ঘটনাটির অবস্থা এ রূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে, পাপ ও অন্যায়কে তার থেকে দূর করাই ছিল আমাদের ইচ্ছা। মূলত সে আমাদের বাছাই-করা বান্দাহদের মধ্যকার একজন। শেষপর্যন্ত উভয়ই অগ্রে-পশ্চাতে দরোজার দিকে ধাবিত হল। মহিলাটি পিছন দিক থেকে ইউসুফের জামা দীর্ণ করে দিল.....।" (২৩-২৫ আয়াত)

সমস্ত ঘটনাটি যে অতীব সূক্ষ্ম ইশারা ও ইঙ্গিতময় ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, তা সহজেই লক্ষ্যণীয়। মূলত এসব ব্যাপারের উল্লেখ সাধারণত আগুনে তেল ঢালার মতই আবেগপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন অতীব সংযত ভঙ্গি অবলম্বন করে সে আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঘটনাটিকে সর্বপ্রকার ক্ষতিমুক্ত করে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এই অস্পষ্টতা ও ইঙ্গিতময়তা সত্ত্বেও মূল বক্তব্য অনুধাবন কিছুমাত্র ব্যাহত বা বিঘ্নিত হয়নি।

www.amarboi.org

এই প্রেক্ষিতে সহজেই বলা যায়, আদর্শিক লক্ষ্যাভিসারী লেখক-সাহিত্যিকগণ নিজেদের লেখনীকে ময়লা সজ্জায়নের কাজে ব্যবহার না করে কুরআনী বর্ণনা-ভঙ্গির অনুসরণ করলে মানবীয় লক্ষ্যের মহান মর্যাদা সংরক্ষিত হতে পারে। সেই সাথে মহান আল্লাহ্‌র দেয়া লেখনী শক্তিকে তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করে তাঁর নিকট শেষদিনের জবাবদিহি থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারা সম্ভব হতে পারে।

বস্তুত আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চাতের নগ্ন সভ্যতা ও প্রাচ্যের পৌত্তলিক সভ্যতার কলংকময় ভঙ্গি থেকে রক্ষা করার এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম মানের সাহিত্যিক আদর্শ। এ আদর্শ আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ এড়িয়ে যাবেন বা এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবেন কোন কারণে—কোন্ যুক্তিতে?

বস্তুত এ আদর্শ গ্রহণের সাথে সাথে সাহিত্যিকের আদর্শগত মানও হয় উন্নত। তখন তাঁর দৃষ্টিতে 'সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে' যেমন মিথ্যা, তেমনি 'সাহিত্য জীবনের জন্যে' মতটিও সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এসময়ে তাঁর মনে যে প্রশ্ন প্রবল হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে, 'সাহিত্য জীবনের জন্যে' বুঝলাম; কিন্তু জীবন কিসের জন্যে? জীবনের লক্ষ্য কি?.....শুধু বেঁচে থাকার তো কোন অর্থ হয় না। কল্যাণময় জীবন যাপনেরই বা সার্থকতা কোথায়? উদ্দেশ্যবাদ তো কোন একটি পর্যায়ে এসে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না। লক্ষ্যেরও লক্ষ্য থাকে—উদ্দেশ্যেরও থাকে একটা চরম ও পরম উদ্দেশ্য। তাছাড়া কল্যাণময় জীবনে কল্যাণ কিসে—কিসে অকল্যাণ? আর তা নির্ধারণেরই বা মানদণ্ড কি?

এইসব প্রশ্নের জবাবে তাঁকে স্বীকারই করতে হয়, জীবন প্রণোদিত হবে পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। যে জীবন-ধারায় তাঁর সন্তুষ্টি, তাতেই নিহিত জীবনের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ। তাঁরই অফুরন্ত রহমত লাভ জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য। নিছক বেঁচে থাকার যে জীবন, তাতে জীবমাত্রেই একাকার আর কল্যাণময় ও সুসমৃদ্ধ জীবনও জীবমাত্রেরই কাম্য। কিন্তু মানুষ তো জীবমাত্র নয়। জীবেরও উর্ধ্বে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। তাই পরম লক্ষ্য ও চরম উদ্দেশ্য হিসেবে তাকে ঘোষণা করতে হয় কুরআনের ভাষায় ঃ

> "আমার নামায, আমার ইবাদত-বন্দেগী—আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই নিবেদিত সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব দানকারী—লালন-পালনকারী মালিক ও মনিব। তাঁর শরীক কেউ নেই। (তাঁকে এভাবে গ্রহণ করার এবং এতেই সমর্পিত হওয়ার জন্যে) আমি আদিষ্ট। এতএব, সবার আগে আমি নিজেই আত্মসমর্পিত হচ্ছি।" (আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

এই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যিকের জন্যে একটা বৃত্ত রচিত হয় স্বাভাবিকভাবে এবং সাহিত্যিক সেই বৃত্তের মধ্যে থেকেই চালান জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধনা। এই

www.amarboi.org

সাধনার ফলে যে সাহিত্য রচিত হয়, তা-ই হয় সার্থক ও শাশ্বত সাহিত্য। এ সাহিত্যের আবেদন একান্তই মানবিক। বস্তুত এই সাহিত্যই মানব জীবনে নিয়ে আসতে পারে অফুরন্ত কল্যাণ। বাস্তবতাবাদী সাহিত্য কিংবা সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে এইরূপ সাহিত্যই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

www.amarboi.org

সংস্কৃতি

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সংস্কৃতির গোড়ার কথা

জীবনের কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রে মানুষের অস্তিত্ব এক ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সদৃশ মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও সামাজিক উত্তরাধিকারের পার্থক্যের দৃষ্টিতে বহুতর মহাসমুদ্রের ব্যাপকতা ও বিশালতা রয়েছে মানুষের সত্তায়। মানুষ শুধু নিজের আকার-আকৃতি ও সামাজিক উত্তরাধিকারের বৈচিত্র্যেরই প্রতীক নয়, বরং ভাষা-সাহিত্য, বিশ্বাস-প্রত্যয়, চিন্তা-পদ্ধতি ও জ্ঞান-বুদ্ধির রকমারি শাখা-প্রশাখারও প্রতিচ্ছবি এই মানুষ। স্পষ্টত মনে হয়, এ বৈচিত্র ও বিভিন্নতাই মাটি-পানির এই জগতের সৌন্দর্য-শোভা। জীবনের স্থিতি ও দৃঢ়তা এ বৈচিত্র্যেরই ফসল।

মানুষের সমাজ-জীবনে ইতিহাস-পূর্বকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে বিকাশমান পর্যায়সমূহকে অতিক্রম করে এসেছে, তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের নিকটই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আজও তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি মানুষের সামনে; বরং অস্পষ্টতার এক ছায়াঘন আবরণ তাকে আচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি, তা শুধু আন্দাজ-অনুমান বই আর কিছু নয়।

মানুষ এক বিশেষ ধরনের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। সে পরিবেশ বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। জন্ম মুহূর্ত থেকেই নানারূপ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও মিষ্টি-মধুর ভাষা তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; তার চোখ দেখতে পায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি এবং অসংখ্য সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা। সে প্রতি মুহূর্তই এ পরিবেশ থেকে প্রেরণা লাভ করছে, প্রভাব মেনে নিচ্ছে, প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং অবচেতনভাবে তার ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও মন-মানস এক বিশেষ ধরনের ছাঁচে ঢেলে গঠিত হচ্ছে। পরিবেশ থেকে গৃহীত এসব প্রভাব তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং উত্তরাধিকারলব্ধ প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে তাকে এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিসত্তায় পরিবর্তিত ও পরিণত করে দেয়। পরিভাষায় একেই বলা হয় সংস্কৃতিবান তথা সভ্য মানুষ (Cultured man)।

মানবতার বিরাট মর্যাদাপূর্ণ প্রাসাদ অবশ্য পাশবিকতার ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ নিম্নশ্রেণীর পাশবিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করে উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানে ভূষিত হয়। কেননা বিশ্বস্রষ্টা তাকে বিবেক-বুদ্ধি এবং মন-মানস দিয়ে ধন্য করেছেন। যদিও মানুষের বুদ্ধি-বিবেক (Reason) ও মননশক্তি (mind)

www.amarboi.org

খোদার বিশেষ দান, না মানুষ নিজেরই চেষ্টা-শ্রম ও সাধনার ফলে তা অর্জন করে নিয়েছে, এ বিষয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে; কিন্তু সে বিতর্ক বাদ দিলেও আমাদের একথা অনস্বীকার্য সত্য।

মানুষ সম্পর্কে দুনিয়ার নানা চিন্তাবিদ নানা মত প্রকাশ করেছেন। ডারউইন (Darwin) তার ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীবতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মানুষ সাধারণ পর্যায়েরই একটি জীব বিশেষ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, হজম-রীতি এবং রক্তের প্রবাহও জীব-জন্তুর এসব দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কি জন্ম-মুহূর্তে মানুষ জীব-জন্তুর মতোই বাক্‌শক্তিহীন হয়ে থাকে। উত্তরকালে দীর্ঘ সময়-কাল অতিক্রম করার পর তার পরিবেশ থেকে সে বাকশক্তি অর্জন করে। ডারউইন তার বক্তব্য বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে একটি আরণ্যক মেয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মেয়েটিকে ১৭৩১ সনে ফ্রান্সের ক্যালন (CHALON) নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা বলার পরিবর্তে শুধু চীৎকার করতো। ১৯৫৬ সনে মধ্য-ভারতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। রামু নামে নেকড়ের একটি বাচ্চা (Ramu the Wolf boy) জঙ্গলে পাওয়া যায়। সেটি ঘাস খেতো এবং জন্তুর মতোই খুব জোরে চীৎকার করতো। বাচ্চাটিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখে তার পশুসুলভ আদত-অভ্যাসের গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে মানবীয় আদত-অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হলনা। বস্তুত সব জীব-জন্তুই আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরস্পর সদৃশ্য। অতএব বুদ্ধি-বিবেক, মন-মানস, চিন্তাশক্তি সবই ক্রমবিকাশের ফসল আর তা নিছক শ্রমলব্ধ ও অর্জিত গুণ-বিশেষ।

কিন্তু ডিকার্টে (Descartes) এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মানুষের মন ও মনন আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অবদান। এ শক্তি আল্লাহ তা'আলা কেবল মানুষকেই দিয়েছেন; সৃষ্টির মাঝে এ গুণ তিনি আর কাউকেই দেননি। তবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাকে অধিক তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে তোলা যেতে পারে; তাকে উত্তম পন্থায় প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের মন সম্পর্কে চিন্তাবিদ মিল (Mill)-এর অভিমত হল এই যে, তার চিন্তা, গবেষণা ও অনুভূতি অত্যন্ত জটিল এবং ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মোটকথা, এদের মতে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, মানুষের—সে পুরুষই হোক কি নারী—বুদ্ধি-বিবেক ও মন-মানসই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার বিশেষ সম্পদ। এর বদৌলতে মানুষ যেমন দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক, তেমনি সে বিশিষ্ট ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য ডারউইন এ বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)-র বিশেষত্বই হল এই যে, তা জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেই কাজ করে। জীব-জন্তুর মধ্যে চেতনা তেমন উন্নত ও উৎকর্ষলব্ধ নয়, অথচ মানুষের চেতনা দীর্ঘকাল যাবতই উন্নতমানের রয়েছে। মানুষের মগজ (Cerebral cortex) নিত্য-নব অভিজ্ঞতা ও

www.amarboi.org

আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর সাথে ওতপ্রোত জড়িত রয়েছে বহুকাল থেকেই; যদিও তার স্নায়ুবিক পদ্ধতি (Nervous system) শুরুতেই নির্ভুলভাবে পৃথককরণ এবং স্মরণ রাখার ব্যাপারে এতো তীক্ষ্ণ শক্তির অধিকারী ছিলনা। এ থেকে ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দেহ-কেন্দ্রিক হওয়ার বদলে মন-কেন্দ্রিক হওয়ার দিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র, বই-পুস্তক, সাহিত্য, চিত্রকলা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, সুন্দর-সুরম্য প্রাসাদ, সুনীতি ও সুষ্ঠুতা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, এই পর্যায়ের সব প্রতিষ্ঠানাদি এবং আধুনিক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছুই মানব মনের চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-প্রতিভারই বিস্ময়কর ফসল। এগুলো মানুষ নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও অভ্যাস-অনুশীলনের সাহায্যে বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। মানুষের নতুন বংশধরেরা এ উত্তরাধিকারকে, যার নাম সংস্কৃতি, হারাতেও পারে, এর সমৃদ্ধি সাধনও করতে পারে—পারে ভালোভাবে এর সংরক্ষণ করতে।

একেবারে প্রাথমিক কালের অবস্থা লক্ষ্য করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সেদিন নিজের পরিবেশে যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত করে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছিল—পরিবেশের সাথে স্থাপন করে নিয়েছিল পূর্ণ সামঞ্জস্য। চক্‌মকির ব্যবহার, গুহা-প্রাচীরের গায়ে (স্পেন ও ফ্রান্সে) চিত্র অঙ্কন ও পাথরের অস্ত্র মানব সমাজে শত-সহস্র বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে পশু শিকার-নির্ভর এ আরণ্যক জীবন পরিহার করে মানুষ স্থিতিশীল সামাজিক জীবন যাপন শুরু করে।

মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা ও মননশীলতায় যতোই উৎকর্ষ দেখা দিল, মানুষ ততোই আদিম ও আরণ্যক জীবন থেকে দূরে সরে গেল। কিন্তু এসব হল কিভাবে? এ পর্যায়ে কেবল ধারণা-অনুমানই করা চলে, কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ-নির্ভর জ্ঞান লাভ করা যায়না।

অবশ্য ক্ষেতে ফসল বোনা, ফসল আহরণ, সূতা কাটা, কাপড় বোনা এবং তামা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যকে ব্যবহারাধীন করে নেয়ার খবর পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লেখার পদ্ধতি চালু হয়। এর ফলে মানব জীবনে এক মহাবিপ্লব সূচিত হয়। এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমবিকাশমান সংস্কৃতি এরই মাধ্যমে সভ্যতায় পরিণত হয়। আরো পরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামরিক কার্যক্রমের সাহায্যে তাকে ব্যাপকতর ও সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

আবিষ্কার-উদ্ভাবনীকে এক আকস্মিক ব্যাপারই বলা যায় আর তা হচ্ছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ফসল। তা যখন লোকদের নিকট সমাদৃত হয়, তখন তা-ই সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে; সমাজ-মানুষের চিন্তায়-মননে এবং আদত-অভ্যাসে তার গভীর প্রতিফলন ঘটে। চিন্তা করা যেতে পারে, মানুষ আজ যদি

www.amarboi.org

আগুনের ব্যবহার না জানত, কথা বলতে না পারত, খাদ্য ও পোশাকের কোন ব্যবস্থা না হতো, তাহলে মানুষের জীবন কি গভীর শূন্যতায় ভরে যেত না? এ দুনিয়ায় যত ব্যক্তিসত্তাই জন্ম নেয়, তারা প্রত্যেকেই নিজকে এক বিশেষ প্রাকৃতিক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে নেয় আর এ ছাঁচের গড়নেও দীর্ঘকালের সাধনার প্রয়োজন। তার অভ্যাস, প্রবণতা, মনোভাব, বিশ্বাস, প্রচলন প্রভৃতি সবকিছুই হয় আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর মাধ্যম। এটা না হলে ব্যক্তিদের অসভ্য মনে করা যেত। এজন্যে তারা বাধ্য হয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ মতাদর্শ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে; বরং বলা যায়, তার নিজের বাছাই করে কোন একটাকে গ্রহণ করার পূর্বেই এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

বস্তুত সংস্কৃতির বিকাশ ও ফলন দৈহিক বর্ধনশীলতা ও বিরাট আকৃতির সাথে অনেকটা জড়িত। পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর প্রভাব, ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যমানের আনুকূল্য, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল। দৈহিক আকৃতির তৎপরতা ও সুক্রিয়াশীলতার সাথে কথা বলার গুরুত্বও অপরিসীম। তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান, সমীক্ষণ এবং সচেতন পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এসব চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব-তথ্যের মাঝে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তা কখনো ছিন্নভিন্ন হতে পারেনা। কর্মের ওপর শব্দ তার প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রাচীনতমকালে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল হু, হ্যাঁ ইত্যাদি ধ্বনি থেকেই। আর লেখার উৎপত্তি হতে এসব ঘটনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের চিত্র অঙ্কন করতে বহু কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছিল অবশ্যই। মিশরীয় শিলালিপি, চিত্রলেখা এবং তার পরিবর্তনগুলোকে ধ্বনি-কেন্দ্রিক নিদর্শনই প্রকাশ করে থাকে। এ থেকেই বর্ণের উৎপত্তি আর এ পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শব্দ মূলতই কাজ ও কর্ম মাত্র আর তার শক্তি সর্বজনবিদিত।

সংস্কৃতির আবেগ ও উচ্ছ্বাসমূলক দিকটি শব্দের সাথে সম্পর্কিত আর বুদ্ধি ও মনন হচ্ছে কর্ম, শুধু মাধ্যমই নয়। কেননা সক্রিয় ও প্রভাবশালী চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সংস্কৃতি দানা বেঁধে ওঠে আর চিন্তা, মনোভাব, গবেষণা ও মননশীলতার সাথে শব্দের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে নাম ও শব্দের পরস্পর সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে অনুভূত হয়, যেন কোন একটা জিনিস উপস্থিত করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তা বস্তুনিচয়ের সাথে একাত্মতার সৃষ্টি করে। এভাবে এই চেতনা পর্যায়ক্রমিক বিকাশধারায় নিজের জন্যে উপযুক্ত শব্দ ও ভাষার উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে অস্তিত্ব লাভ করে এক সম্পদশালী ভাষা।

মানব সমাজে ভাষার বিভিন্নতা ও পার্থক্য কেন? তার কারণ এই যে, স্নায়ুবিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানগত ধারণা বিভিন্ন অবস্থা ও ধ্বনির সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি ও বিশেষ শব্দের পশ্চাদপটের অবস্থা ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে যে হাতিয়ার ব্যবহার

www.amarboi.org

করা যেতে পারে, তা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায়। সাধারণ উন্নতি ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণে ভাষা যে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অস্পষ্ট ও চুপচাপ কথাবার্তা চিন্তার মতোই নিঃশব্দ। যদি শব্দই না থাকে, তাহলে চিন্তা, গবেষণা ও সমীক্ষণও থাকেনা। মানুষ কেবল সজাগ থেকেই চিন্তা করে না, ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ও তার চিন্তাকর্ম অব্যাহত থাকে। প্রাচীনকালে মানুষের জন্যে এ দৃষ্টিভ্রম বা অস্পষ্টতা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতিসমূহের আকীদা বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও নীতি-পদ্ধতির সাথে তাদের স্বপ্নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ জিনিস এমন কারণসমূহের অন্যতম, যার দরুণ সভ্যতার প্রাসাদ উন্নতশির হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত সামগ্রিক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক শক্তিসমূহের শুভ সংমিশ্রনেরই অপর নাম হচ্ছে 'সংস্কৃতি'।

সংস্কৃতির মৌল উপাদন

মানুষের প্রয়োজন—তা আত্মিক হোক কি দৈহিক, রাজনৈতিক হোক কি নৈতিক, ব্যক্তিগত হোক কি সমষ্টিগত, তা সমাজবদ্ধতা ও সংস্থা-সংগঠনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক মানুষের (Man Of Nature) কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারেনা। তার প্রতিরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ, স্থানান্তর ও গতিবিধি সবই সামগ্রিক সহযোগিতামূলক কাজের ওপর নির্ভরশীল। এ সামাজিক দলবদ্ধতা এমন লোকদের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে, যারা স্থানীয়, দেশীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়েই থাকে। এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের সকলেরই মনজিল এক এবং অভিন্ন। চলার পথও সমান। এ জীবনপথে চলার ব্যাপারে তাদের আচরণও বিশেষ রীতিনীতি ও আইন-বিধানানুগ আর সেগুলোর মৌল উৎস হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান।

মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে নীতিবাদিতা, মানসিক আবেগ এবং আল্লাহ্‌র ভয় এমন কার্যকারণ, যা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের আচরণ সৃষ্টির নিমিত্ত হয়ে থাকে। সর্বসমর্থিত মূল্যমান মানুষের আচরণকে প্রভাবান্বিত করে আর তার নির্ভুল ও পূর্ণ বিন্যাস হতে পারে এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতিতে। মনের ইচ্ছা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের পারস্পরিক সংযোজন হতে পারে এসব ব্যবস্থাপনার অধীন। জাতি, সরকার, জাতীয় পতাকা ইত্যাদির পশ্চাতেও অন্তর্নিহিত থাকে জীবন্ত সংস্কৃতির মহাসত্য আর নতুন বংশধরদের মাঝে তার মোটামুটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জৈবজীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে।

ক্রমবিকাশমূলক চিন্তায় বিশ্বাসী লোকদের মতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত (Sponteneous) পরিবর্তন ধারার পরিণতি। তা সুসংবদ্ধ মৌল

www.amarboi.org

নীতিসমূহের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। তাকে একটির পর একটি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। অগ্নির অস্তিত্ব লাভ, তৈজসপত্র নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং তার বিভিন্ন 'ডিজাইন', 'প্যাটার্ন' ও অর্থনৈতিক উন্নতি একথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

এসব পর্যায় ও স্তরের পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণশীলতার (Diffusion) সূচনা কি করে হল, কি করে ও কিভাবে তা ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হল এবং তার কোথায় কোথায় ও কতখানি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সন্ধানের ওপর ঐতিহাসিক চিন্তাবাদের ভিত্তি সংস্থাপিত। সংস্কৃতিকে এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। এজন্যে গোত্র-ভিত্তিক জীবন-ধারা, ধর্মীয় সংঘবদ্ধতা, বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতি, সামাজিক মূল্যমান ও সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাকার বিশেষত্বকে সামনে রেখেই সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হয়। এ সবের বিস্তার যে একই নিয়মে সংঘটিত হতে পারেনি, তা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের বিশেষত্ব পাওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরের তথা বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাবও তার ওপর প্রতিফলিত হতে পারে। মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনাবলী পরিপূরণে আদত-অভ্যাসের বৈচিত্রও বিশেষ ধরনের পটভূমির অধিকারী। ছড়ি বা লাঠি অন্ধকার যুগে মাটি খোদাইর কাজে ব্যবহৃত হতো। কালের অতিক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বারা চালনা-দণ্ডের কাজও করা হয়েছে। উত্তরকালে তা আবার ভ্রমন-ছড়ি রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে এই ছড়িই উচ্চতর মান-মর্যাদার নিদর্শন। আবার শিক্ষাঙ্গনে তা দৈহিক পীড়নের উপকরণ। এককথায় ছড়ির সঙ্গে যেসব ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাস জড়িত, তা সমাজে প্রচলিত মূল্যমান দ্বারা প্রভাবিত। সোরাহীকে এক কালে পানির সঞ্চয় রক্ষা ও তা শীতল করার কাজে ব্যবহার করা হতো। পরিবর্তিত চিন্তা-বিশ্বাস ও ধারণা-মতবাদ তার ব্যবহারের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে সেই সোরাহীই শিল্পীর উচ্চমানের শিল্পকর্মের নিদর্শন হয়ে ড্রয়িং রুমের শো-কেসে স্থান লাভ করেছে এবং লোকদের সৌন্দর্য-পিপাসু মন-মানসের স্পৃহা চরিতার্থ করছে। নৌকার গঠন-প্রকৃতি, তার সংগঠন পরিপক্কতা এবং তাকে কর্মোপযোগী বানানোর কাজে যুগ যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হাজার রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ কৌশলে দক্ষতা নৌ-পরিচালনা বিদ্যা ও পদ্ধতি সব কিছুই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশেষে বর্তমান যুগে এসে তা একটা সর্বাত্মক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

জমির ওপর লাঙ্গল চালানো, বীজ বপন করা ও ফসল তোলা—এই সব কিছুই একটা নিয়ম ও শৃংখলার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব তৎপরতা বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশ-পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পন্থা-পদ্ধতি ও হাতিয়ার অবলম্বন করেছে। এভাবে মানবীয় প্রয়োজন যথার্থভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করার একটা বিশেষ ভঙ্গি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এগুলোর পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও সংযোজন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (Traits)

www.amarboi.org

পরিণতি নয়; বরং তা সে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের (Institutions) অবদান যেসব সংস্থা নিজেদের সুসংবদ্ধ ও সুসংহত চেষ্টা-প্রচেষ্টার দরুন এ পর্যায়গুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। একটি জিনিসের ব্যবহারের সাংস্কৃতিক পটভূমি (Cultural Context), চিন্তা-ভাবনা, প্রচলন এবং আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা (Attachment) অনিবার্য—তা কোন ব্যক্তির দ্বারাই ব্যবহৃত হোক, কি কোন সমাজ সমষ্টি কর্তৃক। ছড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, তার ওপর নানা রূপ নকশা অংকন ও চাক্‌চিক্য বৃদ্ধিতে একটি সাংস্কৃতিক, আনুষ্ঠানিক, ঐতিহ্যিক ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততা বলিষ্ঠভাবে বর্তমান আর তা-ই তার মৌলিক ব্যবহারের ওপর পরিব্যাপ্ত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের তৎপরতাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কাজে ব্যবহার করে থাকে আর এই উদ্দেশ্য লাভের জন্যেই সে সব সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তাতে জীবন-জীবিকা, বংশানুক্রম, প্রতিরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকার গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে ধনসম্পদ বিনিয়োগ, উপায়-উপকরণের ব্যবহার, হাট-বাজার, যোগাযোগ ও নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি গড়ে ওঠে আর নিত্যকার ব্যস্ততার মধ্যে মাছ-ধরা, বাগান রচনা, পশু পালন, বন্য পশু শিকার ও চাষাবাদ এর মধ্যে শামিল। এসবের সাহায্যেই আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

পরিবার সংস্থা

বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে একটি পারিবারিক বা ঘরোয়া পরিবেষ্টনীর একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিবেষ্টনী একটি সংক্ষিপ্ত একক (Unit)। আইনগত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বংশানুক্রমিক মূল্যমানের (values) ওপর এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ভিত্তি সংস্থাপিত। পরিবার পরিবেষ্টনী একটা ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা। প্রচার ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ওপরই নির্ভরশীল।

বিভিন্ন ভঙ্গি, প্রয়োগ পদ্ধতি, ধরন-ধারণ, দ্বীনী চিন্তা-চেতনা, নৈতিক মূল্যমান, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উত্তরাধিকার নিয়মে এক বংশ থেকে আর এক বংশে উত্তরিত হয়। এর সংরক্ষণের জন্যে নিম্নোদ্ধৃত পদক্ষেপসমূহ জরুরী ঃ

(১) ব্যভিচার বা বিবাহেতর যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ।

(২) পারিবারিক দায়িত্বসমূহের মান-সম্ভ্রম রক্ষা ও সামাজিক কর্তব্য পালন।

(৩) পারিবারিক আইন-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন।

ব্যভিচার তথা অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে একদিকে বংশগত পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, অপরদিকে গোটা সমাজ-পরিবেশে নোংরামী, পংকিলতা, নগ্নতা, নির্লজ্জতা; অশ্লীলতা

www.amarboi.org

ও পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, নরহত্যা ও রক্তপাত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। পারিবারিক ও বংশীয় একত্ব ও ঐতিহ্য চূর্ণ হয়ে বংশের ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আত্মীয়তা এবং তার মান-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন ও বিলীন হয়। যে সমাজে ব্যভিচার সমর্থন পায়, তা অনিবার্যভাবে উন্নত মানবীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। সেখানে ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবেশ জেগে ওঠে; ফলে সামাজিক উন্নতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রেমাভিসার বা কোর্টশিপ (Court Ship) প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাকনা কেন, বর্তমান যুগে ও পরিস্থিতিতে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং এখন তা নিতান্তই কাম-লিপ্সা ও যৌন-স্পৃহা চরিতার্থ করার একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও সম্ভ্রম এবং মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ব্যভিচারের এই ব্যাপকতা দৈহিক রোগ-ব্যাধির মারাত্মক প্রকোপ সৃষ্টি করেছে[১] এবং আত্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিচারে চরম অধঃপতন ঘটিয়েছে।

পারিবারিক পরিবেষ্টনীকে পবিত্র, সুশৃংখল ও নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্যে স্বামী-স্ত্রীকে নিজেদের কর্তব্য পালনে পূর্ণমাত্রায় আন্তরিক ও সদাতৎপর হতে হবে। নরনারীর দায়িত্বহীন সম্পর্ক সমাজে নানারূপ জটিল নৈতিক, মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে দায়িত্বানুভূতি তিক্ত ও বিষাক্ত মুহূর্তগুলিতে উৎকট মানসিক অবস্থা বিদূরণে সফল সঞ্জীবনীর কাজ করে। এর অনুপস্থিতি জীবনকে একটা স্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য বা ভুল বোঝাবুঝি অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ, মনোমালিন্য ও ঝগড়া-ঝাটি নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে তার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানমূলক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের উপস্থিতি অপরিহার্য। তার সুষ্ঠু প্রয়োগে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ কার্যকরভাবে রোধ করা এবং পরিবারের লোকদের মধ্যে পূর্ণ মিলমিশ ও মতৈক্য অক্ষুণ্ন রাখা ও কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি হতে না দেয়া সম্ভবপর। লোকদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টামূলক ভাবধাবা জাগিয়ে রাখা একান্তই জরুরী আর তা সম্ভবপর কেবল তখন, যখন ব্যক্তিগণ সামষ্টিক স্বার্থের তাগিদে ব্যক্তিগত স্বার্থ কুরবানী দিতে প্রস্তুত হবে—যখন সামাজিক নিয়মবিধির প্রতি সদাজাগ্রত থাকবে অবিচল সম্ভ্রমবোধ।

১. পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদার ও যৌন-শিথিল সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য একদিকে পরিবার-ব্যবস্থাকে প্রায় অকার্যকর করে দিয়েছে অপরদিকে এইড্স্ (AIDS)-এর ন্যায় ভয়াবহ যৌন-ব্যাধি মানব জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এ কারণে সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন এইড্স্-এর প্রতিরোধের জন্যে পরিবার ব্যবস্থার সুরক্ষা ও যৌন পবিত্রতা সংরক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন।—সম্পাদক।

www.amarboi.org

মূল্যমানের (Values) যথার্থ প্রয়োগ একটি প্রাত্যহিক প্রয়োজন আর সম্মিলিত সামাজিক ব্যতিব্যস্ততা ও আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সাহায্যে লোকদের মধ্যে সভ্যতা-ভব্যতা, শালীনতা, সুষ্ঠুতা ও আদব-কায়দা সংরক্ষণ-প্রবণতার সৃষ্টি করতে হবে। এমনিভাবেই ঐতিহ্যের সাহায্যে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতে পারে আর এজন্যে অক্ষর বা বর্ণমালাই প্রথম অবলম্বন।

ভাষা ধ্বনি ও ভঙ্গির ধারক। সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সেখানে সুপ্রকট। প্রাচীন মানুষের মধ্যে মৌখিক বর্ণনা-ধারার সাধারণ প্রচলন ছিল। কিন্তু উন্নত সংস্কৃতিতে লেখন শিল্পকেও শামিল করা হয়েছে। এক কথায়, সংস্কৃতির উজ্জীবনে অর্থনৈতিক সংগঠন সংস্থা, আইন-বিধান ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ধর্ম-বিশ্বাস

জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে মানুষের মন-মানস তথা বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণা-শক্তি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে—লাভ করেছে সুদীর্ঘ ও সুব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি ও নিত্য-সংঘটিত ঘটনাবলী মানুষকে বিব্রত, দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। তখন সে হয়ে যায় অসহায়—নিরূপায়। তার অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে দিশা করতে পারে না, এখন তার কি করা উচিত!

মানুষ মহাসমুদ্রে চলাচল করার উদ্দেশ্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করেছে। এই জাহাজ চালানোর জন্যে সে বাতাসের গতির ওপর নির্ভরশীল থাকেনি। সে আপন শক্তি বলেই সমুদ্রের বুকে যে দিকে ইচ্ছা জাহাজ চালিয়ে দিতে সক্ষম। জাহাজের গতি ও স্থিতি পূর্ণমাত্রায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু হঠাৎ উত্থিত প্রচণ্ড ঝড় ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার সম্মুখে সে নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় তার সব শক্তিমত্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে মর্মে মর্মে অনুভব করে—স্বীকার করে। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি অত্যাধুনিক ও শত্রু হননকারী দূরপাল্লার শক্তিশালী অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়। তার নিজের বীরত্ব, সাহসিকতা ও যুদ্ধ-কৌশলের ওপর সে পুরাপুরি আস্থাবান। তার সৈন্যসংখ্যাও শত্রু পক্ষের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাকেই হতে হয় পরাজিত। কিন্তু এটা কেন? এর নির্ভুল জবাব সে সন্ধান করেও জানতে পারেনা। তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে এ ব্যাপারে কোনই সান্ত্বনা দিতে সক্ষম নয়। কৃষক ক্ষেতে-খামারে সোনালী ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা করে, নিঃশেষে শ্রম প্রয়োগ করে। হাল চালিয়ে, কোদাল মেরে মাটির বক্ষ সে বিদীর্ণ ও ওলট-পালট করে দেয়। এজন্যে নিজের দেহের রক্ত পানি করে

www.amarboi.org

দিতে, মাথার ঘাম পায় ফেলতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয়না। চেষ্টা ও শ্রমেও সে একবিন্দু ত্রুটি থাকতে দেয়না। ফলে সুন্দর শ্যামল ও সতেজ অংকুর ফুটে বের হয়, গাঢ় সবুজে মাঠ একদিক থেকে অন্যদিক ভরে যায়। সে মানোরম দৃশ্য দেখে কৃষকের চোখ জুড়িয়ে যায়, কলিজা শীতল হয়। কিন্তু সহসাই ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে মাথা তুলে উঁচু হয়ে ওঠা ফসলের চারাগুলো ঝাপটে ধরে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সবগুলো খেয়ে ফেলে। মাঠের সবুজ-শ্যামল শোভা অন্তর্হিত হয়ে পান্ডুবর্ণ ধারণ করে, গাছগুলো নিঃশেষে মরে পঁচে যায়।

অনুরূপভাবে সহসা উদ্বেলিত হয়ে আসা বন্যা-প্লাবনের স্রোতে ক্ষেতের ফসল ভেসে যায়। বৃষ্টি কম বা বেশী হলেও এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ করে দেয়। এটা দেখে কৃষক নৈরাশ্য ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। এ সময় তার মনে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার মেঘপুঞ্জ জমে ওঠে। তা দূর করার কি উপায় থাকতে পারে? এ এমন দুঃখ যা মানব জীবনের তিক্ত বাস্তব ও তার আশাব্যঞ্জক প্লান-প্রোগ্রামের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মৃত্যুর অবিচল মহাসত্য মানুষের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন, শক্তি ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। ঘটনাবলীর মৌল উপাদানসমূহের এই বিশ্লিষ্টতা এবং মৃত্যুর এই অমোঘ আক্রমন দেখে সে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়; এমনকি কখনো-সখনো হতাশায় তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগে। এই সময় একটি বিশ্বাসই তাকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেয়। তা হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তার সম্মুখে জমাটবাঁধা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা হয়ে পথ দেখায়—আশার প্রতীক হয়ে তাকে সমুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত এই বিশ্বাসই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অবস্থায় সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তাই মানুষের জীবন-ধারাকে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-বন্ধনের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা অপরিহার্য। খোদার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করে চলার মানসিক প্রস্তুতিই তার এই প্রয়োজন পূরণ করে—জীবনকে সুন্দর, সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করে তোলে। এই বিশ্বাসই তার জীবনে এনে দেয় কাংক্ষিত গতিময়তা, অপরিসীম শক্তি-সাহস। এভাবেই সংস্কৃতিতে খোদা-বিশ্বাস, অন্যকথায় ধর্মবোধ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেছে। কেননা যে জ্ঞান-বিদ্যা মানুষকে দূরদর্শীতা ও আলো দান করে, নিয়তির উপরিউক্ত জটিল আবর্তে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন এই বোধ ও বিশ্বাসই হয় তার একমাত্র অবলম্বন। তার কারণ হল, যে সব পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক-সম্বন্ধ সারা জীবন ধরে সুদৃঢ় হয়ে রয়েছে তা মানব মনে একটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে আর এই আবেগ-উচ্ছ্বাসই তাকে এসব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মানুষের এ সব প্রয়োজনের দরুনই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব স্বীকৃত। ধর্মের ভিত্তিতে সংস্কৃতি যেমন পায় দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা, তেমনি লাভ করে নতুন জীবন-প্রেরণা ও শক্তিমত্তা।

www.amarboi.org

খেলা-ধূলা ও আনন্দোৎসব

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসা বংশীয় আনুগত্যের প্রাণ-কেন্দ্র। স্থাপিত সহানুভূতি ও কল্যাণ-কামনামূলক আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বংশীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধের ওপর সংস্কৃতি-প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত। এ সবের সমন্বয়ে সৃষ্ট রকমারি ব্যস্ততা ও উৎসব-অনুষ্ঠান চিত্তবিনোদনের উৎস। লোকদের স্নায়ুবিক শ্রান্তি বিদূরণের সুসংগঠিত পন্থা হচ্ছে প্রতিদিনকার খেলা-ধূলা ও শিল্প-কলা সংক্রান্ত নৈপুণ্য ও দক্ষতা। এগুলো প্রাত্যহিক চিন্তা-ভাবনা ও ব্যতিব্যস্ততার ঝঞ্ঝাট থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের মনে এনে দেয় গভীর প্রশান্তি, স্থিতি ও চিরসতেজতা। শিশু তার কণ্ঠে ধ্বনি তুলে আপন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বংশ-পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে তার খেলা-ধূলাও হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের। অন্য কথায়, তার খেলা-ধূলায় নিত্য পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই সময়-কালেই শিশুর মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, ধীরে ধীরে চরিত্রের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ও গুণাবলীও প্রকাশ পেতে থাকে। অন্যদিকে পারস্পরিক বন্ধুতা ও ভালবাসার সম্পর্কও গড়ে ওঠতে শুরু করে অনেকের সাথে। নিজেদের মধ্যে গোপন বন্ধুতা এবং বয়স্ক সহচরদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিশালতা লাভ করে। শিশুরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাদের মেজাজ-প্রকৃতি অনেকখানি বদলে যায়। তখন সামান্য বিষয়াদি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া হয়। অভিনয় ও নৃত্যের অনুশীলন কিংবা কোন শৈল্পিক দক্ষতাজনিত ব্যস্ততা, তা সাজসজ্জামূলক অলংকরণ হোক কি চাক্‌চিক্যপূর্ণ ছবিই হোক—তাতে একটা সৃজনশীল ও চিত্তবিনোদনমূলক ভাবধারা নিহিত থাকে। এ ভাবধারা স্বভাবতঃই পূর্ণতা ও ক্রমন্নোয়নের দাবি রাখে আর এ সবের মাধ্যমে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা পরিপক্কতা ও জাতীয় চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

শিল্প সাধনা

সমগ্র সাংস্কৃতিক তৎপরতায় শিল্পসাধনা আন্তর্জাতিক ও আন্ত-বংশীয় মূল্যায়নে সর্বাগ্রগণ্য। গান-বাজনা এ সমস্ত শিল্প সাধনায় একটা বিমূর্ত ও পরিচ্ছন্ন শিল্প রূপে গণ্য। তাতে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলা-কৌশলগত ব্যাপারের বিশেষ কোন সংমিশ্রণ নেই। তাতে সুর ও তাল বা ধ্বনির উত্থান-পতনের দিকেই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। নৃত্যে এই ভাবধারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ও হাত-পা সঞ্চালনের দ্বারাই প্রকাশ পায়।

অবয়ব ও মুখাকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সুসজ্জায়নে বিভিন্ন রং-এর প্রয়োগ ও নানা রকমের নিপুণ অংকন, পোশাক-পরিচ্ছদের নানা স্টাইল, দ্রব্যাদির নানা রং ও বর্ণময় ছবি, মিনা রচনা ও কারুকার্যখচিত আলপনা ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে। ভাস্কর্য, কাঠের ওপর কারুকার্য সংক্রান্ত সমস্ত কাজে সৌন্দর্য ও রুচিশীলতাই প্রকট। কবিতা রচনা,

www.amarboi.org

কবিতা আবৃত্তি, ভাষার সচলতা ও নাটকীয় শৈল্পিক অভিব্যক্তি উন্নতমানে সম্ভবত সমান ব্যাপকতা লাভ করেনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে বিলীনও হয়ে যায়নি। এসব শিল্প-কুশলতার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য বিষয়ক রুচিশীলতা এখান থেকেই পায় প্রাণ-স্পর্শ। নানা ধরনের সুগন্ধিময় ও সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য-পানীয়ও এ পর্যায়ে গণ্য।

একজন দক্ষ শিল্পী ও কারিগর যেসব জিনিস তৈরী করে, তাতে সমাজের লোকদের বিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। একারণেই শিল্পীদের উচ্চ মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। শিল্পীর নৈপুণ্যের দরুন এসব দ্রব্যের অর্থনৈতিক মূল্যমানও বৃদ্ধি পায়। সৌন্দর্য-স্পৃহা ও রুচিশীলতার চরিতার্থতা বিধানের দরুন সামাজিক সন্তোষ ও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জিত হয় এবং ক্রমশ এসব দ্রব্য জনগণের সৌন্দর্যবোধ এবং অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলী মানদণ্ড প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। দুর্লভ কারুকার্যখচিত শাল, কার্পেট, কম্বল, চাটাই ও পিতল নির্মিত তৈজসপত্র ও মিনা-করা থালা-বাসনও এর মধ্যে শামিল।

ধর্ম-বোধ ও শিল্প-কলা

অতি-প্রাকৃতিক (Super natural) সত্তায় মানুষের রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। এ প্রত্যয় অতি সুপ্রাচীন। মূর্তি, ছবি, প্রতিমূর্তি (Statue), কারুকার্য, নকশা, সাধারণ অনুষ্ঠানাদি, মৃত্যু সম্পর্কিত কার্যাদি, কুরবানী বা বলিদান ইত্যাকার কাজগুলো তাকে এসব অতি-প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের নৈকট্য লাভে সাহায্য করে; তার হৃদয়াবেগকে উদ্বেলিত করে। মৃতের জন্য বিলাপ করা, গীত গাওয়া ও শোক-গাথা গাওয়ার ফলে লাশটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পরজগতে স্থানান্তরিত হয় বলে মনে করা হয়। প্রাচীন মিশরে মমির চতুঃপার্শে নানা রূপ আলপনা ও মাঙ্গল্য চিত্র অঙ্কন করা হতো। আর এভাবেই এক জগত থেকে অপর জগত পর্যন্তকার পথ অতিক্রম করা হতো। অন্যদিকে বড় বড় জন-সম্মেলনে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের কাজ সম্পন্ন করানো হতো। এখনো খৃস্টানদের গীর্জায় গীত গাওয়া হয়, হিন্দুদের পূজা-মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে আরতি করা হয়। শিখ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও অনুরূপ কাজই করা হয়। গান-বাজনা তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বন অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য। আর এসব শৈল্পিক দক্ষতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সমবেত হয়ে সমস্ত কাজ-কর্ম একত্রে সম্পন্ন করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অপরিহার্য। শিল্প-কলা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের আগ্রহ ও

www.amarboi.org

উৎসুক্যের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে শিল্প-কলারই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ফলে বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতির উৎকর্ষ লাভে পরোক্ষভাবে শিল্প-কলারও উৎকর্ষের একটা পথ তৈরী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উপকথা ও গল্প-উপাখ্যান, শিল্প ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ আর এই সব সাংস্কৃতিক সুসংবদ্ধতা কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে বর্তমান থাকা জরুরী।

এক কথায় সংস্কৃতি একটি অত্যন্ত কল্যাণময় সত্য ও বাস্তবতা। মানুষের প্রয়োজন পরিপূরণে তার প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সংস্কৃতি মানুষকে একটি আপেক্ষিক ও দৈহিক বিস্তৃতি ও বিশালতা দান করে। তার ফলে ব্যক্তিসত্তা লাভ করে সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার অনুভূতি। পরন্তু ব্যক্তিত্বের সে বিস্তৃতিতে রয়েছে গতিময়তা। তা মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে যখন তার অন্তঃসারশূন্য ও রিক্ত দেহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

সংস্কৃতি মানুষের সামষ্টিক সৃষ্টি। তা ব্যক্তি মানুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মশক্তি ব্যাপকতর করে দেয়; চিন্তাশক্তিকে দেয় গাম্ভীর্য ও গভীরতা, দৃষ্টিকে করে সম্প্রসারিত। দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে তার উপস্থিতি কল্পনাতীত। কেননা এই সব কিছুর উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তা ও কর্মশক্তির সমন্বয়।

এ কারণে সংস্কৃতি ব্যক্তি সত্তাকে সুসংগঠিত রূপে ঢেলে গঠন করে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে এক অন্তহীন ধারাবাহিক জীবন দান করে। মানুষের কার্যাবলীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য তার দৈহিক ও স্বভাবগত চরিত্রের কারণে ঘটে, মানুষ এ অর্থে কোন সামষ্টিক সত্তা নয়।

সংগঠন ও সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা ও অক্ষুন্নতার ফসল। তা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাবগত চরিত্রে বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। আর তা এভাবে মানুষের ওপর কেবল অনুগ্রহই বর্ষণ করেনা, তার ওপর নানাবিধ দায়িত্বও আরোপ করে এবং তাকে বহু প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর অনিবার্য পরিণতি সামষ্টিক কল্যাণ।

নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা এবং আইন ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মানুষের কর্তব্য। কর্তব্য পালন ও বলন-কথনকে একটা বিশেষ ছাচে ঢেলে গড়ে নিতে হয় তাকে। তাকে এমন সব কাজ নিষ্পন্ন করতে হয়, যার কল্যাণ লাভ করে অন্যান্য বহু লোক। পক্ষান্তরে তার নিজের জরুরী কার্যাবলী সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তাকে অনুগৃহীত হতে হয় অন্য লোকদের।

সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতা এমন সব কামনা-বাসনার সৃষ্টি করে, যে সবের চরিতার্থতা ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-চর্চা পদ্ধতি এবং সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করে।

www.amarboi.org

সংস্কৃতি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত চাহিদার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতারই ফসল। তা মানুষকে নিছক পশুর স্তর থেকে উন্নীত করে ভিন্নতর এক সত্তা দান করে। ফলে মানুষের নিতান্ত জৈবিক কামনা-বাসনা ও তার পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র ও পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

যন্ত্র নির্মাণকারী ও কর্মীসত্তা হিসেবে মানুষের প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট ঃ

একজন ব্যক্তি (Individual) হিসেবে সে এমন একটি সমাজের সদস্য, যার লোকেরা পরস্পর মিল-মিশ ও কথা-বার্তার সূত্রে পরস্পর সংযুক্ত—সম্পর্কশীল। এহেন এক সহযোগিতা-ভিত্তিক শ্রমজীবি এককের (Unit) সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের যিম্মাদার। অতীতের স্মৃতি তার মানসপটে চির-জাগ্রত। এ স্মৃতির সাথে রয়েছে তার মায়ার সম্পর্ক। কিন্তু তার সামনে রয়েছে অনাগত ভবিষ্যত। তারই ওপর নিবদ্ধ তার সমস্ত সত্তার লক্ষ্য-দৃষ্টি। এই ভবিষ্যতই তার হৃদয়-মনে আশা-আকাংক্ষার নির্মল আলো বিকীরণ করে।

শ্রমবন্টন ও ভবিতব্যের সীমাহীন সম্ভাবনা এমন সব সুযোগ মানুষের সমুখে নিয়ে আসে, যার রূপ-সৌন্দর্য, চাক্‌চিক্য ও সুর-ঝংকারে তার হৃদয়-মন পরম উল্লাসে হয় চিরনৃত্যশীল।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্যে তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই জরুরী। এ যেমন সত্য, তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।

অর্থাৎ মানব জীবন দুটি দিক সমন্বিত ঃ একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি-দাওয়া। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্ত থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় নির্লিপ্ত, তাহলে তার আত্মার দাবি পরিপূরণ ও চরিতার্থতার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তাই মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা করে। আর ধর্ম-বিশ্বাস, শিল্প-কলা, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার পিপাসা। অন্যকথায়, ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় ও আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যে সব উপায়-উপকরণ, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, ছবি অংকন, ভাস্কর্য, সাহিত্য,

www.amarboi.org

ধর্ম-বিশ্বাস; দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম এবং দর্পন। কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের জন্যে এসব তৎপরতা সংঘটিত হয় না। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। এ সব সৃজনধর্মী কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি—আনন্দ ও উৎফুল্লতা। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কাব্য ও কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার—এসবই ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের মাধ্যমেই তার মন ও আত্মা সুখ-আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। এসব মূল্যমান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ন। কিন্তু সভ্যতার রূপ এ থেকে ভিন্নতর। এখানে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা তুলনামূলক পরিচয় দেয়া যাচ্ছে ঃ

(১) বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত।

কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির চরিতার্থতার উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

(২) বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায়সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের পক্ষেই তার মূল্য ও মান হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ও সম্ভব।

কিন্তু সংস্কৃতি অদৃশ্য ধারণা ও মূল্যমান সমষ্টি; তার মূল্যায়ন অতীব দুরূহ কাজ।

(৩) সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্ত উন্নতিশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রম-বর্ধমান। তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী।

কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

(৪) সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত—বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির ওপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দী; কেবলমাত্র সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির ওপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজিত। সেই সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলমানরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।

(৫) সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃঢ়তাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয়।

কিন্তু সংস্কৃতি প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তই অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার ঝুঁকির সম্মুখীন।

www.amarboi.org

(৬) সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলীই তার লীলাক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি (সভ্যতার মহাকীর্তি) এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে চলে যেতে পারে। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হতে পারে। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতাই নেই। বাছাই-প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই অধঃস্তন বংশে উত্তরিত হয়। তা সম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই-প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর। কেবলমাত্র বিশেষ পরিমণ্ডলের লোকদের পক্ষেই তার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। দার্শনিকসুলভ চিন্তা-গবেষণা ও কবিসুলভ উচ্চমার্গতার অনুভূতি যার-তার পক্ষে আয়ত্তযোগ্য নয়।

(৭) সভ্যতা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। সেখানে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়না। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে; কিন্তু এ কার্যক্রমের ফলে তার সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব শীগ্‌গীর প্রভাবিত হতে পারেনি। উপমহাদেশের জনগণের ওপর ইংরেজের শাসনকার্যের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এখানকার সভ্যতা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি তার আসল চরিত্র বা রূপরেখা হারায়নি।

কেননা সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবন-কেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনই সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। এই জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজ-কেন্দ্রিক—আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

মোটকথা, আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি, তা-ই সংস্কৃতি। হৃদয়ানুভূতি, চিত্তবৃত্তি, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। কেননা এগুলো মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবেই বর্তমান। মানব-প্রকৃতি তার সাথে নিঃসম্পর্ক হতে পারে না কখনই। সভ্যতায় রয়েছে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলীর প্রশ্ন। মানব জীবন যদি শিল্প-কারখানা ছাড়াই অবাধে চলতে পারে, এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হতে থাকে, তাহলে তার জন্যে সামান্যতম কাতর হওয়ারও কোন প্রয়োজন বোধ হবে না কারোর।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দুটির মাঝে মূল্যমানের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। মোটরগাড়ি সভ্যতার

www.amarboi.org

উৎপাদন। সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্ত-বিনোদনমূলক কারুকাজ ও সূক্ষ্ম উপকরণাদি বৃদ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য, মহিমামণ্ডিত এবং বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে এ দুটিরই সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নির্ভুল পথে। মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা প্রকট। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করা কিছুমাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

www.amarboi.org

সংস্কৃতির সূচনা ও নানা দৃষ্টিকোণ

সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃতির সূচনা ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেশ করে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কারোর কারোর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেসব অঞ্চলে জৈবিক ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের অনটন প্রকট, সেখানে প্রয়োজনের প্রবল তাগিদে মানুষ পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার দিকে দিকে ও দেশে দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংঘটিত হয়। এর দরুন নানা সংস্কৃতির পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে আর তার ফলে একটি নবতর সংমিশ্রিত রূপের উদ্ভব হয়।

অনুরূপভাবে যে সব দেশের আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অংশ শতকরা ৭৫ ভাগ বা ততোধিক সেখানে ঝড়-ঝপ্টা ও ঝঞ্ঝা-তুফান নিত্য-নৈমিত্যিক ব্যাপার। এর দরুন সেখানকার জনজীবন কঠিনভাবে বিধ্বস্ত হয়। তাদের মন-মানসিকতার ওপর এর তীব্র প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অবধারিত। এই পরিমণ্ডলের লোকেরা বাধ্য হয়ে স্থানান্তরে গমন করে ও ভিন্নতর অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে ছুটে যায় এবং নিজেদের চেষ্টায় এমন সব স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে, যেখানে তাদের মনের আশা-আকাংক্ষা উজ্জীবিত হয়, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও বোধশক্তি পায় তীব্রতা—তীক্ষ্নতা। প্রাচীনতম কালে পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র ছিল। এশিয়ায় দজলা, ও ফোরাত নদীর উপকূল, গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর বেলাভূমি, আফ্রিকার নীল উপত্যকা, ইউরোপের টায়র উপত্যকা—যার উপকূলে রোম শহর অবস্থিত—ইত্যাদি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনুরূপভাবে আজ থেকে প্রায় পনেরো শো বছর পূর্বে মেক্সিকো (Mexico), হন্ডুরাস (Honduras) ও গুয়েতেমালায় (Guatemala) মায়েন (Mayan) সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

অতীতের মূল্যবান জাতীয় সম্পদের অবলুপ্তি, দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার এবং অবসাদ-অবজ্ঞায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলেও জাতিসমূহের রীতি-নীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল তাদের দেশসমূহের ভৌগোলিক ধরন-ধারনের কারণে। এসব দেশের নদ-নদীর বেলাভূমি এবং উপত্যকাসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। মরুচারী জীবন পদ্ধতিতে দুগ্ধ ও গোশত প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হওয়ার দরুন সেখানকার অধিবাসীরা শক্তি ও বীরত্ব

www.amarboi.org

গুণে ধন্য হয়ে থাকে আর তার ফলেই তাদের মধ্যে কঠোরতা নির্মমতা ও স্বৈরাচারমূলক ভাবধারা তীব্রতর রূপে দেখা দেয়। এ শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়ার দিকে দিকে বিজয়ী ও শাসক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বেবিলনীয়, আসিরীয়, কালদানীয় এবং দজলা ও ফোরাত অঞ্চলের সংস্কৃতিসমূহের উৎকর্ষ ও প্রসার লাভের পিছনে এই কারণই নিহিত রয়েছে। তারা মধ্য এশিয়া থেকে উত্থিত হয়ে পারস্য ও ভারতীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আধুনিক ইউরোপের গুরুর মর্যাদা লাভ করে। এই মরুচারী লোকেরাই কাব্য-সাহিত্য ও নানা ধর্মমতের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাসবিদ-দার্শনিক ইবনে খালদুন এবং আধুনিক কালের বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toyenbee) এ সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণ পেশ করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তা হল ঃ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মানুষ নিজেদের প্রাচীন জীবনধারা পরিত্যাগ করে এবং নবতর দিগন্তের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে নানা দেশে ও নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় আর এভাবেই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এভাবে জনতার স্থানান্তর, মরু পরিক্রমা, যাযাবর জীবন-ধারা, চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধরন প্রভৃতি সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাস-পূর্ব কালের ব্যবসায়িক সড়ক, রোম্যান গীর্জা এবং বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি একালের সংস্কৃতির ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। কাল-পরিক্রমায় দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রাচীনতম সংস্কৃতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তার কারণ এই যে, স্পেন, পর্তুগাল, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও হলান্ডের অধিবাসীরা নিজেদের শিক্ষাগত, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ঐসব অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম-চিহ্ন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্ণরূপে বিলুপ্ত ও নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সংস্কৃতিসমূহ পশ্চাদপদ রয়ে গেছে। কেননা উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলো থেকে এ অঞ্চলগুলো বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং উন্নতি ও বিকাশ লাভের কোন কারণ বা উদ্যোগই সেখানে ছিলনা। বৈদেশিক আক্রমণ থেকেও এদেশগুলো মুক্ত রয়েছে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতিরও কোন ছায়াপাত ঘটেনি এসব দেশের ওপর। নৈসর্গিক উপায়-উপকরণ দুনিয়ার সব দেশের মানুষের জন্যেই সমান। কিন্তু বংশীয় পার্থক্য-বৈষম্য, দৈহিক-মনস্তাত্বিক বিশেষত্ব, লিঙ্গগত প্রভেদ, সমাজের বিশেষ গঠন-প্রণালী ও নিয়মতন্ত্র একটি বিশেষ ধরনের অবয়ব গড়ে তোলে এবং এগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বও একটি নবতর বিজয়ী সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও উৎকর্ষ দান করে। সংস্কৃতির উৎকর্ষে এমন একটা পর্যায়ও আসে, যখন অধিকতর উৎকর্ষ লাভ ও তার সম্ভাবনা ম্লান

www.amarboi.org

হয়ে আসে। তবে বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণ, অর্থনৈতিক তৎপরতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি সংস্কৃতিক উৎকর্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

বিশ্বজনীন সংস্কৃতি

আধুনিক সভ্যতা এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতিরই বিকশিত রূপ। তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির নির্যাস ও বাছাই-করা উপাদান নিঃশেষে লীন হয়ে রয়েছে। গ্রীক, রোমান, তুরান প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উত্তরাধিকার এতেই একীভূত। তার কারণসমূহ এই ঃ

(১) দূরত্বের ব্যবধান নিঃশেষ হওয়া

(২) নিকটতর সম্পর্ক-সম্বন্ধ

(৩) অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা

(৪) রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিন্ন ধারণা

(৫) অভিন্ন ও সদৃশ ভাষা ব্যবহার

যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা দেশ ও জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্বের যে দূরত্ব লোকদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে তা সম্পর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ট ও নিবিড়তম সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যোগাযোগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। তার ফলে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক দেখাদেখি ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে খুবই স্বাভাবিকভাবে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির মধ্যে একারণেই টাগ-অব-ওয়ার চলছে। সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপনে ভাষার অভিন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে তুলনামূলকভাবে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এ দুটি ভাষা। ফলে জাতি ও মিল্লাতসমূহ নিজেদের একক ও সামষ্টিক বিরোধ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও একটি বিরাট পরিবারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে স্বার্থের অভিন্নতা এবং আবেগ অনুভূতিতে একই ভাবধারার প্রবাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা

ইসলামী সংস্কৃতি ঃ ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এজন্যই তা এক আপোষহীন 'দ্বীন' নামে অভিহিত। তার নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমণ্ডলের ভেতর মানুষ নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের নির্ধারিত এ সীমা অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের

www.amarboi.org

ধারক। বিশ্বলোকের চিরন্তন মূল্যমানের উৎস যে খোদায়ী গুণাবলী তা ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের অয়ত্তাধীন করে নিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সক্ষম হতে পারে।

ইসলামী বিধানের অধীনে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন শৃংখলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি হয়, যার দরুন খোদায়ী গুণাবলীর আনুপাতিক প্রতিফলন হওয়া সম্ভবপর। ইসলামের পরিভাষায় একেই বলা হয় ই'তিদাল—ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

সেখানে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন যোগ্যতার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রকৃতি বিজয়ের সুফলকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়।

ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার এককত্ব ও অনন্যতা এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার সুদৃঢ় ধারণা এমন এক একাত্মতা ও অভিন্নতার সৃষ্টি করে যার দরুন মানব সমাজের বাধ্যবাধকতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায়।

এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের জন্যে জীবিত থাকে বিধায় সমস্ত ব্যক্তির জীবন-প্রয়োজন স্বতঃই পূর্ণ হতে থাকে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঃ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে—এই জীবনটা কতকগুলো মৌলিক উপাদানের আপতিক বা দুর্ঘটনামূলক সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই; তার লক্ষ্য ও পরিণতি বলতেও কিছু নেই। এসব উপাদানের বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ারই নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন অকল্পনীয়। জীবন একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তাই দুনিয়ায় নেই কোন শাশ্বত মূল্যমান—নেই কোন দায়-দায়িত্ব, কোন প্রতিশোধ বিধান ।

এই চিন্তা দর্শনে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তা-ই ভালো। অন্য ব্যক্তি বা জাতির জীবন-শিরা যদি তাতে ছিন্ন-ভিন্নও হয়ে যায়, তবু তা ভালোই। পক্ষান্তরে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা-ই ক্ষতিকর, তা-ই মন্দ—তাতে অন্যান্য মানুষের বা জাতিসমূহের যতই কল্যাণ নিহিত থাক না কেন।

এক কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণত স্বার্থবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল। একারণে দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহই তার অনিবার্য পরিণতি। পাশ্চাত্য সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয়ই সাধারণ দৃশ্য। সেখানে শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিত, মালিক ও শ্রমিক এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।

বিজিত ও পদানত জাতিসমূহকে সেখানে প্রকৃতি বিজয়ের মূল তত্ত্ব বা রহস্য উন্মোচনে শরীক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিরোধী জনমনে দৃঢ়মূল করে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

www.amarboi.org

মানব জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা

ভাষা-বিশেষজ্ঞরা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ভূমি চাষ বা জমি কর্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে মন-মানসের পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ বিধান, নৈতিক-চরিত্র ও মানসিক যোগ্যতার পরিবর্ধন, স্বভাব-মেজাজ, আলাপ-ব্যবহার ও রুচিশীলতার পরিমার্জন এবং এসব উপায়ে কোন জন-সমাজ বা জাতির অর্জিত গুণ-বৈশিষ্ট্য—এসবই 'সংস্কৃতি' শব্দে নিহিত ভাবধারা। এ থেকেই সংস্কৃতির অর্থ করা হয় 'অর্জিত কর্মপদ্ধতি'। এ অর্জিত কর্মপদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের অভ্যাস, ধরন-ধারণ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মূল্যমান, যা এক সুসংবদ্ধ সমাজ বা মানব গোষ্ঠী কিংবা একটা সঠিক পরিবার-সংস্থার সদস্য হওয়ার কারণে আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। আমরা নিজেরা তা রক্ষা করে চলি এবং মনে মনে কামনা পোষণ করি তার উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভের।

সংস্কৃতির এ তাৎপর্য অনেক ব্যাপক-ভিত্তিক। এর মধ্যে শামিল রয়েছে এমন সব জিনিসও, যাকে সাধারণত এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, প্রতিটি কর্মপদ্ধতির মূলে রয়েছে কতকগুলো বিশেষ কার্যকারণ; সেগুলো কি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়? আমাদের মধ্যে ক্ষুধার উন্মেষ হয়, আমরা তা দূর করার চেষ্টায় লিপ্ত হই; সেজন্যে কিছু-না-কিছু কাজ আমরা করে থাকি। ক্ষুধা নিবারণ—শুধু ক্ষুধা নিবারণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু যে নিয়মে আমরা ক্ষুধা নিবৃত্ত করি, সেজন্যে যে ধরনের খাদ্য আমরা গ্রহণ করি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে আমরা যে নিয়ম ও পন্থা অনুসরণ করি, তা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যৌন-প্রকৃতি—কিংবা বলা যায় যৌন কার্যকারণ—মূলত একটি দৈহিক প্রবণতা; তার সাথে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে এমন বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতিতে, যা মানব সমাজের বিশেষ অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে এই বিশেষ ধরন ও পদ্ধতি অবশ্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃতিক পরিবেশ

মানবতা-বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির সাধারণ মূলনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। যে কর্মপদ্ধতি সব সংস্কৃতিতেই সমানভাবে বিরাজমান এবং সব সংস্কৃতির জন্যেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষা; এটি স্বতঃই সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারিবারিক সংগঠনের

www.amarboi.org

কোন-না কোন রূপ। বস্তুত কোন সংস্কৃতিই তাকে জানবার ও তার আত্মপ্রকাশের উপায় ও মাধ্যম ছাড়া বাঁচতে পারেনা। অনুরূপভাবে বংশ সংরক্ষণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে সংস্কৃতিই স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা। এর চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, সংস্কৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধারণ মূলনীতির মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। মানুষ কোথাও একত্রে বসবাস করবে অথচ তার কোন সংস্কৃতিই থাকবেনা, এটা অসম্ভব; অন্তত এরূপ এক মানব-সমষ্টির অস্তিত্ব ধারণাই করা যায়না। এমন কি দুনিয়ার ও লোক-সমাজের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত কোণে বসে আছে, যে মনে করে নিয়েছে যে, সে দুনিয়ার সব নিয়ম-নীতিকেই পরিহার করে চলেছে, মূলত সে-ও অবচেতনভাবে অন্য লোকদের কাছ থেকে নেয়া কিছু-না-কিছু নিয়ম-নীতি অবশ্যই পালন করে চলছে—সে তা স্বীকার করুক আর না-ই করুক। তার চিন্তা-বিশ্বাস, তার কাজ-কর্ম সারা জীবন ধরে তার সঙ্গে লেগেই থাকে; কিন্তু তা কোথায় যে রয়েছে এবং কবে থেকে, তা সে বুঝতে এবং জানতেই পারেনা।

সংস্কৃতির এ সার্বিক বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় বিকাশের ফসল বলা যেতে পারে অনায়াসেই। মানুষ সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারছে শুধু এজন্যে যে, সে নিজের মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা ও প্রতিভার লালন ও বিকাশ সাধনে সাফল্য অর্জন করেছে, যার ফলে সংস্কৃতির সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে মানুষ যেন নিজেরই পরিবেষ্টনীর এক নব-দিগন্তের সৃষ্টি করে নিয়েছে। এর ফলে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া খুবই সহজ হয়েছে তার পক্ষে। আর এ সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই, যেদিন এ দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের প্রথম সূর্যোদয় ঘটেছিল সেই দূর অতীতকালে।

এ জমিনের বুকে সেই প্রথম যেদিন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো, সেদিন থেকে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের এ সংস্কৃতির বাহ্য রূপও বিবর্তিত হয়েছে অনেক। মানব জীবনের সেই প্রথম পর্যায়টি ছিল সর্বতোভাবে স্বভাব-ভিত্তিক—স্বভাব-নিয়মে চলত সে জীবনের দিনগুলো। খাদ্য গ্রহণ এবং বসবাস করার ধরন-ধারণ ও নিয়ম-পদ্ধতি ছিল অতীব স্বাভাবিক ও স্বভাব-নিয়মসম্মত। কোন কৃত্রিমতার অবকাশ ছিলনা সে জীবনে। সেকালে খাদ্য আহরণের ক্ষেত্র ছিল এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি, জীবনযাত্রা ছিল প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, সহজ ও সচ্ছন্দ। মানুষ ক্রমশ এখানে তার অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিজের জীবন-যাত্রার অনুকূল করে তুলতে শুরু করে। প্রকৃতির বুকে মানুষের শক্তি-প্রয়োগের যে অভিযান সেদিন শুরু হয়েছিল, ক্রমবিকাশের নানা স্তর অতিক্রম করে, তা আজো সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে, দুমড়ে দিয়ে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজের ব্যবহারে লাগাবার জন্যে মানুষ তৈরী করে নিয়েছিল নানা হাতিয়ার।

www.amarboi.org

দিন যতোই অগ্রসর হয়েছে, মানুষ এ প্রকৃতির বুকে পেয়েছে নানা অপূর্ব সম্পদ ও মহামূল্য দ্রব্য-সম্ভারের সন্ধান এবং তাকে ব্যবহার করার জন্যে মানুষ তৈরী করেছে তার উপযোগী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি। এতে করে মানুষের চিন্তা-শক্তি একদিকে যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে তাতে সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও বিশালতার উদ্ভব। তাই আজ একদিকে মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছে, অপরদিকে মানুষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে বহু বিচিত্র ধরনের জটিল ও জটিলতর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার। আজ মানুষ সক্ষম হয়েছে জটিলতর ও সূক্ষ্মতর কর্ম সম্পাদনে। মানবীয় সংস্কৃতির বর্তমান বিকশিত রূপ মানুষের বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়েরই পরিণতি। কিন্তু এ বিকশিত রূপ যতোই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক-না কেন, মানব প্রকৃতির আসল রূপ আজো ঠিক তা-ই রয়ে গেছে, যা ছিল তার বৈষয়িক জীবনের প্রথম সূচনাকালে। পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে অনেক; কিন্তু তা সবই বাহ্যিক—পোশাকী পর্যায়ের। বিবর্তন ও পরিবর্তনের এ আঘাত মানব-প্রকৃতির মূল ভাবধারায় পারেনি কোন পরিবর্তন সূচিত করতে। এ এমনই এক সত্য, যা মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেনা।

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক কি? মানুষ কি প্রকৃতির দাস, না মানুষের অধীন এই প্রকৃতি? প্রকৃতি কি মানুষকে নিজের মতো গড়ে তোলে, না মানুষ নিজের মতো গড়ে নেয় প্রকৃতিকে? এ এক জটিল এবং অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে যত গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাই করা যাবে, ততোই এ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, কথাটি কোন দিক দিয়েই পুরোমাত্রায় সত্য নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই তা আধা-সত্য। মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, একথা ঠিক; কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া মানুষের জীবন ধারণাতীত। প্রকৃতি মানুষকে নিজের মত গড়ে; কিন্তু সে গড়ন বাহ্যিক—দৈহিক মাত্র। মানসিকতার কোন নব রূপায়ণ বা তাকে নতুনভাবে ঢেলে তৈরী করা প্রকৃতির সাধ্যের বাইরে; বরং দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা ও অপ্রতিহত কর্মক্ষমতার সুস্পষ্ট ছাপ আঁকতে পারে। মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করতেই সতত সচেষ্ট। সে নিজের ইচ্ছা মতো তার পরিবেশকে গড়ে তুলতে চায়। সেজন্যে সে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে, প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রকৃতির কাঁচা মালকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস তৈরী করে নেয়; কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হয়নি; বরং মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা, চিন্তা-গবেষণা ও কর্মশক্তির যা কিছু প্রয়োগ, তা এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই কার্যকর হয়ে থাকে, তার বিপরীত কিছু করা সম্ভব হয়না মানুষের পক্ষে।

মানুষের সাংস্কৃতিক ভাবধারায় এরই সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এখানে এক নির্জীব পদার্থের মত পড়ে থাকতে প্রস্তুত নয়। সে চায় নিজের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর

www.amarboi.org

রেখে যেতে স্বীয় পরিবেশ ও প্রকৃতির বুকে। এজন্যে সে গভীর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পরিকল্পনা শক্তি এবং কর্মের ক্ষমতা ও সামর্থ্য এ দুটিকেই পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করে। আর মনের সুষমা মিশিয়ে সে এখানে যা কিছু করে, যা কিছু বলে, যেভাবে জীবন যাপন করে, যেভাবে লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেভাবে পরিবার, সমাজ, অর্থ-সংস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তার সব কিছুতেই তার নিজস্ব চিন্তা-বিশ্বাস, ধারণা-অনুমান ও কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে মনের ও মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটে সমগ্র পরিবেশের ওপর আমাদের ভাষায় তাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি। এ হচ্ছে মানসিক ভাবধারা ও মানসিকতারই বাহ্য প্রকাশ। তাই যা ব্যক্তির মানসিকতা, যা তার মানসিক ভাবধারা, তা-ই সংস্কৃতির মূল উৎস এবং একই মানসিকতাসম্পন্ন বহু মানুষের বাস্তব জীবনে এ মৌল উৎসের যে প্রতিফলন ঘটে, তা-ই সে সমাজের সংস্কৃতি।

ব্যক্তি জীবন সমাজ-নিরপেক্ষ নয়—হতে পারেনা। ব্যক্তি-মানসিকতা সংস্কৃতির যে মৌল উৎস, তারও সামাজিক ও সামষ্টিক প্রতিফলন এবং প্রতিষ্ঠা একান্তই স্বাভাবিক। এর ব্যত্যয় হতে পারেনা কখনো। তাই ব্যক্তি-সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে ব্যক্তির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা। তার বিকাশ, প্রকাশ, সম্প্রসারণ ও পরিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এটাই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিবেশ।

সংস্কৃতির নিজস্ব ভাষা প্রয়োজন। এমন কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায়না, যার নিজস্ব কোন ভাষা নেই—নেই নিজস্ব কোন পরিভাষা। সংস্কৃতি যতই জটিল ও সূক্ষ্ম হোক এবং তার প্রকাশ যতই কঠিন হোক না কেন, মানসিক ভাবধারা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও হয় ততই তীব্র। মানব মনের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও আশা-আকাংক্ষা স্বতঃই প্রকাশের মুখাপেক্ষী—প্রকাশপ্রবণ। এর প্রাবল্য যত তীব্র হবে, মানুষের মগজও হবে তত বেশী কর্মক্ষম ও সৃজনশীল। মন ও মগজের এ বিকাশশীলতার চাপে মানুষের সংস্কৃতিও হয়ে ওঠে ততই বিকাশমান ও গঠনোন্মুখ। এভাবে সংস্কৃতির যতই অগ্রগতি ঘটে, জন-মানস এবং মানসিকতাও ততই উৎকর্ষ লাভ করে আর মানুষও তার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে ততই সক্ষম হয়ে ওঠে। এর ফলে মানব-বংশের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব-সংস্কৃতিরও প্রকাশ ঘটে নানাভাবে, নানা রূপে এবং নানা উপায়ে। এজন্যে বলতে হবে, মানুষ ও সংস্কৃতি পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত—অবিচ্ছিন্ন।

বিকাশমান দুনিয়ার সংস্কৃতি

এতক্ষণ যা কিছু বলা হল, তা দ্বারা সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্টতর করে তুলতেই চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃতি যে আমাদের জীবনের জন্যে অপরিহার্য, আমাদের জীবন গঠনে তার ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে প্রভাবশালী ও কার্যকর তা এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আশা করি। বস্তুত সংস্কৃতি মৌল ভাবধারার

www.amarboi.org

দিক দিয়ে যেন একটি প্রবহমান নদী। এ নদী যেখান থেকেই প্রবাহিত হয়, জীবনের অস্তিত্ব, অবয়ব ও চৈতন্যের ওপর তার গভীর স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সংস্কৃতি-নদীর প্রবাহ সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তারা হয় তা দেখতেই পায় না কিংবা দেখেও ঠিক অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাকে দেখবার ও অনুভব করার জন্যে চাই অনুভূতিশীল মন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। কথাটি এভাবেও বলা যায় এবং তা বলা যুক্তিযুক্তই হবে যে, অনুভূতিশীল মন এবং দৃষ্টিসম্পন্ন চোখই সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারে—স্পষ্টত অবলোকন করতে পারে তার ভালো ও মন্দ রূপ। আর নদীর ঘোলা-পানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পানি গ্রহণের ন্যায় পংকিল সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে পবিত্র ও নির্মল ভাবসম্পন্ন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারে কেবলমাত্র সচেতন লোকেরাই। যাদের মন চেতনাহীন, মগজ বুদ্ধিহীন ও চোখ আলোশূন্য, সংস্কৃতির প্রবহমান দরিয়া থেকে তারাও আকণ্ঠ পানি পান করে বটে; কিন্তু সে পানি হয় ঘোলাটে ময়লাযুক্ত, পুঁতিগন্ধময় ও অপরিচ্ছন্ন। এজন্য সংস্কৃতির শালীন, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এবং অশালীন ও অপরিচ্ছন্ন তথা পংকিল ও কদর্য-এ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার—ঠিক যেমন প্রবহমান নদী-নালায় এ দু ধরনেরই পানিস্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হতে থাকে চিরন্তনভাবে। যেসব লোক অন্ধ ও অচেতনভাবে স্বীয় সংস্কৃতির চতুঃসীমার মধ্যে থাকে অথচ তার প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেনা, সেজন্যে তারা কোন সচেতন ও সজাগ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়না—সেজন্যে তাদের ভেতর জেগে ওঠেনা কোন আত্মানুভূতি, তারা এই শেষোক্ত পর্যায়ের সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে থাকে। কেননা তাদের মতে সংস্কৃতি কখনো ভাল বা মন্দ কিংবা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারেনা—হতে পারেনা তা পবিত্র ও শালীনতাপূর্ণ।

আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও মূল্যমান বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই আমাদের সংস্কৃতির ফসল। সংস্কৃতিই এসব গড়ে তোলে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতাপূর্ণ করে। মানবীয় চেতনায় ও বোধিতে যা কিছু বিশ্লিষ্টতা থাকে স্বাভাবিকভাবে, সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও নিজস্ব মূল্যবোধই তাকে উৎকর্ষ দান করে, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। এটাই মানুষকে অবচেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে চেতনার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ তথা বাইরের দুনিয়ায় নিয়ে আসে এবং তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু তাই বলে তার মৌল সাংস্কৃতিক চেতনায় কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা—ঘটেনা কোনরূপ পরিবর্তন। অবশ্য একথা ঠিক যে, সংস্কৃতি মানুষের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাধ্যম। অন্য কথায়, কোন জাতির সংস্কৃতি সে জাতির তাবৎ লোকদের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভারই প্রতিবিম্ব। এজন্যে একদিকে যেমন বলা যায় যে, অসভ্য জাতিগুলোর সংস্কৃতিবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ নিম্নমানের হয় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে, তেমনি অপরদিকেও বলা যায় এক-এক

www.amarboi.org

ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন-বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ হয় এক এক ধরনের। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন-বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ বিভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। কেননা সংস্কৃতির মৌল উৎস জীবনবোধ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মানসিকতা। অতএব জীবন-দর্শনের পার্থক্যের কারণে সাংস্কৃতিক বোধ ও প্রকাশেও অনুরূপ পার্থক্য হওয়া অনিবার্য ব্যাপার। সংস্কৃতির এ পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটে লোকদের মননে ও জীবনে এবং মৌল অনুভূতিতে যেমন, তার প্রকাশ মাধ্যমেও তেমন। তাই ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, এক ব্যক্তির এক প্রকারের জীবন-দর্শন থাকাকালে তার মানসিক অবস্থা ও জীবন-চরিত্র ছিল এক ধরনের; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সে জীবন-দর্শনে যখন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল, তখন তার মানসিকতা, জীবনবোধ ও চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল—তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-মাধ্যমও গেল সমূলে বদলে। এ পরিবর্তনের মূলে জীবন-দর্শনের পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয়না। আরব জাতির ইতিহাসই এ পর্যায়ের বড় দৃষ্টান্ত। যে আরব জনগণ ছিল সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা-শিষ্টাচার বিমুখ, অনুন্নত সামাজিক সংস্থা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতীক, লুঠতরাজ ও মারামারি-কাটাকাটিতে অভ্যস্ত—যাদের নিকট মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি তুচ্ছ, মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তারা এক নবতর জীবন-দর্শনের ধারক লোক-সমষ্টি হিসেবে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল এবং আঠারো বছরের মধ্যেই সেই আরব জাতির মন-মানস, জীবন-চরিত্র, মূল্যমান ও জীবনবোধ আমূল পাল্টে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। পূর্বের অন্ধকার জীবন নবীন আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠল, মনের সংকীর্ণতা ও নীচতা-হীনতা ঘুচে গিয়ে পারস্পরিক ঔদার্য, প্রেম-প্রীতি, সহনশীলতা ও মার্জিত রুচিশীলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল মনন ও জীবনের সর্বত্র। পূর্বে যা ছিল ন্যায়, এক্ষণে তা চরম অন্যায় এবং পূর্বে যা ছিল অন্যায়, এক্ষণে তা-ই অপরিহার্য কর্তব্য বিবেচিত হতে লাগল। মানুষের মূল্য ও মর্যাদা হল প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত। অশালীনতা ও অশ্লীলতা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিল লজ্জাশীলতা ও সুরুচিশীলতা। যে সমাজে মানুষের মর্যাদা ছিল কুকুর-বিড়ালের চাইতেও নিকৃষ্ট, সেখানে তা এমন অভুতপূর্ব উন্নতি লাভ করল যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পর আসমান ও জমিনের সবকিছুর উর্ধ্বে নির্ধারিত হল তার স্থান। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহারা মানুষের সামনে এক মহত্তম জীবন-লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অন্ধকার যবনিকার অবসানে ঘটল নতুন এক আলোকোজ্জ্বল দিবসের সূর্যোদয়। একই ব্যক্তি ও একই জাতির জীবনে রাত্রির অবসানে দিনের সূর্যোদয়ের এ ঘটনা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে। জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশের পরিবর্তন হওয়ার এ ঘটনা এক শাশ্বত ও চিরন্তন ব্যাপার এবং একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

www.amarboi.org

পূর্বেই বলেছি, মানব সমাজে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। লক্ষ লক্ষ বছরের দীর্ঘ এক প্রস্তরযুগ অতীত হয়ে গেছে মানব সমাজের ওপর দিয়ে। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার সময়-কালও আমাদের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বছরে বিস্তীর্ণ এ দীর্ঘ যুগে মানুষ পাথরের অসমান ও অমসৃণ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। প্রস্তর যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও পশু পালনের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এতে করে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের পন্থা ও অর্থনৈতিক মান বদলে যায়। অতঃপর তাম্র ও লৌহ যুগে এ পরিবর্তনের গতি অধিকতর তীব্র হয়ে ওঠে। আর বর্তমানের এ পারমাণবিক যুগে মানুষের সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের ধারা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এ পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষও বদলে গেছে অনেক। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মৌল চেতনায় যেমন কোন পরিবর্তন আসেনি—কোন পরিবর্তনই সূচিত হয়নি মানুষের মানসিকতায়, মূল্যমানে, চরিত্র-নীতিতে, তেমনি পরিবর্তন সূচিত হয়নি সংস্কৃতিতে, সাংস্কৃতিক ধারণায় ও জীবনবোধে। যদি বলা হয় যে, সমাজ বিবর্তনের এ অমোঘ ধারায় মানুষের সংস্কৃতিও বদলে গেছে, তাহলে বলতে হবে, সংস্কৃতি যতটা বদলেছে ততটাই তা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত—যেমনটি ছিল মানবতার প্রথম সূচনাকালে। বস্তুত সমাজ-বিবর্তন এবং মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তনে মৌল মানব-প্রকৃতি আদৌ বদলে যায়নি। স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ আজো তেমনি মানুষই রয়ে গেছে, যেমন ছিল সে পার্থিব জীবনের প্রথম সূচনায়।

www.amarboi.org

সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন

কোন মুমূর্ষু বা মৃত সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি সম্ভবপর? এ একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং সুধী সমাজে এ জিজ্ঞাসা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রচণ্ড আলোচনার ঝড় তোলা হয়। দুনিয়ায় এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন যে, একটি সংস্কৃতিকেও একজন ব্যক্তি-মানুষের জীবনের ন্যায় বিভিন্ন স্তর পার হয়ে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে তা থাকে শৈশাবস্থায়, তারপর যৌবনে পদার্পণ করে—এবং সব শেষে তা বলবান ও সতেজ হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে সংস্কৃতি ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে এবং পরিপক্কতার পর্যায় অবধি পৌঁছে। তখন সম্মুখে আসে শিল্প ও অংকনের স্বর্ণযুগ। তারপর অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে একটা পতনের যুগ সূচিত হয়ে যায়। শিল্পে অংকনে ও লেখনে প্রেরণার প্রবহমান স্রোতধারা খুব দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে সাম্প্রতিক শুষ্কতার রূপ ধারণ করে। প্রতিটি জীবন্ত সংস্কৃতিই এর অপেক্ষা করে—এটাই হচ্ছে সমস্ত ঐতিহাসিক পতনের মর্মকথা ও মৌলতত্ত্ব। গুরুত্বহীন পরিবর্তন সহ ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং আরবদের জীবন-ইতিহাস এমনিভাবে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পূর্ণতার মধ্যে এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যে, বিপুল সময়ের বিস্মৃতির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে সীমাহীন অভিন্ন মানবীয় সংস্কৃতির স্রোত-তরঙ্গ। সেই সবগুলোই নাটকীয়ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল দীপ্তিমান পথে, বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, পুনরায় ধ্বংস হয়েছে এবং সময়ের উপরিতলে আর একবার একটা ঘুমন্ত ধ্বংস আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই তত্ত্বটির একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ হিসেবে বলা যায়, সমস্ত মানবীয় সংস্কৃতির একটা সূচনা ছিল। তা পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার পর সেগুলো একটা অন্তহীন রাত্রির মৃত্যুগর্ভে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এক্ষণে সেগুলোর পুনরুজ্জীবনের কথাবার্তা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির বাল্যকাল পুনরুজ্জীবনের মতই হাস্যকর ব্যাপার মনে হয়, যা কেবলমাত্র ধারণা বা কল্পনার জগতেই সম্ভব—কঠিন বাস্তবতায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু এই তত্ত্বটির গভীর ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ একজন সাধারণ মানুষের নিকটও প্রকাশ করে দেবে যে, এসব তত্ত্বের প্রস্তাবকরা সংস্কৃতি বলতে মনে করেন শুধু ভালোর মানের বাহ্যিক প্রকাশ, যা একটা জনগোষ্ঠী বা একটা জাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের লক্ষ্য আরোপ করেন শুধু বাহ্যিক প্রকাশের ওপর। তারা একথা কখনই অনুধাবন করেন না যে, সংস্কৃতি মূলত একটা আভ্যন্তরীণ তাগিদের বাহ্য প্রকাশ মাত্র,

www.amarboi.org

যা মানবীয় হৃৎপিণ্ডে ধুক্ ধুক্ করতে থাকে অনির্বাণ দীপ-শিখার মত। রেডিও, টেলিভিশন ও উড়োজাহাজ প্রভৃতি বস্তু নিজস্বভাবে কোন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনা। এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির লক্ষণ মাত্র। এগুলো শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক জীবন সংস্কৃতি প্রকাশের সত্যিকার মাধ্যম নয়। মানুষের মনই হচ্ছে সমস্ত মানবীয় কর্মতৎপরতার আসল উৎসস্থল। সংস্কৃতিরও উৎস ও লালন-ভূমি হচ্ছে মন। কাজেই সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন ধরন বুঝায় না। আসলে তা হচ্ছে মনের একটা বিশেষ ধরনের আচরণভঙ্গি, চিন্তার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া, যা মানবীয় চরিত্রের একটা বিশেষ ধরন গড়ে তোলার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যকথায়, সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক গঠন-প্রকৃতি। আমাদের বর্তমান নৃ-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক স্থূলভাগীয় চিত্রের একটা জরিপ প্রমাণ করে যে, আধুনিক ইতিহাস প্রজাতিসমূহের মানবীয় সমাজ উৎপাদন করতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিশবার পুনরাবৃত্তি করেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ তা থেকেই উৎসারিত। প্রাচীন রোমান, গ্রীক এবং আজকের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সেই ঐতিহাসিক পটভূমিই বহন করে চলেছে। সময় ও স্থানের বিরাট আবর্তন সত্ত্বেও তারা সংস্কৃতির সেই একই পরিমণ্ডলে অবস্থান করছে। এমন কি বর্তমান সময়েও বিশ্বের বহু সংখ্যক জাতি—যদিও তারা জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত—মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে পরস্পর একমত হবে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান বা জার্মানী সবাই ব্যক্তি মূলধন ও শ্রম, শিল্পপতি ও শ্রমিক, ব্যক্তি ও সমাজ প্রভৃতি সামষ্টিক মৌল সমস্যাবলীর সমাধান করতে চেষ্টা করছে এক বাস্তব ও অভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিস্ময়-উদ্দীপক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কেন? এর প্রকৃত কারণটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। সেটা এই যে, বস্তুবাদের একই প্রাণ-শক্তি কাজ করছে তাদের বিচিত্র ধরনের জীবনের বহু দিকের বুনট ও গড়নে। জীবনের হট্টগোল ও দৌড়ঝাঁপে যেভাবেই হোক তারা বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু হৃদয়াবেগ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তাৎক্ষণিক চাহিদার চাপ ও বলপ্রয়োগে স্বার্থ লাভের গোলমালে তারা তাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই হারিয়ে ফেলেনি। আর সেটা হচ্ছে বস্তুগত সুবিধা অর্জন। তারা নিজেদের জন্যে এমন একটা আদর্শ লাভ করার ইচ্ছা রাখে যা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর সর্বপ্রধান বিভাগগুলোতে—তাদের শিল্পে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও ধর্মে, আইনে ও নৈতিকতায়, স্বভাবে ও আচরণে, পরিবার ও বিবাহে খাপ খাইয়ে চলবে। সংক্ষেপে এ এমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা পাশ্চাত্য সমাজের জীবন পদ্ধতিতে, চিন্তা ও চরিত্রে ধুক্ ধুক্ করে চলতে থাকবে।

একটা মহান সংস্কৃতি কোন অবসাদগ্রস্ত স্থানে নয়, বরং অসম সাংস্কৃতিক বাহ্য প্রকাশের জনারণ্যে ও পাশাপাশি এবং একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কহীনভাবে অবস্থান

www.amarboi.org

করতে পারে। তা একটা ঐক্য কিংবা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপন করে যার বিভিন্ন অংশ সমর্থিত হয়েছে সেই একই ভিত্তিগত মৌলনীতি থেকে এবং সেই একই মৌলিক মূল্যমান গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। এই মূল্যমান এর প্রধান মুখবন্ধ ও মানসিকতার কাজ করে। আমরা যদি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উপরি-কাঠামোটি ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখতে পাব, তা এমন একটা ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে যা পূর্ণমাত্রায় ও খাঁটিভাবে সংবেদজ অভিজ্ঞতালব্ধ বৈষয়িক ও এই পৃথিবীকেন্দ্রিক। তা এই নতুন মৌল মূল্যমানকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ এবং তার ভিত্তিতেই তা গড়ে ওঠছে। সন্দেহ নেই, যুগে যুগে নতুন নতুন সভ্যতা এসেছে এবং বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে তা বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু সংস্কৃতি সব সময়ই রক্ষা পেয়েছে ও ক্রমশ সাফল্য লাভ করেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজেকে বারবার পুনরুজ্জীবিত করে। চীনের প্রাচীন সভ্যতা খৃস্টপূর্ব সপ্ত শতকে যখন ভেঙে পড়ল তখন তা প্রাচীন পৃথিবীর অন্য সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক সভ্যতাকে তার উচ্চতর লক্ষ্যপানে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারল না। অনুরূপভাবে যখন গ্রাকো-রোমান সভ্যতা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল খৃস্ট যুগের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও শ্রেণী বিদ্রোহের রোগে, তাও এই প্রায় তিনশ বছর সময়ের মধ্যে দূরপ্রাচ্যে এক নতুন সভ্যতার জন্মলাভকে ঠেকাতে পারল না।[১] বস্তুত এভাবেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। কেননা কোন জনসমষ্টি কিংবা জাতি যখনই জীবনের কোন দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমান গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে, তখন তার বাস্তবায়ন তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব থাকে না; বরং তখন এই দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমান তার সমস্ত কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন রঙে রঙীন করে তুলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

কোন জনসমষ্টিই যদি একটা বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তা-ই তাদের সংস্কৃতিকে রূপায়িত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবশালী দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা। তা-ই একটা বিশেষ ধরনের আকার-প্রকারে অভ্যস্ত কার্যকলাপের সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার পটভূমি আর সভ্যতা বলতে সাধারণত 'পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংস্কৃতির অভিব্যক্তি' বুঝায়। তাই সভ্যতায় সামান্য ব্যতিক্রম ঘটতে পারে সময়ের ও স্থানের পার্থক্যের কারণে; কিন্তু জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হতে বাধ্য। সময়ের ভাগ্য পরিবর্তনের দরুন মানব-প্রকৃতি কখনই বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। ইতিহাস তার অকাট্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে। ক্ষমতা-লিপ্সা, জ্ঞান-অন্বেষা, নির্মাণ-প্রীতি, সঙ্গী-সাথীদের জন্য ত্যাগ স্বীকার—এই সবই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজকের দিনেও এই কথার সত্যতায় কোনই সন্দেহ জাগেনি। এতো সেই প্রাচীনতম অতীতের কথা, যা আমাদের সম্মুখে এসেছে ভবিষ্যতের

১ A, Toyenbee : Civilisation on Trial।

পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। আমরা ভাবি, হয়ত নতুন কিছু জেগে উঠেছে মানুষের করোটিতে, প্রাচীনের অস্তিত্বে এবং এই পুরাতন ও নতুনের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই; কিন্তু এটা প্রকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র। যুদ্ধ এবং শ্রেণী-বিভেদ আমাদের চিরসঙ্গী—আদিকালের মানুষের জীবনে প্রথম যে সভ্যতা জেগে ওঠেছিল সেই সময় থেকেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন কালে গৃহযুদ্ধ ছিল একটা তুলনাহীন ঘটনা। আমরা দেখি অন্যান্য এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আমাদের সম্মুখে যথেষ্ট সাদৃশ্য তুলে ধরে। ঘটনাবলীর অসংখ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এতে ইতিহাস নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছে। মার্কিন ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ যে সংকট সৃষ্টি করে তা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটায় জার্মান ইতিহাসের সমসাময়িক সংকট রূপে, যা উপস্থাপিত হয়েছে ১৮৬৪—৭১ সনের বিসমার্কের যুদ্ধরূপে। উভয় ঘটনায়ই একটা অপরিপক্ক রাজনৈতিক সংস্থা সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উভয় ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থা ভেঙে দেয়ার ও তার কার্যকর প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধানকারী ছিল এই যুদ্ধ। উভয় ঘটনায়ই কার্যকর সংস্থার পক্ষসমূহ নিজেরাই এবং দুটিতেই তাদের ইতিহাসের কোন একটি কারণে ছিল বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর তাদের প্রকৌশলী ও শৈল্পিক ক্ষমতার প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রেই স্ব স্ব সংস্থার বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটা বিরাট শৈল্পিক সম্প্রসারণ দ্বারা, যা দুটিকেই—যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীকে—গ্রেটবৃটেনের একটা ভয়াবহ শৈল্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা ইতিহাসের আর একটি পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি ১৮৭০ সন নাগাদ শেষ-হওয়া সময় কালের মধ্যে। গ্রেটবৃটেনের শিল্প বিপ্লব সম্ভবত একটা বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাতে ১৮৭০ পর্যন্ত তার প্রকৃত ও খুব-দ্রুত-সজ্ঘটিত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছিল। ঘটনাবশত তা আরো বহু সংখ্যক ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য দেশেও সজ্ঘটিত হয়েছিল। উপরন্তু, শিল্পায়নের সাধারণ অর্থনৈতিক অবয়ব থেকে আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি ফেডারেল ইউনিয়ন ধরনের রাজনৈতিক অবয়বের দিকে ফিরাই, তাহলে আমরা দেখব, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ইতিহাস এই ক্ষেত্রে নিজেদের আর একবার পুনরাবৃত্তি করেছে তৃতীয় শতকের ইতিহাসে। এক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেন নয়, কানাডা তার সংযোগকারী প্রদেশগুলিসহ তাদের বর্তমান ফেডারেশনে প্রবেশ করেছে ১৮৬৭ সনে—১৮৬৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যের বাস্তব (De-facto) পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুই বছর পর এবং ১৮৭১ সনে দ্বিতীয় জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার বছর পূর্বে।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে বহু সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। এগুলোর ও অন্যান্য দেশসমূহের শিল্পায়নে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে একই মানবীয় সাফল্যের বহুসংখ্যক সমসাময়িক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সমসাময়িকতা অনুমানাতীত নয়। গ্রেট বৃটেনে শিল্প বিপ্লব বাহ্যত একটা একক ঘটনা

www.amarboi.org

হিসেবেই সংঘটিত হয়েছে, আমেরিকা ও জার্মানীতে তা সংঘটিত হওয়ার অন্তত দুই যুগ পূর্বে। এ ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মূলত একটা পুনরাবৃত্তিকারী বাহ্য প্রকাশ।

অ-নিরাপদভাবে যুক্ত গৃহযুদ্ধ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র চার সাফল্যাংক ও সাত বছর এবং জরাজীর্ণ নেপোলিয়ন-উত্তর জার্মান কনফেডারেশন অর্ধ শতাব্দীর জন্যে ১৮৬০-এর মারাত্মক ঘটনার পূর্বে প্রমাণ করে যে, ফেডারেল ইউনিয়নটা মূলতই একটা পুনরাবৃত্তিকারী ধরন ছিল, যা পুনরায় ঘটল কেবল কানাডায়ই নয়, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলেও।[১]

উচ্চস্তরের পরিবর্তন তার অভ্যন্তরভাগেও পরিবর্তন সাধনের তাৎপর্য বহন করবে, তা জরুরী নয়। সভ্যতার যে কারাভাঁ অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে অগ্রসর হয়েছিল প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি, গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ থেকে উড়োজাহাজে আরোহণ পর্যন্ত, প্রায় ন্যাংটা অবস্থা থেকে উন্নতমানের সুন্দরতম কাট-ছাঁটের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান পর্যন্ত, তা একটি মাত্র সত্যই প্রমাণ করে। আর সে সত্যটি হচ্ছে, তা অগ্রযাত্রার মাধ্যমে শক্তি অনুসন্ধান ও পুনর্গঠনের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়েছে এবং তা মানুষের সেই প্রবল বাসনা ও সুদৃঢ় সংকল্প, যা মানবতাকে পরিচালিত করেছে এই সমগ্র যুগে—প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈদ্যুতিক চাক্‌চিক্যময় যুগ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিতে এক বিন্দু পরিবর্তন আসেনি। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা প্রাগৈতিহাসিক গোত্রসমূহকে অন্তর্গোত্রীয় সংঘর্ষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে, তা এখন বর্তমান কালের মানুষের মনে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং সে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি আবিষ্কারে ও নির্মাণে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বিশ্ব-মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে। সীজার যদিও নিহত হয়েছে অনেকদিন আগে; কিন্তু সীজারবাদ এখনো মানুষ শিকার করছে। ইতিহাসে আধুনিক প্রবণতাকে স্থূল দৃষ্টিতে যারাই লক্ষ্য করেছে তারাই স্বীকার করবে যে, আজকেও নিষ্পেষণ পদ্ধতি, বিদ্রোহ এবং ক্রমশ বিপুল সংখ্যক লোক দ্বারা সমাজের ভিতরে ও বাইরে বেশী বেশী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা মানুষের ইতিহাসে চলমান ঘটনা বিশেষ। এটাই সেই অভিন্ন মানসিকতা যা আধুনিক মানুষের মধ্যে কাজ করছে। এখানে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা শুধু গতিবেগ ও কাঠামোগত মাত্র; অন্য কোন দিক দিয়েই একবিন্দু পার্থক্যও লক্ষ্যভূত নয়।

প্রত্যেকটি সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ভাবধারা রয়েছে যা স্বতঃই প্রকাশিত হয় সভ্যতার বিভিন্ন দিকে ও শাখা-প্রশাখায়। এই ভাবধারা দুর্বল হতে পারে; কিন্তু কখনই

১. Arnold Toyenbee : Civilisation on Trial

www.amarboi.org

মরে যেতে পারে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মার মৃত্যুর পর অন্য দেহে তার চলে যাওয়া ও স্থান করে নেয়ার নিয়ম নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলছে। ফলকথা, সভ্যতা জন্ম নেয় এবং কিছু দিন পর বিলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু সংস্কৃতির আত্মা অন্য কোন সভ্যতার দেহে স্থান গ্রহণ করে এবং অতঃপর বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে থাকে; তবু মরে যায় না কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় না।

আমরা সংস্কৃতির এই আবর্তনমূলক গতিশীলতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করব শিল্পকলা, নীতিদর্শন এবং আইন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। শিল্পকলা সমাজের খুব বেশী সংবেদনশীল দর্পণ; সংস্কৃতি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ ও সংস্কৃতি যা, তার শিল্পকলাও তা-ই হবে। এখানে আমরা শিল্পের একটা ধর্মীয় ও সংবেদনশীল ধরনের সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক প্রতিকৃতি তুলে ধরছি।

'আর্ট'কে দুভাগে ভাগ করা চলে। একটি হচ্ছে উত্তেজক আর্ট (Sensate Art) আর অপরটি স্বর্গীয় আর্ট (Divine Art)। এই পরিসরে ও এই নমুনার মধ্যে 'ডিভাইন আর্ট' স্বর্গীয় সংস্কৃতির এক বিরাট মুখবন্ধ গড়ে তোলে এবং উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, প্রকৃত ও বাস্তব মূল্যমান হচ্ছেন একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা। এই মূল্যমান মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই তা স্বভাবতই মানুষের ভাল দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তা এমন একটা আর্ট যা ইচ্ছা করেই সব অশ্লীল, কুৎসিৎ ও নেতিবাচক জিনিস থেকেই চোখ বন্ধ করে রাখে ও সেসবকে উপেক্ষা করে চলে। কেননা উত্তেজক আর্ট শুধুমাত্র স্থূল চিন্তা-ভাবনার জন্যে দাঁড়ায়। তা মানুষের মধ্যে নীচ উপকরণ নিয়ে আলোচনা করে; সব নীচতাকে প্রকট করে তোলে। তার হিরো সাধারণত দেহপশারিণী, দুষ্কৃতিকারী, ভণ্ড এবং দুরাত্মা লোকেরা। ইন্দ্রিয় ভোগ-সম্ভোগের চেষ্টা করা, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রাখা, শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলিকে উত্তেজিত করা, স্থূল আনন্দ-স্ফূর্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশন এবং ইন্দ্রিয়জ আপ্যায়নই তার একমাত্র লক্ষ্য।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, Sensate Art বা উত্তেজক সংস্কৃতি যেখানেই গেছে, সৈসূর্য শিল্প তাকে অনুসরণ করেছে এবং যে সব জাতি জীবনের একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছে, তাদের আর্টও সেই একই পথে অগ্রসর হয়েছে—উৎকর্ষ লাভ করেছে। কাজেই এই আর্ট সেই আগের কালের 'প্যানিওলিথিক' মানুষের শিল্পের চলমান রূপ বলা চলে। এরা বহু প্রাচীন গোত্রের মানুষ, ঠিক যেমন আফ্রিকার বুশম্যান। অনেক ভারতীয় ও সিথিয়ান গোত্রও তাদের মতই লোক। তারা আসিরীয় সৌন্দর্য শিল্পকে পরিব্যাপ্ত করেছে—অন্তত ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে এবং প্রাচীনযুগের শেষ দিকের অতি পুরানো মিশরীয়দের থেকে অনেক বেশী। মাঝামাঝি ধরনের রাজত্ব ও নতুন সাম্রাজ্য—বিশেষ করে এদের শেষের দিকের Saite, Polemic ও রোমান যুগ যা

www.amarboi.org

Cheto Mycenacan-এর শেষ জানা যুগ এবং Gracco Roman Culture-এর যুগকে নিশ্চিত রূপে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তা পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশীল হয়ে রয়েছে বিগত পাঁচ শতাব্দীকাল ধরে। ডিভাইন আর্টকে Ideational Art বলা যায়, যা একটা বিশেষ কালে প্রভুত্ব করেছে Tacisi China Art -এর ওপর, তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং অতি পুরাতন মিশরীয় ও গ্রীক শিল্পের ওপর, খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তা ছিল প্রাচীন মধ্যযুগীয় খৃস্টান-পশ্চিম সংস্কৃতি এবং তা-ই অব্যাহত থাকে বহুদিন পর্যন্ত।

সে যা হোক, ললিতকলা বহু দিক দিয়েই বিভিন্ন, যেমন প্রাচীন ও সভ্য যুগের মানুষ। কিন্তু সে সবের আভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক চারিত্রকে ঠিক একই রকমের দেখায় যখন তারা অভিন্ন ধরনে অবস্থান করে। এটা এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই আকৃতির বা ঐ আকৃতির প্রাধান্য শৈল্পিক যোগ্যতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ব্যাপার নয়; বরং তা হচ্ছে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিকোণের ফল, যা পর্যায়ক্রমে লোকেরা বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেছে।[১]

সত্য ও জ্ঞানের পদ্ধতিতেও ঠিক এই ব্যাপারই রয়েছে। Senate Truth এবং বাস্তবতার যে কোন পদ্ধতি বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ বেপরোয়া আচরণ—যে কোন Super-Sensory Reality বা value-এর অস্বীকৃতি। তাতে বোধশক্তি সম্বন্ধীয় সংস্কৃতি, আল্লাহ্র প্রকৃতি ও Super-Sensory Phenomena কুসংস্কার অথবা নিকৃষ্ট ধারণা অনুমান ও ধর্ম হিসেবে গণ্য। তা যদি শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়, তাহলে তা হবে নিছক বৈষয়িক উদ্দেশ্যে এবং তা যদি সহ্য করা হয়, তবে তা হবে ঠিক যেমন অনেক সখ বরদাশ্‌ত করা হয় ঠিক তেমনি। সত্যের এই ব্যবস্থা Sensory world অধ্যয়নের খুব জোরালোভাবে আনুকূল্য করে তার দৈহিক, রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানী সম্পদ ও সম্পর্কসহ। সমস্ত জ্ঞানগত উচ্চাভিলাষ কেন্দ্রীভূত হয় এই সব Sensory Phenomena-তে, তাদের বস্তুগত ও দৃশ্যমান সম্পর্কতায় এবং প্রকৌশলী আবিষ্কার সেই লক্ষ্য আমাদের অনুভূতি সম্বন্ধীয় প্রয়োজন পূরণ করে। মূলত এর সবটাই বস্তুতান্ত্রিক এবং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে তা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার বস্তুগত দিকটির ওপর। শুদ্ধ কিংবা ভুল, ভাল কিংবা মন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় Sensory utility অথবা Sensory Pleasure.

সত্যের খোদায়ী ব্যবস্থা, অন্য কথায়, বিশ্বাস বা প্রত্যয় ইতিবাচক নৈতিক মূল্যমানসম্পন্ন। তা অহীর মাধ্যমে পাওয়া ও খোদায়ী প্রেরণার ওপর ভিত্তিশীল। তা যে নির্ভরযোগ্য ও নিরংকুশ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। নৈতিকতা বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন

১. P.A. Sorokin : The Crisis of Our Age

www.amarboi.org

যুক্তিযুক্ততা নয়, তার একটা বিশেষ অর্থ আছে—আছে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তা সময় ও অবস্থার শর্তাধীন নয়, বরং তা চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।

ইতিহাসের Objective অধ্যয়ন প্রকাশ করে দেবে সত্যের এ ব্যবস্থাসমূহের প্রতিটি বারংবার প্রচলিত ও পুনঃ প্রচলিত হয়েছে। The Sensate truth of Creto Mycenacean সংস্কৃতি খৃস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের গ্রীস Ideational truth-কে পথ করে দিয়েছিল; পরে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্তকার সময়ে তা Sensate truth দ্বারা উৎখাত হয়ে যায়। তারপর খৃষ্টীয় Ideational truth বা Formation of ideas অনুসৃত হয়েছিল ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকার সময়কালে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Ideational truth -আর একবার প্রধান হয়ে ওঠে, যার স্থলাভিষিক্ত হয় তৃতীয় একটা ব্যবস্থা যা ষোল শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। অনুরূপভাবে Sensate truth-এর কথিত প্রগতিশীল সরল প্রবণতা ইতিহাসের গোটা অধ্যায় আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও একটা প্রভাবশালী ব্যবস্থা থেকে অপর ব্যবস্থা পর্যন্ত অব্যাহত দোলা দিতে দেখতে পাচ্ছি।[১]

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঘূর্ণায়মান আন্দোলনসমূহ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে এই সত্যের পক্ষে যে, পৃথিবীর সভ্যতায় বহুসংখ্যক পরিবর্তন সাধিত হওয়া এবং সভ্যতার উত্থান-পতন হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সভ্যতার আত্মা যে সংস্কৃতি, তা নিজেকে ইতিহাসে বহুবার পুনরাবৃত্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সেই একই ধরনের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—সেই একই ধরনের সত্য ও একই ধরনের দর্শন ও ধর্ম সৃষ্টি করেছে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের যে স্থানে সেই সভ্যতা জন্ম নিয়েছে সেখানে পরিবর্তনের কারণে হয়ত তাতে সামান্য পার্থক্য বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু সভ্যতার অন্তঃসলিলা স্রোতধারা এক ও অভিন্নই রয়ে গেছে। Sensory Civilisation-এর আকৃতিতে Sensate Culture আত্মপ্রকাশ করেছে, তা পঞ্চম শতক হোক, বিংশ শতাব্দী হোক অথবা আরব কিংবা ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকান শতাব্দী হোক। বর্তমান সভ্যতার জাঁকালো অট্টালিকা দেখে কিছু লোক এ সিদ্ধান্ত নিয়ে অবাক হয়ে থাকে যে, মানবতা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার ক্ষেত্রে অতীতে কখনই এ ধরনের লক্ষ্যযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এই সরল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, ভূপৃষ্ঠে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক উজ্জ্বলের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল বহু সংখ্যক সভ্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলো বস্তুগত অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে গিয়েছিল বলে স্পষ্টত মনে হয়। সেগুলো তাদের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের হাস্য-মুখর

---

১ P.A, Sorokin :The crisis of our age

www.amarboi.org

প্রাচুর্যের পরিমণ্ডলে। এ সভ্যতা পূর্ণমাত্রার বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর অবস্থিত এবং তার বাইরে থেকে প্রবিষ্ট হয়ে Sensual Pleasure-এর ভাবধারা দ্বারা একাধিকবার দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব করেছে। তার প্রধানতম নীতি সব সময়ই ছিল এই পৃথিবীকেন্দ্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুবিধাবাদ। এই ধরনের একটি Sensory সংস্কৃতির বুনানির মধ্যে মানব জীবন বহু সময়ই তার জীবন নাট্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাসজ্ঞান যদ্দূর যায়, আমরা জানতে পার ি যে, প্রথমে যে জাতি এই সংস্কৃতির জন্য দাঁড়িয়েছিল তারা ছিল আরবের আদ জাতি। এই জাতির জীবন পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টত মনে হয়, এ জাতি শুধুমাত্র বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হতো। তাদের প্রায় সমস্ত পুত্র কন্যার অন্তর স্বার্থ-প্রণোদিত হওয়ার দরুন স্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তাপ ও উচ্ছাস তাদেরকে মৃগীরোগে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। তারপর এই জাতির পতন ঘটে। তখন সামুদ নামের অপর এক জাতি নতুন তেজবীর্য ও উদ্দীপনাসহ ভূ-পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মানসিকতার অবস্থা ছিল এই যে, তা কলংকিত করেছিল বস্তুবাদের কালো বর্ণকেও। "No stretch of imagination, could her members ever think that there is a life beyond this life". ফলে এ জাতিরও কর্মতৎপরতা প্রাথমিক ও মূলগতভাবে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের দিকেই নিয়োজিত হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে রোমানরা অবশ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছিল। জীবনের সংবেদন দর্শন, সংবেদজ নৈতিকতা, সংবেদজ রীতিনীতি তাদের জীবনে পুরোমাত্রায় চালু হয়েছিল। সে যুগের মোটামুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বিলাসিতামূলক। তখন বিপুল জাতীয় সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের করায়ত্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক লোকের দারিদ্র্যের ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। সে পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং অসাম্যকে লঘু করার যে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অমানুষিক নির্যাতন দ্বারা দমন করা হয়েছিল। সেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের প্রতিটি ধারাকে লংঘন করা হয়েছিল। যেখানেই মানুষ সততা, দয়ার্দ্রতা, বদান্যতা ও সহানুভূতির পথ অনুসরণের চেষ্টা করেছে, সেখানেই তারা ভোগ করেছে সীমাহীন নির্মমতা। নির্যাতকরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করেছে, অহংকারের অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে এবং তাদের নির্মমতার একটা অন্তহীন মিছিল চালিয়েছে। এভাবে কিছুকাল অতিবাহনের পর এই রকমের জাঁকালো অট্টালিকা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। অতঃপর সেই একই ধ্বংসস্তুপের ওপর বর্তমান সভ্যতার কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি ক্ষমতার দাপট ও ধন-দৌলতের লোভ অভিন্নভাবে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে।

"The average European—he may be a democrat or a fascist, a

www.amarboi.org

capitalist or a bolshavik, a manual worker or an intellectual—knows only one positive religion, and that is the worship of material progress."

সাধারণ ইয়োরোপবাসী হোক সে গণতন্ত্রবাদী অথবা উগ্রজাতীয়তাবাদী পুঁদিবাদী অথবা একজন বলশেভিক, একজন সাধারণ শ্রমিক অথবা একজন বুদ্ধিজীবি নির্দিষ্টরূপে একটি মাত্র ধর্মকেই তারা জানে তাহল বস্তুবাদী উন্নয়ণের একাগ্র বন্দনা।

বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে, এই জীবনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং আকণ্ঠ ভোগ করা ভিন্ন জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই। এই জীবনকে যতদূর সম্ভব সহজতর করা কিংবা আধুনিক ভাবধারায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে অনুসরণ করাই একমাত্র লক্ষ্য। এই ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরী, সিনেমা, থিয়েটার হল, রাসায়নিক পরীক্ষাগার, নৃত্য-গীত, পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প (hydro-electric works) আর তার ধর্মযাজক হচ্ছে ব্যাংক পরিচালক, প্রকৌশলী, ফিল্মস্টার, শিল্পপতি ও বনিক সম্প্রদায় ক্ষমতা ও সুখের সন্ধানে এই মহাযাত্রার অনিবার্য ফল হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা এবং স্বার্থের সংঘর্ষের স্থানে পরস্পর দ্বারা পরস্পরকে ধ্বংস করা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা যাদের নৈতিকতা কেবলমাত্র বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে বস্তুগত সাফল্য যাদের সুউচ্চ মানদণ্ড।[১]

এর ফল দাঁড়িয়েছে, দুঃখী মানুষকে মান-সম্মান ও অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ দানের পরিবর্তে তার দুঃখজনক অবস্থাকে আরো স্থায়িত্ব দান করেছে। মানবীয় জ্ঞানের প্রবৃদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞান আধুনিক মানুষকে যে শক্তির যোগান দিয়েছে এবং তার বাড়াবাড়িকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয়দান করেছে, তা গোটা সভ্যতার শিল্প-নৈপুণ্যকে বিপন্ন করছে তুলেছে। জাতীয়তার ভাবধারা ব্যক্তিগণের ও জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সহযোগিতাবোধ জাগ্রত করছে না, বরং তা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকার সৃষ্টি করে, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনা সৃষ্টি করছে এবং প্রতিটি জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধতায় প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করছে। দুর্ভাগ্যবশত জাতীয়তাকে একটা অলংঘনীয় খোদায়ী বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছুকেই বরদাশত করা হচ্ছে না। এই লোকদের নিকট তাদের অধিকার ও মর্যাদার অনুকূল যা, তা-ই সত্য এবং তার জন্য যা করা উচিত তা করাই তাদের নৈতিকতা বলে প্রতীত হয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহজ উক্তি হচ্ছে ঃ

১. Islam at the cross roads: Mohammad Asad

www.amarboi.org

"Innocent people and nations are being cruelly sacrificed to the greed for power and supremacy which is devoid of all sense of justice and human consideration."

ক্ষমতা ও প্রভুত্বের লালসার কাছে নিরপরাধ জনগোষ্ঠী ও জাতিসমূহকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দেয়া হচ্ছে, যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সব রকমের ন্যায়বিচার ও মানবীয় বিবেচনা বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইন্দ্রিয়-সুখ ও বৈষয়িক সুবিধা একাকীই আধুনিক মানুষের মনের ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেছে আর তা লাভ করার জন্য সে কোন আইনের ধার ধারার প্রয়োজন মনে করে না। সত্যিকার অর্থে তার কোন বিচার নেই—নেই কোন নৈতিকতা।

সংস্কৃতির এই ভাবধারাই বহুসংখ্যক সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্যে একটা কাঠামোগত সাদৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আদ, সামুদ, রোমান, গ্রীক এবং আজকের ইউরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসমূহ সেই একই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যায় না। এরা সকলে জীবনকে একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে আর তা হচ্ছে বস্তুগত স্বার্থ ও সুবিধা।

এরপর আমরা মানবজীবনের কতিপয় মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো এবং নিজেদের মতো দেখবো, এগুলো বার বার সম্মুখে কি করে উপস্থিত হল? আর কি করে সেই ভাবধারা ও রীতিনীতি পরিগৃহীত হল বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা, যারা সবাই একই সংস্কৃতি উপস্থাপন করছিল? দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই ধরা যাক এবং তার বৃত্তাকারে আবর্তনশীল গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাক।

এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, প্রাচীন সমাজ-স্তরে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তা একথা বুঝায় না যে, সেখানে আদপেই কোন কাঠামো ছিল না; সমাজে তখন শুধু গণ্ডগোল উচ্ছৃংখলতাই বহাল ছিল। তখনকার সময়ে যে সমাজ ব্যবস্থা চলমান ছিল তা হয়তো খুব অপরিচ্ছন্ন ও অ-সংস্কৃত ছিল। কিন্তু একটা কিছু যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিরা তখন নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট নীতিতে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতো, যা তখন চালু ছিল। এই ব্যবস্থাপনায় এক এক ব্যক্তি বাধাবিমুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং সমাজের বুনট এতটা দুর্বল ছিল যে, এক ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির দুর্বার হয়ে দাঁড়াবার পথে কোন প্রতিকূলতা ছিল না। সমাজের ওপর এই এক ব্যক্তির প্রাধান্য বিস্তারের স্তর পরবর্তীকালে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে এক একটি লোক হীন-তোষামুদে দাস হয়ে পড়েছে এক একজন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার, সেখানে সে একাই গোটা রাষ্ট্রের ওপর নিরংকুশভাবে কর্তৃত্ব করেছে। ফলে প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছা পূরণের অগ্নিকুণ্ডে উৎসর্গীকৃত হতে লাগল। দিনগুলো এমনিভাবেই চলে যাচ্ছিল এবং অনেকেই ভাবতে

www.amarboi.org

শুরু করেছিল যে, এই ধরনের সমস্যা অতীতে বোধ হয় আর কোন দিনই উদ্ভুত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ করল ব্যাপারটি অন্যভাবে। এমনকি বর্তমান শতকেও আমরা ব্যক্তি-স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দোদুল্যমান হতে দেখলাম। আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হচ্ছে ব্যক্তি-স্বার্থের ওপর স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করা। জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছেন ঃ

> "In the conduct of human beings towards one another, it is necessary that general rules should for the most part be observed in order that people may know what they have to expect, but in each person's own concern his individual spontaneity is entitled to free exercise, consideration to aid his judgement, exhortation to strengthen his will, may be offered to him, even abtruded on him by others, but he himself is the final judge, all errors which he is likely to commit against advice and warning are far outweighed by the evil of allowing others to constrain him to what they deem his good."

> একে অপরের প্রতি মানুষের আচরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ নিয়ম-বিধি মেনে চলা প্রয়োজন, যাতে তারা জানতে পারে যে, তাদের কি প্রত্যাশা করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থে তার ব্যক্তিগত প্রবণতাকেই অবাধ চর্চার জন্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে সহায়তা, তার ইচ্ছাকে সমর্থন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এমনকি অন্যের দ্বারাও এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সে নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারক। অন্যের উপদেশ এবং সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তার দ্বারা যেসকল ত্রুটি হতে পারে তার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ হবে যদি সে মঙ্গল বা কল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে অন্যের মতামতকে প্রশ্রয় দেয়।

একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সীমাহীন স্বাধীনতা ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ করা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি নিয়ে এলো। সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা পদদলিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্যে গোটা দেশের উপায়-উপকরণ শোষণ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। এ অবস্থায় রাষ্ট্র কার্যত ব্যক্তিগণের শৃংখল ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পর তার একটা বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খুব শীগগীরই এটা অনুভব করা গেল যে, Every man for himself and the devil take the hindmost.

www.amarboi.org

এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি একটি পরিতৃপ্ত সমাজের জন্যে যথেষ্ট ভিত্তি জোগাড় করে দিতে পারে না; বরং তার বাস্তব প্রয়োগে সংঘটিত দারিদ্র্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নীতি পর্যন্ত পরিচালিত করলো। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কার্য পদ্ধতিতেই নয়, মানব জীবনের সকল বিভাগেই তা সংঘটিত হল। ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও শাসন করেছে। এই দুটি ব্যবস্থার অধীন সরকারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা এসে গেল, যা মাত্র এক ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়েছে অথবা খুবই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা। সাধরণ মানুষকে বুঝানো হল ঃ জাতীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী সরকার গঠনে অক্লান্তভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে। বিশেষ করে, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংখ্যাগুরুর চাপ বা নিয়ন্ত্রণ নীতির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে। সেখানে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না; কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নিছক একটা সংস্থা—যা প্রাচীন অর্থে Council নামে অভিহিত—তার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাউন্সিলার হবার অধিকার স্বীকৃত বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এক ব্যক্তির দ্বারা। হিটলার যা-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার কাউন্সিল তাকেই ঠিক মনে করে নিয়েছে—তাদের নিকট তা-ই চিরকাল 'সত্য' হয়ে থাকবে। তৎকালীন জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Herr Frick একদা ঘোষণা করলেনঃ

"To serve Hiteler is to serve Germany, to serve Germany is to serve God."

হিটলারের সেবা করা মানে জার্মানীর সেবা করা, জার্মানীর সেবা করা মানে ইশ্বরের সেবা করা।

কমিউনিস্ট সমাজ জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে গেল এবং তার সবটাই টোটালিটারীয়ান বা সর্বগ্রাসী। এখানে ব্যক্তিরা প্রধানত রাষ্ট্রের জন্য বাঁচে। তার প্রধানকে যে নামেই ডাকা হোক, তার ক্ষমতা কোন ডিক্টেটরের চাইতে একবিন্দু কম নয়। তার কল্পনা-শক্তি যদ্দূর যায়, তদ্দূরই সে একটা নিয়ন্ত্রণ চাপানোর দাবি করে এবং সেই কল্পনা-শক্তি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত আমার বক্তব্যের অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে। মানব ইতিহাসের সেই আদিম স্তরে এই সম্পর্ক মোটামুটি পশুদের মতোই অনিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার যৌন কামনা চরিতার্থকরণে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো বিপরীতা লিঙ্গের ব্যক্তির কাছ থেকে। সময়ের অগ্রগতিতে এক সময় পরিবার-প্রথা স্থাপিত হয়। সেই সাথে বিবাহ প্রথাটাও উন্নতি লাভ করতে থাকে। এটা চলমান স্বাধীনতার ওপর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আরোপে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে; কিন্তু উত্তরকালে তা একটা গুরুত্বর বিপর্যয়ের

www.amarboi.org

সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা প্লেটোর ন্যায় একজন উচ্চমানের দার্শনিকের হাতে। তিনি প্রস্তাব করলেন ঃ

"All healthy men and women should at one time be brought together at a certain place and be allowed to indulge in sexual intercourse."

সকল স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং নারীকে এক সময়ে একত্রে একটি নির্দিষ্ট যায়গায় আনা হোক এবং ব্যবস্থা করা হোক যৌন সঙ্গমে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা চরিতার্থ করার।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এভাবেই বাচ্চারা নির্দিষ্টভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর স্নেহ-বাৎসল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তাদের নির্বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই এই Absurdity-র আত্মহত্যামূলক পরিণতি জনগণের নিকট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন তারা বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা শুরু করে দেয়।

এই দিক দিয়ে বিগত তিনটি শতাব্দীকাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। বলা হয়েছে ঃ

" In the first decade of Bolshevist administration there was a understanding that sexual intercourse was a personal matter, taking place by mutual consent between men and women of the same or different races, colour or religion, for which no religion or other ceremony was required whilst even official registration of the Union was entirely optional." (Where Sprenglarism Fails)

বলশেভিক শাসনের প্রথম দশকে এই মর্মে একটা ধারণা ছিল যে যৌন সঙ্গম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা একই অথবা বিভিন্ন গোত্রের, ধর্ম ও বর্ণে নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সমযোগিতার ফলে ঘটে থাকে, যার জন্য কোন ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, যখন এমন কি রাষ্ট্রিয়ভাবে নিবন্ধন করাটাও নিতান্ত ঐচ্ছিক।

দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আমরা একটা ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কামুকদের প্রতি লেনিনের কোন সহানুভূতি ছিল না। রুশ বিপ্লবের পর প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যৌন মিলন একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপার ক্ষুধার পর খাদ্য গ্রহণ। তা পিপাসার দরুন একগ্লাস পানি পান করার কাজটির অধিক কিছু নয়। সামাজিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর অভিমত যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্তত কমিউনিস্ট পার্টির জন্যে প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

www.amarboi.org

"Is marriage a private relation between two legged animals that interest only themselves, and in which society has no right to meddle."

বিবাহ একটি নিজস্ব সম্পর্ক, দুটি দু'পেয়ে জন্তুর মধ্যে, যা শুধুমাত্র তাদেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, এর মধ্যে সমাজের কোন অধিকার নেই হস্তক্ষেপ করার।

Ryazonov লিখেছেন ঃ "We should teach young communists that marriage is not a personal act, but an act of deep social significance. Marriage has two sides, the intimate side and social."

তরুন কমিউনিস্টদেরকে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া উচিত যে, বিবাহ নিতান্তই কোন ব্যক্তিগত কর্ম নয় বরং কাজটি গভীরভাবে সামাজিক গুরুত্ব বহনকারী। বিবাহের দু'টি দিক রয়েছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক।

আর Soltz বলেছেন ঃ and we must never forget the social side. We are against a profligate or disorderly life. Because it affects the children.

এবং অবশ্যই আমরা কখোনও সমাজিক দিকটা ভুলে যাবনা। আমরা অগোছালো জীবনের বিরোধী; কেননা তা শিশুদের ক্ষতি করে।[১]

এরপর পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইতিহাস আমাদের বলছে ঃ 'এমনকি যে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী সিস্টেমের গভর্ণমেন্ট এ যুগের অবদান হিসেবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, তা-ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিমের গভীরতম পর্যায়ে প্রচ্ছন্ন নিউক্লিয়াস হিসেবে বিদ্যমান।

অনুরূপভাবে, একটি সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি এবং তার সমগোত্রীয় সমস্যাবলী সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সভ্যতা যদিও জন্মে ও মরে যায়, কিন্তু সংস্কৃতিতে মৌলিকভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। তার আন্দোলিত হওয়ার ক্ষেত্র বদলে যেতে পারে বটে; কিন্তু তার মৌল ভাবধারা সর্বত্র নিজেকে প্রকাশ করে। এখানে আত্মার স্থানান্তর আছে, যা সংস্কৃতির ব্যাপারে কাজ করে। মানবীয় যে কোন গোষ্ঠীবদ্ধতায়—যে কোন স্তরে—মনের কোণে একটা নির্দিষ্ট আচরণ অবলম্বিত হতে পারে—তা সুবিধাবাদী হোক কিংবা অন্য কিছু। তদনুযায়ী সে তার জীবনকে পুনর্গঠিতও করতে পারে—যেমন মানব প্রকৃতি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে সময়ের, অবস্থার ও ভাগ্যের শত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও। তাই তার সমস্যাবলীও ঠিক সেই পুরাতনই রয়ে গেছে। পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে তা শুধু বস্তুজগতে। দিনের পর

১. Sidney and Biatrice Webbes : Soviet Communism, A New Civilization

www.amarboi.org

রাত্রির অভিন্ন বাহ্য প্রকাশ এবং রাত্রির পর দিনের পুনরাগমন শুধু ঘটছেই না, সেই অপরিবর্তিত বাহ্য প্রকাশ মানবীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই অভিন্ন অবস্থা বিরাজিত রেখেছে। যেমন পৃথিবীর কতক অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে রাত্রিকালে, অনুরূপভাবে কতকগুলো দেশ ও জাতি Sensate culture-এর ভৌতিক ডানার নীচে চাপা পড়ে থাকে। রাত্রির অবসানে যেমন দিনের আলোর স্পর্শ ঘটে, Ideational সংস্কৃতির নব প্রভাতও অনুরূপ রীতিতে উদিত হতে থাকে। তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে. যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতে যা কিছুই ঘটুক, তা প্রকৃতির অনমনীয় বিধান মেনে চলে—যা উপেক্ষা বা লংঘন করার কোন সুযোগই নেই। প্রকৃতি তার দায়িত্ব পালন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে; কিন্তু মানবীয় তৎপরতার অবস্থা সেরূপ নয়। তাকে দেয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং তা প্রয়োগের স্বাধীনতা। সে পসন্দ করতে পারে, বাছাই করতে পারে, গ্রহণ বা বর্জন তথা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী। কাজেই কোন সংস্কৃতির যদি উত্থান হয় কিংবা পতন ঘটে, তবে তা সবই তার অনুসারীদের গ্রহণ বা বর্জনের কারণে। তাদের উত্থান ও অগ্রগতির বা পতনের কোন নির্দিষ্ট সময় আগে থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারেনা। মানব-সত্তার নৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা তার অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। সাফল্য আসে শুধু সেই সমাজ ব্যবস্থার জন্যে যা পবিত্রতা ও ন্যায়পরতার বৃহত্তর ব্যবস্থা উপস্থাপন ও পরিগ্রহণ করে। কিন্তু এই পবিত্রতা ও ন্যায়পরতা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিগণের সচেতন ও ইচ্ছামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে, যারা একত্রিত হয়ে একটা সমাজ-সংস্থা গড়ে তুলেছে। কাজেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যে সম্ভব, তা এক অনস্বীকার্য সত্য। এই সত্য যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার মতই গোঁড়ামী দেখানোর চেষ্টা করে মাত্র।

বস্তুত, এটা বিশ্বমানবতার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, Sensate বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় মানুষকে "merely a complex of electrone and protons, an animal organism, a reflex mechanism, a variety of stimulus response relationship or a psyco-analytical bag filled with psycho-logical libido.' (ইলেকট্রনও প্রোটনের একটি যৌগিক ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি পাষবিক দেহ সংগঠন আর একটি জীবন যন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ক্রিয়া পতিক্রিয়া সম্পর্কের একটি বিচিত্র প্রকাশ অথবা একটি মনঃসমিক্ষণ গত ব্যাগ যেটি নানা বিদ্যাগত কর্মপ্রেরণা বা কর্মশক্তিতে ভরা।) বলে আখ্যায়িত করেছে।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ একটা নিছক biological organism-এ পরিণত হয়ে গেছে। তাই তো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মানবীয় জীবনও জন্ম-মৃত্যুর সেই একই আইন মেনে চলছে, যা পশু জীবনের ওপরও সমানভাবে কর্তৃত্ব করছে। এটা অনস্বীকার্য যে, যা পতনের দিকে চলে ও শেষ হতে থাকে তা অবশ্যই শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং

শেষ পর্যন্ত তা মরবেই। প্রধানত জীববিদ্যা সংক্রান্ত সাদৃশ্য (Analogy)-ভিত্তিক এসব তত্ত্ব ভিত্তিহীন। কেননা মানুষ কোনক্রমেই "পশু" নয়, পশুর উর্ধ্বে তার স্থান। তার ভিতরে রয়েছে কাজের তাগিদ, রয়েছে নিজেকে চালিত করার চেতনা। এখানে এমন কোন অভিন্ন আইন নেই যে, সংস্কৃতি ও সমাজকে বাল্যকাল, পরিপক্কতা, বার্ধক্য ও মৃত্যু এই স্তরগুলো পার হতেই হবে। উপরন্তু এই বহু পুরাতন তত্ত্বের কোন প্রবক্তা এমন কিছু দেখান নি, যদ্দ্বারা সমাজের এই বাল্যকাল কিংবা সংস্কৃতির বার্ধক্য অর্থাৎ প্রতিটি যুগ বা স্তরের বিশেষ চারিত্র্য বুঝা যেতে পারে। একটা যুগ কখন শেষ হবে ও পরবর্তীটা কখন শুরু হবে, একটা সমাজ কি ভাবে মরে এবং সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যু বলতে কি বুঝায়? এগুলো নিছক অবান্তর ও অবাস্তব দাবি মাত্র। ঠিক যেমন এক ধরনের জীবন যাত্রার অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হওয়া থেকে কখনো তার মৃত্যু বুঝায় না। বস্তুত কোন সংস্কৃতির মৌল আকার-আকৃতি ও ধরনের অপরটির স্থলাভিষিক্ত হওয়া সেই সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যুর সমার্থক নয়, বরং তা এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। আসলে যে ভুল ধারণার দরুন দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত মনীষীরা ভ্রমের মধ্যে পড়েছেন—তা হচ্ছে সংস্কৃতিকে একটি সুনির্দিষ্ট organism রূপে দেখা—তাদের কাছে সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সূত্র না থাকা। মূলত সংস্কৃতি একটা organism নয়, তা একটা আন্দোলন তথা চিরন্তন গতিশীলতা। ঐতিহাসিক তথ্য এই সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, একটি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট আলোকধারা যখন গাঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন তা কদাচিৎ শুকিয়ে যায়। তা জনগণের চিন্তা ও জীবনধারার ওপর নিজের প্রভাব অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায় এবং একটি নতুন সংস্কৃতি উপস্থাপন করে। উপসংহারে Briffault লিখিত Making of Humanity গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায় ঃ

> "Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world; but its fruits were slow in ripening—not until long after Moorish culture had sunk back into darkness did the giant which it had given birth rise in his might, other and manifold influences from the civilisation of Islam communicated its first glow to European life.'
>
> "For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanant distinctive force of the modern world, and the supreme source of its victory, natural science arose in Europe as a result of a new spirit of enquiry of new methods of investigation of the method of experiment,

www.amarboi.org

observation measurement, of the development of mathematics in form unknown to the Greeks. That spirit and methods were introduced into European world by the Arabs."

"আধুনিক বিশ্বে আরব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বিজ্ঞান; কিন্তু এর সুফল পরিণতি বিলম্বে হয়েছিল। তবে বেশিদিন পরে নয়, যখন স্পেন-বিজয়ী আরবদের সংস্কৃতি পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন এই বিজ্ঞান প্রভূত শাক্তি নিয়ে এক বিশাল সফলতা দেখিয়েছিল, ইসলামী সভ্যতার বহুবিধ প্রভাব এই বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলো ইউরোপীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।"

"যদিও ইউরোপীয় উন্নয়নের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির চরম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, আধুনিক বিশ্বের মধ্যে স্থায়ী এবং বৈশিষ্ট্যমূলক শক্তি হিসেবে খ্যাত ঐ বৃহৎ শক্তির যে অংশটির মধ্যে এর প্রভাব এত বেশী স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ যা অন্য কোথাও তেমনটা মনে হয় না এবং এর বিজয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যার উদ্ভব ঘটেছে ইউরোপে। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গ্রীকদের নিকট অপরিচিত ফর্মে গণিতের যে উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদির পদ্ধতিতে অভিনব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তদন্ত চালানোর নব্য চেতনার ফলে এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। ইউরোপীয় বিশ্বে আরবরাই সেই চেতনা এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল।

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিটি জাতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটা বিশেষ দেশের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপনকারী লোকদের উত্তরাধিকারই হয় সেই দেশের সংস্কৃতি। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। সমগ্র মানব বংশের প্রতিই তার সমান আহ্বান। কোন বিশেষ জাতি, বংশ, গোত্র, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই; তার দৃষ্টিকোণ বিশাল, বিস্তীর্ণ, ব্যাপক ও সার্বিক। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপরই তার লক্ষ্য নিবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ব্যক্তিগত ও বংশীয় বিশেষত্বের উৎকর্ষ বিধানের জন্যে চেষ্টা-সাধনা চালাতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। আর তার ফলে যে সাংস্কৃতিক ফসল পাওয়া যায়, তার প্রতি তার নেই কোন অনীহা।

একালে শিল্পকলা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর সীমাহীন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এগুলোর ওপর পূজা-উপাসনার মতোই সংবেদনশীলতার এক মোহময় আবরণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরণের বাড়াবাড়ি দেখে যে-কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনা। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ বিষয়গুলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা হঠাৎ ঘটে-যাওয়া বিপ্লব রূপে গণ্য হতে পারে কিংবা তাদের জন্যে তা জীবনের একটা লক্ষ্য হতে পারে হয়ত-বা। কিন্তু মুসলমানরা একে জীবন লক্ষ্য রূপে গণ্য করতে পারে না। তবে এসব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প পর্যায়ের কীর্তিসমূহের প্রতি মুসলমানদের মনে কিছুমাত্র অনীহা অথবা ঘৃণা রয়েছে তাও মনে করার কোন কারণ নেই[১]। মুসলমানরা এগুলোকে খোদার অনুদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে এবং নিছক একটা সহায়ক ও বিনোদনমূলক উপাদানই মনে করে। অথবা এগুলো হচ্ছে পথিকের চলার পথের সহজাত আয়েশ ও বিশ্রাম লাভের উপকরণ মাত্র, নিজেই কোন লক্ষ্য বা মনজিল নয়। বড়জোর এগুলো উদ্দেশ্য লাভে ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সাহায্যকারী মাত্র। মুসলমানরা এই সাহায্য ও আরাম-আয়েশের পূজারী আদৌ নয়। এ ধরণের কাব্য-সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলামূলক দুর্লভ সম্পদকে দুটি দিক দিয়ে সাহায্যকারী ও বিনোদনমূলক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বিশেষত কাব্য-সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প উভয় দিকেই গণ্য হতে পারে; অর্থাৎ তা যেমন সাহায্যকারী, তেমনি বিনোদনমূলকও।

---

১. অবশ্য ইসলামের তওহীদী চেতনা ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে কোন সাহিত্য ও শিল্পকলা আপত্তিকর বিবেচিত হলে সেটা ভিন্ন কথা।—সম্পাদক

www.amarboi.org

সমাজবদ্ধ মানব-সমষ্টির মধ্যে মুসলিম জাতির লক্ষ্য, পথ-প্রদর্শক ও আলোক-বর্তিকা এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ তাদের চূড়ান্ত জীবন লক্ষ্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তাদের পথ-প্রদর্শক। তাদের অগ্রগতি সাধিত হয় আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদের নিষ্কলংক আলোকের দিগন্তপ্লাবী উজ্জ্বলতায়। ফলে তার (কুরআনের) উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার প্রতিফলনে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্মেষ ঘটে কেবলমাত্র তা-ই হতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমান নামধারী লোকেরা অতীতে কোন এক সময় যে সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল অথবা ভিন্নতর আদর্শানুসারী জীবন যাত্রার ফলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তা বুঝায়না কখনো। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক ও সামষ্টিক কল্যাণ।

মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা। ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে এরই সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট। এই বিকাশমান ধারাবাহিকতায় এমন কোন পরিবর্তন বা পর্যায় যদি এসে পড়ে, যা কুরআন মজীদ বা রাসূলের সুন্নাহ অনুমোদিত নয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে পরিবর্তন বা পর্যায় ইসলামের মধ্য থেকে সূচিত হয়নি, তার উৎস রয়েছে বাইরে। তাই তা ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন-ধারার পরিণতি বা প্রতিফলন নয় এবং সে কারণে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা তা গ্রহণও করতে পারে না—তা বরদাশত করে নেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা তার পরিণতিতে মুসলিম জনতা সার্বিকভাবে ধ্বংস, বিপর্যয় ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

শিল্পকলা নামে পরিচিত একালের মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মানসহ কয়েক ধরনের সৃষ্টিকর্ম ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে যে প্রতিমা-পূজা ও মুশরিকী ভাবধারা নিহিত মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ তারই চরিতার্থতা ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমটির সঙ্গে রয়েছে দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাদৃশ্য। এ কারণে শিল্পকলার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদিকে নির্মল করে তোলা মানব জাতির উৎকর্ষ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অপরিহার্য। এই দুনিয়ার জীবনকে কেবলমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, রূপ-শোভামণ্ডিত ও চোখ-ঝলসানো চাক্‌চিক্যে সমুজ্জল করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হতে পারে না। মানব জীবনকে ধন্য ও সুসমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বিত পথ ও পন্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।

সংস্কৃতির কোন কোন উচ্চতর নিদর্শন ও প্রতীক, তা যতই উন্নত মানসম্পন্ন হোক, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল সংস্কৃতির দর্পন হতে পারে না। কতিপয় ব্যক্তির এইরূপ সৃষ্টিকর্ম অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি রূপে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা তাদের প্রধান অংশই পশ্চাদপদ, দীন-হীন ও নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

www.amarboi.org

অতএব, কথিত শিল্পকর্মকে অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি নয়; বরং হীন মন-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ রূপে গণ্য করতে হবে।

পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় একটা প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বাগ্-বিতণ্ডা চলেছিল। প্রশ্নটি ছিল এই, একটি কক্ষে যদি একটি নিষ্পাপ শিশু থাকে আর সেখানেই এক মূল্যবান, দুর্লভ ও অনন্য গ্রীক ভাস্কর্য প্রতিমা থাকে আর হঠাৎ কক্ষটিতে আগুন ধরে যায় এবং সে আগুন গোটা কক্ষটিকে গ্রাস করে ফেলে আর সময়ও এতটা সামান্য থাকে যে, তখন হয় শিশুটিকে রক্ষা করা যেতে পারে, না হয় ভাস্কর্যের নিদর্শনটি, তখন এ দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়—মানব শিশুটিকে কিংবা ভাস্কর্য শিল্পটিকে? এই প্রশ্নটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যে জবাব দিয়েছিল তা ছিল মানব শিশুটির পরিবর্তে ভাস্কর্যটিকে রক্ষা করার পক্ষে। এটা ছিল মানব শিশুটির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন এবং শিল্পকলার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই জনমতকে কি কোনক্রমে বিবেকসম্মত ও যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায়? তা যায়না। কারণ ঃ

১. যে শিশুটিকে একটা নিষ্প্রাণ-নির্জীব প্রস্তর মূর্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জ্বলে-পুড়ে মরার জন্যে ছেড়ে দেয়া হল সে একদিন সমাজের এক বিরাট কল্যাণ সাধন করতে পারতো হয়ত-বা। আর সে জীবনে বেঁচে থেকে প্রস্তর মূর্তির চাইতেও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিস সৃষ্টির কারণ হতে পারত।

২. সে প্রস্তর মূর্তিটি একটা বিরাট ও উত্তুঙ্গ সভ্যতার খুবই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ মাত্র। সেটি জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে মানবতার এমন কি ক্ষতি সাধিত হতো? কিছুই না।

৩. নৈতিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে এ প্রস্তর মূর্তিটি নিতান্তই গুরুত্বহীন একটি বস্তু, অথচ সংস্কৃতিতে নৈতিক মূল্যমানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য ঘটনায় দেখা গেল, মানুষের তুলনায় প্রস্তর মূর্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর প্রস্তর মূর্তির তুলনায় মানুষ অতীব তুচ্ছ—মূল্যহীন! পাশ্চাত্য সুধীদের এই মনোভাবের ফলে মূর্তি পূজার একটা নবতর সংস্করণ প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয়। ইসলাম মানবতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করে। মানুষের কোন মূল্যবান শিল্পকর্মের জন্যে একটা মহামূল্য মানব সন্তানের জীবন উৎসর্গ করা ইসলামের ধারণাতীত। মানুষের দুর্লভ কীর্তির প্রতি এই আসক্তি ও ভক্তি কার্যত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে খোদায়ী বিধান হতে স্বতন্ত্র ও নিঃসম্পর্ক করে নেয়, তখন তার ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সীমাহীন হয়ে যায়। তখন চূড়ান্ত ধ্বংসই হয় তার অনিবার্য পরিণতি। এই দৃষ্টিকোণের ধারকরা বলেন, শিল্প-সৌন্দর্য ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন

www.amarboi.org

মানব সভ্যতা পতনোন্মুখ। একারণেই ভাস্কর্যের নিদর্শনটিকে রক্ষা করা অপরিহার্য। কেননা অতীতের দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এইটুকু যুক্তিতে মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবাকে কোন মানুষই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না।

ইসলামের কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ ব্যক্তির অন্তরে একদিকে শুভেচ্ছা ও শুভাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে অনুতাপ ও তিরস্কারের ভাব জাগ্রত করে আর এটাই হচ্ছে সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রধন উপায়। যাকাতের মাধ্যমে এই চেতনা কার্যকর হয় মূলধনের হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে আর তার ফলেই মূলধন পবিত্র ও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ইসলাম জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। তাতে ধর্মচর্চা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতিই ইসলামের কাম্য। এখানে শুধু ভালো ও মন্দ তথা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্যই স্বীকৃত। বৈরাগ্যবাদ বা দুনিয়াত্যাগের কোন অনুমতি বা অবকাশ ইসলামে নেই। প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে বহুমুখী কর্তব্য ও দায়িত্ব। সফল ও সার্থক কার্যাবলী সংঘটিত হয় সে সব সমর্পিত কর্মক্ষমতার দরুন, যা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা বাস্তব, অবিমিশ্র ও সারবত্তাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী ব্যবস্থা; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তা অবশ্য অনুসরণীয়। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের নির্দিষ্ট সময়টুকুতে তার অনুসরণ নিতান্তই অর্থহীন।

ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে আল্লাহ্‌র কোন স্থান স্বীকৃত নয়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ হল বৈষয়িক জীবন ও রাজনীতিতে আল্লাহ্‌র কোন অংশ নেই। কিন্তু এ বিশ্বলোকে এবং মানব সমাজে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিমিষে এমন অসংখ্য ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে, যে বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী কোন মানুষ করতে সক্ষম নয়—তা কাঙ্ক্ষিত বা প্রার্থিতও নয়। এ ধরনের ঘটনাবলীর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ মানুষের সব পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনাকে চুরমার করে দেয়—ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তার সব স্বপ্ন-সাধ। কিন্তু আল্লাহ্‌কে বা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে সে সবের কি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে?

মধ্যযুগীয় ধর্মচর্চা হচ্ছে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর গল্প-কাহিনী, রসম-রেওয়াজ, উপাসনা-আরাধনা ও উপাসনালয়-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি সমন্বিত। জগতের রূঢ় বাস্তবতা, বৈষয়িক তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা থেকে পলায়নের পথ হিসেবেই তা অবলম্বিত হতো। সেকালের লোকদের অভিমত ছিল, বাস্তব জীবনকে অবশ্যই ধর্মহীন বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে হবে। আর কৃচ্ছ্রসাধক ও একনিষ্ঠ পূজারীদের তা-ই হচ্ছে রক্তিম স্বপনের পরাকাষ্ঠা। এ দৃষ্টিকোণের মারাত্মক প্রভাব আজ দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে

www.amarboi.org

প্রতিফলিত। হীন স্বার্থের কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে মানুষ আজ সমাজের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। ক্ষমতাবানরা মানুষের মৌলিক ও বৈধ অধিকার হরণ করেছে নিষ্ঠুরভাবে। জনগণের রক্ত পানি করে উপার্জন করা বিত্ত-বৈভবের ওপর চলেছে নির্মম লুটপাটের পৈশাচিকতা। সব দুষ্কর্মের পশ্চাতে ব্যক্তি-স্বার্থই ছিল প্রধান নিয়ামক। কিন্তু যারা ভালো মানুষ, সত্যই তারা ব্যক্তি-স্বার্থকে সামষ্টিক স্বার্থের জন্যে উৎসর্গ করে। কেননা তাতেই নিহিত রয়েছে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ ও সাফল্য। ব্যক্তিবাদের ওপর সমষ্টিবাদের প্রাধান্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ হচ্ছে চরম লক্ষ্যের নিকটবর্তী পর্যায়। নৈতিক ভিত্তিসমূহ তখন হয় পাকা-পোক্ত, অবিচল ও অনড়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও নিত্য-নব উদ্ঘাটন তার ভিত্তিমূলের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীন-ভিত্তিক। এই দ্বীনী ভাবধারাই তার প্রাণ-শক্তি ও আসল নিয়ামক। দ্বীনী ভাবধারাশূন্য সংস্কৃতি কখনও ইসলামী পদবাচ্য হতে পারে না—হতে পারে অন্য কিছু । এখানে প্রতিটি কাজ, পদক্ষেপ বা অনুষ্ঠানের বৈধতা দ্বীন-ইসলাম থেকে গ্রহণীয়। কেননা তা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধি-বিধান ও নির্দেশনার সমষ্টি। জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে পথিকের যাত্রা সুগম করে ও তাকে অগ্রগমনের প্রেরণা দেয়। বিশ্বনবীর বাস্তব জীবনে ও কর্ম-ধারায় তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। তাতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি নিছক কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়। বাস্তব কর্ম সম্পাদনই তার আসল কথা আর জাতীয় সাফল্য ও সার্থকতা লাভ কেবলমাত্র এভাবেই সম্ভবপর।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মানব জীবনে তার কার্যকারিতা উপলব্ধি করার জন্যে আরও একটা দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কুরআন মজীদে 'তায্‌কিয়া' শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষায় ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আমাদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা (conception) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেন ঃ

> 'তায্‌কিয়া' অর্থ পবিত্র হওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ করা—অন্যায় ও কদর্যতা পরিহার করে চলা, যার ফলে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রাচুর্য সাধিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ সফলতা পেল সে, যে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করল। একারণে যাকাত শব্দের অর্থ কখনও বলা হয় প্রবৃদ্ধি, অধিক্য বা প্রাচুর্য আর কখনও করা হয় পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা-আবর্জনা দূর করা। কিন্তু সত্য কথা হল যাকাত শব্দে এ দুটি অর্থেরই সমন্বয় ঘটেছে। অন্যায় ও ময়লা দূর করা যেমন এর অর্থ তেমনি কল্যাণ ও মঙ্গল বৃদ্ধি করাও এর মধ্যে শামিল।

www.amarboi.org

এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায় ঃ কুরআনে যে 'তায্‌কিয়ায়ে নফস' (আত্মশুদ্ধি)-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে এক সঙ্গে কয়েকটি কথা নিহিত রয়েছে ঃ

১. তায্‌কিয়ার আসল অর্থ মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান করা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ—উচ্চকিত করা, সতেজ বা ঝালাই করা, ময়লা-আবর্জনা-দুর্বলতা ও পংকিলতামুক্ত করা এবং তাকে পূর্ণ পরিণত করে তোলা। দেহ ও আত্মা, মন ও মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুন জীবন পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে—পারে সফল ও সার্থক হতে, তা অর্জনের সঠিক চেষ্টা-সাধনাই আত্মার তায্‌কিয়া। আর ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যও তা-ই।

২. জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মানে সর্বপ্রকারের অন্যায়, অশ্লীলতা ও পংকিলতা থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ (Purification)। কেননা এছাড়া জীবনের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন অসম্ভব। বাস্তবতার দৃষ্টিতেও এ জিনিসটি জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব ও মহিমা-মাহাত্ম্য অর্জনের আগেই অর্জিত হওয়া উচিত। পবিত্রকরণ ও সংস্কার সাধন জীবনের 'তায্‌কিয়া' ও পূর্ণত্ব বিধানের প্রাথমিক কাজ। এইসব কারণে অনেক সময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ এবং সংস্কার সাধনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এই তায্‌কিয়া শব্দ।

এখানে নফসের বা আত্মার তাযকিয়া বলে যা কিছু বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তাতে কেবল মানব জীবনের খারাপ দিকের তাযকিয়া বা পবিত্র-পরিচ্ছন্নকরণই লক্ষ্য নয়—বরং সমগ্র মানব সত্তাই এর ক্ষেত্র। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَاسَوَّاهَ -فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন; অতঃপর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত করল। (সূরা আশ্‌-শামস ৭-১০)

এ আয়াতে মানুষের গোটা সত্তাকেই সামনে রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াতেও মানুষের সমগ্র সত্তার পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন এবং উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা বিধান অর্থেই এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

৩. আত্মার তাযকিয়া সম্পর্কে কুরআন যে ধারণা পেশ করেছে, তা হল Self-perfection-এর ধারণা। এর ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর সংস্থাপিত। একটি হচ্ছে মানুষের রূহ বা আত্মা—তথা মন ও মগজের সমস্ত শক্তির একটা সমন্বিত ও সুসংহত

www.amarboi.org

রূপ। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকর্মে মানুষের নানাবিধ যোগ্যতা ও প্রবণতায় এক উচ্চ মানের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। এ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্তার আত্মা ও বস্তু, জ্ঞান ও বিবেক, বাহির ও ভিতরের মাঝে আল্লাহ্ কোন বিরোধ বা বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। এসবের মাঝে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য রয়েছে বটে; কিন্তু সে শ্রেণীগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ স্বীকৃত নয়। একটির উৎকর্ষের জন্যে অপরটিকে অবলুপ্ত করা বা অবদমন (Suppression) করা জরুরী নয়; বরং একটির পূর্ণত্ব অপরটির উন্নয়নের জন্যে পরিপূরক।

এ জন্যেই কুরআনের শিক্ষা হল এই কামনা করা ঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গল দাও এই দুনিয়ায় এবং পরকালেও আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।

(সূরা বাকারা ঃ ২০১)

দ্বিতীয় বিষয় হল, মানুষের সমগ্র সত্তার যুগপৎ উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য এবং কাম্য। এ সত্তার প্রতিটি অংশই মহামূল্য এবং তার সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়নই বাঞ্ছনীয়। দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক পূর্ণত্ব—এর প্রতিটিই নিজ নিজ সীমার মাঝে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চিন্তা, মন ও মগজ, চরিত্র ও স্বভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচি-প্রবণতা এবং দেহ ও মনের সব দাবির ভারসাম্যপূর্ণ পূরণ এবং সুসমঞ্জস সংস্কার সাধন ও পূর্ণত্ব বিধানকেই বলা হয় 'তায্কিয়া' এবং তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। মনের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে দৈহিক সীমা লংঘন কিংবা দৈহিক চাহিদা পূরণে মনের তাগিদ উপেক্ষা করা ইসলামের সংস্কৃতি চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্তে এ দুটির মাঝে তারতম্য করা যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে তাহলে দেহের পরিবর্তে মনের গুরুত্ব—বস্তুর তুলনায় আত্মার এবং প্রস্তর বা ভাস্কর্য অপেক্ষা মানুষের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।[১]

মোটকথা, কুরআনের যেসব স্থানে 'তায্কিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব স্থানে সংস্কৃতি শব্দ বসিয়ে দিলে যেরূপ দাঁড়ায় ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে তা-ই বক্তব্য। অন্য কথায়, কুরআনের 'তায্কিয়া' শব্দের যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হল তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি—ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা।

১. সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় ইদানীং 'অপসংস্কৃতি' বলে একটি শব্দের ব্যবহার প্রায় লক্ষ্য করা যায়। এর সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। তবে সংস্কৃতির নামে যাকিছু মানুষের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা নৈতিকতা রুচিবোধ, শালীনতা ইত্যাদিকে কলুষিত করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি বলতে পারি।—সম্পাদক

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান (Values)। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে সে সব মূলনীতি, যার ওপর আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থিতি নির্ভরশীল। সে মূলনীতিগুলোকে ব্যাপকভাবে গণনা করলে তার সংখ্যা অনেক হবে; তবে পরে আমরা সংক্ষেপে বিশিষ্ট মূলনীতিসমূহের উল্লেখ করব।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হল একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা গোটা বিশ্বলোকের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম—হেদায়েতের সর্বশেষ বিধান।

ইসলামী মতাদর্শে তওহীদ বিশ্বাস হল সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই (لا إله إلا الله)—এই ঘোষণাটি হচ্ছে তওহীদের সার নির্যাস, অন্য কথায় আল্লাহ্কে প্রকৃত মা'বুদ রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁরই নিরংকুশ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করার পর মানুষ দুনিয়ায় খোদায়ীর দাবিদার অন্যান্য দেব-দেবী, অবতার, রাজা-বাদশাহ এবং সম্পদ-দেবতার দাসত্বের অভিশাপ থেকে চিরকালের তরে মুক্তি লাভ করতে পারে। তওহীদের এ আকীদার দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য-বিরোধ, আর্থিক অবস্থাভিত্তিক শ্রেণী-পার্থক্য, ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাশত করতে পারেনা; অথচ এসবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী সংস্কৃতির একমাত্র দৃষ্টি। আল্লাহ্কে এক ও লা-শরীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকারসম্পন্ন মেনে নেয়া—শুধু মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও সেই অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবীও তেমনি সম্মানার্হ যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক। নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আলী ক্লে ও শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ মার্মাডিউক পিক্‌থল অভিন্ন শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন

www.amarboi.org

অবাধে পূরণের অধিকারী। এ অধিকার সত্যিকারভাবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করাই ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ রীতি এবং সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। মানুষের জীবন অবিভাজ্য; বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী অংশ বা বিভাগে তাকে ভাগ করা যায় না। মানুষের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে দেহ ও আত্মা তথা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐকিক কল্যাণের ওপর। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে একাকার করে দেয়াই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য, যদিও দুনিয়ার অনেক সংস্কৃতিরই লক্ষ্য এ দুয়ের মাঝে বিরোধ ও দ্বৈততাকে বজায় রাখা এবং একটিকে নস্যাৎ করে অপরটির পরিতৃপ্তি সাধন।

Hedonism বা ভোগবাদী ও আনন্দবাদী চিন্তা-দর্শনে বিশ্বাসীরা আজো আত্মার দাবিকে অস্বীকার করে এবং আত্মার মর্যাদা ও প্রবণতাকে অমর্যাদা করে কেবল দৈহিক সুখ ভোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। তাদের মূল মন্ত্র হল ঃ Pleasure is the highest good—'সুখ ভোগ বা আনন্দ লাভই শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ।'

কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি দেহ ও আত্মার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সাম্য রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এর কোনটিকে অস্বীকার করা কিংবা একটি দিকের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং সেদিকেই গোটা জীবনকে পরিচালিত করা ইসলামের সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপন্থী। এ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিবাদীদের লক্ষ্য করেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا –

এমনিভাবেই তোমাদেরকে আমরা মধ্যম নীতির অনুসারী করে বানিয়েছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হতে পারে তোমাদের পথ-প্রদর্শক। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

অন্যকথায় রাসূলের আদর্শ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এ ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ অনুসারীরাই বিশ্বমানবের নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারে সংস্কৃতি ও সভ্যতা উভয় দিক দিয়েই। আর একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতিই পারে এক ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম দিতে। সে কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি না একথা বলেছে যে, মানুষ বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করবে এবং দুনিয়ার কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দূরে নিবিড় জঙ্গলে কিংবা খানকার নির্জন পরিবেশে আশ্রয় নেবে আর না এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সে কেবল দুনিয়ার কাজকর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে—তাতেই মশগুল হয়ে থাকবে একান্তভাবে; বরং তার শিক্ষা হল, মানুষ দুনিয়ার জীবনকে সঠিক পন্থায় এবং পুরোমাত্রায় যাপন করে

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে; এটাই হল আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষের একমাত্র কাজ। ইসলামী সংস্কৃতি এ উভয় দিকে নিহিত অযৌক্তিক প্রবণতা ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে পরিহার করে এবং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ দুনিয়ায় থেকেও দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং দুনিয়াবিমুখ হয়েও দুনিয়া ভোগ করা—এই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। রসূলে করীম (স) একথাই বুঝিয়েছেন তাঁর এ উক্তি দিয়ে ঃ

كن فى الدنيا كعابر سبيل

দুনিয়ায় বসবাস করবে যেন তুমি পথ অতিক্রমকারী এক মুসাফির।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সংস্থার পূর্ণত্ব বিধান। প্রধানত দুটি দিক দিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা (conception) অন্যান্যদের ধারণা থেকে ভিন্ন ও বিশিষ্ট। একটি এই যে, ইসলামের উপরিউক্ত লক্ষ্য ইসলামী শরী'আতের সীমার মাঝে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিচালনাধীনে অর্জিত হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হল, এ পর্যায়ে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সব হতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারেই আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের এ চেষ্টা চলতে হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ব্যক্তির সংশোধন, পুনর্গঠন ও পূর্ণতা বিধানের জন্যে সমাজ ও সমষ্টির সংশোধন ও পুনর্গঠন একান্তই জরুরী। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ ব্যক্তি-সত্তার সংস্কার সংশোধন ও পূর্ণত্ব বিধান গোটা সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। শেষের কাজটি না হলে প্রথমটি আদৌ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টাই ব্যক্তি জীবনে এনে দেয় সংশোধন ও সংস্কারের বন্যা-প্রবাহ্। তাই এ প্রচেষ্টা হতে হবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক যেমন, সমাজ-কেন্দ্রিকও তেমনি।

এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন। কিছু লোক মনে করে যে, মুসলমান নামধারী ব্যক্তি বা সমাজ যেসব অনুষ্ঠান ও ভাবধারাকে সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করেছে, তারই নাম ইসলামী সংস্কৃতি; কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই মুসলিম সংস্কৃতি নামে অভিহিত হতে পারে, যার সন্ধান পাওয়া যায় কুরআন ও সুন্নাতে কিংবা যার সমর্থন মেলে আল্লাহ ও রাসূলের কাছ থেকে এবং যার লক্ষ্য বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন। মুসলিম সমাজে এমন কোন ভাবধারা বা সংস্কৃতি যদি দেখা দেয়, কুরআন ও সুন্নাহ্ যার অনুমতি দেয় না, তাহলে বুঝতে হবে, তা ইসলামী সংস্কৃতি নয়, তা মুসলমানদের নিজস্ব জিনিসও নয়; বরং তা মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে আমদানী করা জিনিস। তা গ্রহণ করে মুসলমানরা নিজেদের ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া কোন কল্যাণই তাতে নেই—থাকতে পারে না।

www.amarboi.org

Fine Arts বা ললিতকলার যেসব ধরন বা উপকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ এই কল্যাণদৃষ্টির কারণেই। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে চায় সুন্দর সুষমামণ্ডিত, সবুজ-সতেজ, আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল করে গড়ে তুলতে; কিন্তু তা সবই করতে চায় কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে, মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।

সংস্কৃতির পাশ্চাত্য মূল্যায়ন

সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শন মানবতাবাদী নয়—নয় তা মানুষের জন্যে কল্যাণকর। এ দর্শনে আল্লাহ্‌র সেরাসৃষ্টি মানব সন্তানের চেয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরে মূর্তির মূল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। একবার পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে একটি নিষ্পাপ শিশু অথবা গ্রীক ভাস্কর্যের একটি দুর্লভ, অদ্বিতীয়, উন্নত মানের নিদর্শনের কোন্‌টিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা উচিত এই মর্মে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। পাঠক সাধারণের তরফ থেকে এ প্রশ্নের জবাবে একবাক্যে মানব শিশুর পরিবর্তে ভাস্কর্যশিল্পের অতুলনীয় নিদর্শনটিকেই বাঁচাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি ভাস্কর্য শিল্প—প্রস্তরনির্মিত একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমা। এমনিভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের যত অনুষ্ঠানই আজ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার সবক'টিতেই যে মনুষ্যত্বের অপমান—মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? বস্তুত মানবতার ধ্বংসই এসবের একমাত্র পরিণতি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানবতাবিধ্বংসী তথা মানব চরিত্র বিকৃতকারী, তা মানুষের পাশববৃত্তির চরিতার্থতা, চিত্তবিনোদন ও আনন্দ বিধানের যত বড় আয়োজনই হোকনা কেন, তা সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানকে ইসলামী সংস্কৃতি নামে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতাও আর কিছু হতে পারে না।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা ঃ

এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে কথাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি

(১) ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমা ও জীবন-লক্ষ্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়; চিরন্তন সত্যের ধারক ও বাহক। অতএব এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে—যা বিশ্বলোকে স্থায়ী মূল্যমানের উৎস—নিজের মাঝে প্রতিফলিত করে নিতে পারে।

www.amarboi.org

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হল, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোন লক্ষ্য নেই—নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই—আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।

ইসলামী সংস্কৃতি সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃংখলা গড়ে তোলে, যাতে করে ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহ্‌র ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা—একটা accident মাত্র, এজন্যে দুনিয়ায় কোন স্থায়ী মূল্যমান (Permanent Values) নেই—নেই প্রতিফল দানের বা প্রতিফল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা।

ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তিদের মাঝে এমন যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দেয়, যার কারণে প্রকৃতি জয়ের ফলাফল সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি-দর্শনে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির সুবিধা হয়—তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন—তা-ই ন্যায়, সত্য, ভালো ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায়—তা-ই পাপ।

ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে সবরকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলম-শোষণ ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভুত হয়ে যায় এবং পরস্পরে আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিগুলোর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে—শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণী-ভেদ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে—বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয়

www.amarboi.org

এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতেই সচেষ্ট হয়।

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য

উপসংহারে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

(১) তওহীদ (২) মানবতার সম্মান (৩) বিশ্ব-ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা (universality), ভৌগলিক অভিন্নতা (৪) মানবীয় ভ্রাতৃত্ব (৫) বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ (৬) বিশ্ব-মানবের ঐক্য (৭) কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ (৮) পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পংকিলতা থেকে মুক্তি (৯) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা (১০) ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।

এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে এর কোন একটি উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে, তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতি হবেনা এবং তা হতে পারেনা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি।

বর্তমান মুসলিম সমাজে এর বিপরীত আদর্শের উপাদান ও ভাবধারায় গড়া সংস্কৃতি বিরাজমান। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলতাময়। আজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী ও বিজাতীয় উপাদান ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন, ক্লান্তিকর ও দুঃসাধ্য। এ পথে পদে পদে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব।

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তওহীদ। তওহীদ বা একত্ববাদ বলতে বুঝায় আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ এককত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তওহীদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করে। ইতিবাচক ধারণা এই যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। আর নেতিবাচক ধারণা এই যে, তাঁর মতো কেউ নেই—কিছু নেই; কেউ হতে পারেনা তাঁর সমতুল্য। গোটা বিশ্বলোকে তিনি একক ইখ্তিয়ারসম্পন্ন ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন; যা ইচ্ছা তারই ফয়সালা করেন—আদেশ ও নির্দেশ দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তওহীদের ধারণা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। 'ইলাহ' হিসেবেও তিনি এক ও একক। তিনি ছাড়া আর কেউ 'ইলাহ্' নয় এবং 'ইলাহ' হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল এককভাবে তাঁরই জন্যে শোভনীয়— তাঁর সত্তায়ই নিহিত।

স্রষ্টা বা খোদাকে 'এক' বলে জানার ও মানার কথা অন্যান্য ধর্মে ও সংস্কৃতিতে. স্বীকৃত হলেও তাতে রয়েছে অসংখ্য ভুল ও ভ্রান্তি। কেউ তাকে একটি শক্তিমাত্র মনে করেছে। কেউ মনে করেছে প্রথম কার্যকারণ (First cause of causes)। কেউ তাঁর সাথে বংশধারাকে সংযোজিত করেছে। কেউ কেউ আবার তাঁকে আকার-আকৃতি বিশিষ্ট মনে করেছে। কিন্তু ইসলামের তওহীদী ধারণা এ সব কলুষতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। ইসলামের খোদা পবিত্র ও মহান সত্তার অধিকারী। তাঁর সত্তা যাবতীয় মহৎ গুণে বিভূষিত। তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবকিছু বরং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপক। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী। তাঁর হিকমত ও সুবিচার নীতিতে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নেই। তিনিই জীবনদাতা ও জীবন সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক। ক্ষতি ও কল্যাণের যাবতীয় শক্তি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কার তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই চিরন্তন মা'বুদ, অবিনশ্বর ইলাহ। পূর্ণত্বের সব গুণ তাঁরই সত্তায় নিহিত। তাঁর কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যে নেই একবিন্দু দোষ-ত্রুটি। বস্তুত খোদা সম্পর্কে এ ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। এরই পাশাপাশি রয়েছে নেতিবাচক ধারণাও। অর্থাৎ খোদার এ মহৎ গুণাবলী খোদা ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। খোদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হল, তা আর কারোর সম্পর্কেই বলা যেতে পারেনা। বিশ্বলোকের অন্য কোন শক্তি বা সত্তা এই গুণাবলীর অধিকারী নয়। এ কারণে অপর কেউই, কোন কিছুই 'ইলাহ' হতে পারে না।

www.amarboi.org

ইসলামের তওহীদী ধারণার পূর্ণতার একটি অপরিহার্য দিক হল নবুয়্যাত বা রিসালাত বিশ্বাস। তওহীদী ধারণায় আল্লাহ-ই যেহেতু সর্ব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণকারী—একমাত্র বিধানদাতা, তাই মানুষের নিকট তাঁর বিধান পৌঁছানোর মাধ্যম হল এই রিসালাত বা নবুয়্যাত। এ জন্যে মানব সমাজের মধ্য হতেই এক এক ব্যক্তিকে তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাছাই করে নেন এবং এ কাজ সম্পাদনের জন্যে মনোনীত করেন। মানুষের ইতিহাসে এ ধরনের বহু মনোনীত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এ দুনিয়ায়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ও পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত মানুষের জন্যে রাসূল।

বস্তুত নবুয়্যাত ও রিসালাত মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। মানুষের জীবনে যতটা প্রয়োজন খাদ্য ও পোশাকের, তার চাইতেও অধিক প্রয়োজন এই রিসালাতের। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে সব আইন বিধানের প্রয়োজন, তা সবই এই রিসালাতের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। আর এ সব আইন বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন যতটা উন্নত মানে চলতে পারে, ততটা উন্নত মান অপর কোন বিধানের সাহায্যেই অর্জিত হতে পারেনা। এখন মানুষ যদি নবুয়্যাত বা রিসালাতকে গ্রহণ না করে তাহলে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান হয় সে নিজেই রচনা করবে, নচেত অপর কোন মানুষকে তা রচনার অধিকার দিতে হবে কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনার দায়িত্ব অর্পন করতে হবে অথবা প্রতিটি জন-সমাজ নতুন করে আইন-বিধান রচনার পরিবর্তে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত করবে। এছাড়া মানুষের সামনে অন্য কোন উপায় আছে কি?... কিন্তু বর্ণিত উপায়সমূহ গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত দেখা যাবে, এর কোন একটি উপায়ও মানুষকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সন্ধান দিতে সমর্থ নয়। এ কারণে মানুষ তার সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে কোন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর বিধান রচনা করতে পারেনা; বরং তার (মানুষের) মানসিক যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশ চরম দুর্গতি ভোগ করে আসিছে যুগ যুগ ধরে। দুনিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মূলে প্রধানত এ কারণটিই নিহিত।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া বিধানের নিকটই আত্মসমর্পণ করতে হয়—এছাড়া তার আর কোনই উপায় নেই। ইসলামের দাবি হল, মানুষের মর্যাদা রক্ষা তথা সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দানের অধিকার কেবল আল্লাহরই রয়েছে। রিসালাত হচ্ছে এ বিধান দানের একমাত্র মাধ্যম। রাসূল তার বিশেষ ধরনের যোগ্যতা-প্রতিভা ও খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ লাভের কারণে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আল্লাহর

www.amarboi.org

বিধানকে যথাযথভাবে পৌঁছানো ও তার বাস্তবায়নে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেন। তাই আল্লাহ্‌র বিধান সঠিকভাবে লাভ করতে মানুষের কোন অসুবিধে হয়নি। বস্তুত রাসূলের উপস্থাপিত বিধানে সর্ব শ্রেণী মানুষের এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্তমান। মানব-জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কেবলমাত্র এই রাসূল-বিশ্বাসের সাহায্যেই সম্ভবপর।

রিসালাত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তওহীদী আকীদার আর একটি অপরিহার্য দিক হল পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক কাঠামোর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহীর সন্দেহাতীত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও নির্দোষ করে তোলে। মানুষ এর তাগিদেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্-ভীতি ও তাক্‌ওয়ার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক পরিপূর্ণ চিন্তা-ব্যবস্থা ও যুক্তিধারার ওপর ভিত্তিশীল হচ্ছে এই আকীদাটি। মানুষের নৈতিক সুস্থতার জন্যে এর মত প্রভাবশীল দৃঢ় ভিত্তি আর কিছুই হতে পারেনা। এ আকীদার মূল কথা হল, মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্যে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে। কোনরূপ বাহ্যিক চাপ, প্রলোভন ও লালসা ছাড়াই মনের ঐকান্তিক তাগিদে সে আল্লাহ্‌র বিধান পালন করে চলবে। এই হল পরকাল বিশ্বাসের লক্ষ্য।

মানবতার সম্মান

ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষ হিসেবেই সম্মানার্হ। মানবতার এই সম্মান নির্বিশেষ—পার্থক্যহীন। মানুষে মানুষে নেই কোনরূপ তারতম্য। উচ্চ-নীচ ও আশরাফ-আতরাফের বিভেদ মানবতার পক্ষে চরম অপমান স্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতেও কোনরূপ পার্থক্য ও বৈষম্য করা চলতে পারেনা। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, গ্রামবাসী ও শহরবাসী, নারী আর পুরুষ—ইত্যাদির মধ্যে কোনই পার্থক্য বা বৈষম্য স্বীকৃতব্য নয়। ইসলামী সংস্কৃতি এধরনের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বংশ, বর্ণ, ভাষা, স্বদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, শাসন-সংস্থা প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। ইসলামী সংস্কৃতিতে সব মানুষের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা সর্বতোভাবে সমান। এখানে পার্থক্য কেবলমাত্র একটি দিক দিয়েই করা হয়। তাহল মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনধারা। অন্য কথায়, কুফর ও ইসলাম এবং ইসলামী সমাজের তাক্‌ওয়ার বিভিন্ন মানগত অবস্থা হচ্ছে পার্থক্যের মাপকাঠি।

ইসলামী সংস্কৃতি উচ্চ-নীচের অন্য সব ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মানবতার ইতিহাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এ সাম্যের কোনই তুলনা নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের এ সাম্য দুনিয়ার অপর কোন সংস্কৃতিই কায়েম করতে পারেনি।

www.amarboi.org

বিশ্ব-ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা

ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। তা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। তার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানববংশে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির এ হল তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্র একত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী—সে যে-ভাষায়ই কথা বলুক, তার গায়ের বর্ণ যা-ই হোক, সে প্রাচ্য দেশীয় হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট, ইসলামী রঙে রঙীন—এটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল দ্বীন (دين)। রক্ত সম্পর্ক এর তুলনায় একেবারেই গৌণ। তাই এ দুটির কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনী সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের পরে নবী করীম রচিত সমাজ সংস্থায় বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়—ভাষার, বর্ণের বা স্বাদেশিকতার ভিত্তিতেও নয়; বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিত। এরা সবাই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্য-পথের যাত্রী। হাবশার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবুবকর, উমর (রা) ও মদীনার আনসারগণ এ আদর্শ-ভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি মানব সমাজ তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ। এর যেকোন অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পূর্ণ দেহটিই সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠত। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির এটাই হয়ে থাকে পরিণতি।

বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সমাজে অকারণ রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিবেশী জাতি বা রাজ্যের সাথে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। যা কিছু ভালো—কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হল এ সংস্কৃতির ধর্ম। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠলে তাকে এড়িয়ে না

www.amarboi.org

যাওয়াও এর বৈশিষ্ট্য। বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা চিরকালই সুস্পষ্ট ও বিজয়দৃপ্ত। বিশ্ব-সমাজকে যুদ্ধের দাবানল থেকে মুক্ত রাখতে হলে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারাই হল একমাত্র উপায়।

বিশ্ব-মানবের ঐক্য

মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মানুষের পরস্পরিক ঐক্য অপরিহার্য। ঐক্য ছাড়া যেমন মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ধারণা করা যায়না, তেমনি বিশ্বশান্তিরও বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। বিশ্ব-মানবের পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য; তারপরই হল কর্মের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। অন্যকথায়, মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানুষের মনন-চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে বিশ্ব-মানবের কাংক্ষিত ঐক্যের একমাত্র উপায়।

ইসলাম যে 'কালেমায়ে শাহাদাত' মানব-সাধারণের নিকট উপস্থাপন করেছে এবং তার যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছে, চিন্তার ভারসাম্য রক্ষার জন্যে তা-ই হল প্রধান হাতিয়ার। এর সাহায্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মননশীলতায় যে ঐক্য দানা বেধে ওঠে, তা-ই বাস্তব কর্মে নিয়ে আসে ঐক্যের ধারবাহিকতা। বিরোধ ও বিভেদের সমস্ত প্রাচীর এর বন্যা-প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য। মানুষ এরই ভিত্তিতে সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ওঠতে পারে এবং মানব-সমাজের ওপর থেকে এক আল্লাহ ছাড়া অপর শক্তিগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে উৎখাত করে মানুষ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। তাই তওহীদ হচ্ছে মানবতার মুক্তি সনদ। শির্‌ক হচ্ছে এর বিপরীত অশান্তি ও বিপর্যয়ের সর্বনাশা বীজ; তা মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে। এসব থেকে মানুষ যখন মানসিক দিক দিয়ে পবিত্রতা লাভ করে, তখনই আসে মন ও মননশীলতার ঐক্য এবং তখন বাহ্যিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক ঐক্যের সৃষ্টি করা আর কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামে বিশেষ কর্মনীতি ও সুফলদায়ক কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে। বাহ্যিক ঐক্য স্থাপনের জন্যে যেখানে নামায ও হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আন্তরিক ঐক্য বিধানের জন্যে সেখানে গৃহীত হয়েছে রোযা ও যাকাতের ব্যবস্থা। পাঁচ ওয়াক্তের নামায হোক কিংবা জুম'আ ও দুই ঈদের নামায, উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত ধার্মিকতা ও জাতীয়তার উর্ধ্বে ওঠে মানুষ আর্ন্তজাতিকতার উদার পরিবেশে স্থান গ্রহণ করে। আর বায়তুল্লাহর হজ্জ বিশ্ব-মানবের এক পোশাকে, এক আল্লাহর দরবারে, একই ভাষায়, একই দিকে মুখ করে একই প্রকারের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে, পারস্পরিক সহানুভূতির সাথে, একত্র সমাবেশের এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাঁটা তথা উপার্জনে কম-বেশী হওয়া এক স্বাভাবিক অবস্থারই লক্ষণ।

www.amarboi.org

অন্যথায় বৈচিত্রহীনতা ও একঘেয়েমীতে মানব সমাজে এক চরম অচলাবস্থা সৃষ্টির পূর্ণ আশংকা দেখা দিত। এমনকি, এর ফলে দুনিয়ার আবর্তন স্তিমিত হয়ে যেত। এ কারণে মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের অবাধ সুযোগ-সুবিধে থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। একদিকে প্রয়োজন, অপর দিকে উপার্জন। এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের পরিপূরক হওয়া অপরিহার্য। এ কারণেই ইসলামে যাকাত ও সাদকার সুষ্ঠু মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষই এ কারণে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে বাধ্য হয়। এর দরুন ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোজনে এক বৃহত্তর সমাজ গড়ে ওঠতে পারে। বস্তুত উম্মতে মুসলিমা এমনিভাবেই স্বীয় উন্নত মানের সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্যের পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন করতে পারে।

কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি

ইসলামী মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন অবহিত হতে হয় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, তেমনি সমষ্টির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই-বোন এবং বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রীরূপে প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। কর্তব্যের অনুভূতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। অধিকার হরণ বা লঙ্ঘন তার কাছে চিরন্তন আযাবের কারণ রূপে বিবেচিত। এ জন্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সে বদ্ধপরিকর। এতে করে অর্থনৈতিক শোষণ ও লুণ্ঠন আপনা-আপনি নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। তার ফলে এ সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যের কোন প্রশ্নই ওঠতে পারেনা—পারেনা নৈতিক চরিত্র-বিধ্বংসী প্রবণতা জেগে ওঠতে।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলাও ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পবিত্রতা যেমন বাহ্যিক, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এ জন্যে ইসলাম যেমন শির্ককে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার আদেশ করেছে, তেমনি হারাম ও অনৈতিক কর্ম-কাণ্ডকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার নির্দেশ দিয়েছে। 'তাক্ওয়া' বা আল্লাহভীতি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্যে অতিশয় কার্যকর হাতিয়ার। এর অনুশীলনের ফলে সমগ্র সমাজ-পরিবেশ এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ভাবধারায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ জন্যে ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ও চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে সমাজের মূল ভিত্তি প্রস্তর। এছাড়া ব্যক্তির

www.amarboi.org

সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশ কখনো সম্ভবপর নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে জীবন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সামষ্টিক স্বার্থের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানে 'কমিউন' প্রথা চালু করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া হয়েছে। সে সমাজের জনগণের প্রেম-ভালোবাসা, মানসিক, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের উপায় এবং জীবন-জীবিকার উৎস হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্র। নারী-পুরুষ, বালক-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষই সরকারের মালিকানা। কাজেই সরকারী নির্দেশ মেনে চলায় কোনরূপ দ্বিধা-কুণ্ঠা প্রকাশ করার একবিন্দু অবকাশ নেই সে সমাজে। জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই সেখানে ব্যক্তির মালিকানা থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সোপর্দ করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য হয়েছে সরকারী অর্থ শোষণের এক প্রবল হাতিয়ার। নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে সেখানকার জনগণ যেন জেলখানার কয়েদী। ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন নাম-গন্ধ নেই সেখানে। তার জন্যে কোন সামান্য চেষ্টা করা হলেও তা হয় বিদ্রোহের নামান্তর। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েট আক্রমণের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী সোভিয়েট ট্যাংক বহরের প্রতিরোধে এসে প্রাণ দিয়েছে। নব্য উপনিবেশবাদী সমাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী অভিযান তাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকারকে নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতিও জনগণকে সত্যিকার কোন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসনতন্ত্রে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে যে, সরকার যে কোন সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা কিংবা নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জাতীয় আইনের সাহায্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার অধিকারও এ সরকারের জন্যে সুরক্ষিত। বিশেষত জরুরী অবস্থায় সমস্ত জনগণ সরকারেরই নিরংকুশ কর্তত্বাধীনে চলে যেতে বাধ্য হয়; তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই ওঠতে পারেনা। অন্যদিকে নারী-পুরুষের সমতার নামে নারীর মর্যাদা সেখানে চরমভাবে ভুলণ্ঠিত। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার নামান্তর বই কিছুই নয়। সেখানে কেউ কারোর জন্যে এক বিন্দু সহানুভূতি বোধ করেনা। পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও সহানুভূতি কর্পূরের মতো উবে গেছে সে সমাজ থেকে। আত্মহত্যার ঘটনা সেখানে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এ অমানবিক বন্যতার প্রশ্রয় দেয়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-স্বার্থের মাঝে এখানে ভারসাম্যপূর্ণ এক সীমারেখা অংকিত। যার ফলে এ দুটি দিকই পরস্পরের জন্যে রহমত হয়ে ওঠে। মানুষের মৌল অধিকারে কোন বৈষম্য বা তারতম্য এখানে স্বীকৃত নয়। প্রত্যেকেরই স্থান ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট এখানে। এতে

www.amarboi.org

কম-বেশি করার এতটুকু অবকাশ নেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হরণ করার অধিকার এখানে কাউকেই দেয়া হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও অকারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকের জন্যেই যথোচিত কাজের ও স্বীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ এখানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। জনগণের সম্পদ পরিমাণে কম-বেশি হতে পারে; কিন্তু তাদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন অপূর্ণ থাকার কোন কারণ ঘটতে পারেনা এ সমাজে।

এ পর্যায়ের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকে পরম ভারসাম্য রক্ষা। বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, উচ্ছৃঙ্খলতা—এক কথায় সর্বপ্রকার জুলুম, অত্যাচার ও কদাচার ইসলামী সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সততা, ন্যায়পরতা ও ইনসাফ এ সংস্কৃতির উজ্জ্বল দ্বীপশিখা।

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা

বর্তমান কালে সংস্কৃতির কথা বললেই সাধারণভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অংকন বা চিত্রশিল্প, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা বা নৃত্যকলা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য ললিতকলার কথা আপনা থেকেই মনের পটে ভেসে ওঠে। 'সংস্কৃতির' কথা বললে লোকেরা এসবই মনে করে বসে। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে সত্যই কি বুঝায় কিংবা অধুনা যে সব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যই সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কিনা এবং এগুলো ছাড়া সংস্কৃতির আর কোন অর্থ আছে কি না, তা সাধারণত কারোর মনেই জাগেনা। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, এগুলোকেই সাংস্কৃতিক কাজ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং এ পর্যায়ের এক-একটা কাজকে 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে; বরং বর্তমানে তো কেবলমাত্র নৃত্য-সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ই সংস্কৃতি চর্চা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে পরিচিতি লাভ করছে। এসবের জন্যে এ শব্দটির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কিনা, তা এ কালের লোকেরা একবার ভেবে দেখবারও অবকাশ পাচ্ছেনা। শুধু তা-ই নয়, সংস্কৃতির নামে প্রচলিত এসব জিনিসকে আবার ইসলামী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করছে না।

কিন্তু আমার মনে হয়, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃতির নামে সমাজে যা কিছু চলছে, অবলীলাক্রমে তাকেই সংস্কৃতি বা Culture[১] বলে মেনে নেয়া অন্তত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধজনের পক্ষে কিছুতেই শোভন হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

সংস্কৃতি ঃ তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

'সংস্কৃতি' বাংলা শব্দ। নতুন বাংলা অভিধানে-এর অর্থ লেখা হয়েছে ঃ

'সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture'। অপর এক গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যায় ঃ 'সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। সংস্কৃতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Culture। এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CALTURE থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে—জমিতে উপযুক্তভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা; বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

১. কথাটিকে উর্দূতে 'তাহযীব' এবং আরবীতে 'সাক্বাফাত' বলা হয়। আমাদের এতদাঞ্চলে 'তামাদ্দুন' শব্দটিকেও সংস্কৃতির সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সভ্যতা—সংস্কৃতি নয়।—সম্পাদক

www.amarboi.org

করা। বিশেষজ্ঞরা Culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু এ শব্দকে সাধারণত উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং ভদ্রজনোচিত আচার-ব্যবহার ও আচরণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ললিত-কলাকেও Culture বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সুরুচি-সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষকে Cultured m :n বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে ম নুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও আমাদুনিক উন্নতি বুঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

এ দেশের জনৈক চিন্তাবিদ কলম-নবিশের মতে ঃ সংস্কৃতি শব্দটি 'সংস্কার' থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থ ঃ কোন জিনিসের দোষ-ত্রুটি বা ময়লা-আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক-ঠাক করে দেয়া। অর্থাৎ সংশোধন ও পরিশুদ্ধিকরণ তথা মন-মগজ, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চরিত্র ও কার্যকলাপকে উচ্চতর মানে উন্নীতকরণের কাজকে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলিত কাঁচা স্বর্ণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ এবং পরে তা দিয়ে অলংকারাদি বানানোও সংস্কৃতির মূল কাজ। ইংরেজী শব্দ Culture-এর বাংলা অর্থ করা হয় সংস্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। তার সাধারণ বোধগম্য অর্থ হল, উত্তম বা উন্নত মানের চরিত্র।

অধ্যাপক MURRAY তার লিখিত ইংরেজী ডিক্শনারীতে বলেছেন ঃ Civlization বা সভ্যতা বলতে একটি জাতির উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র-সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilzation-এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা-খাওয়ার নিয়ম-নীতি, সামাজিক-সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ স্ফূর্তি লাভের উপকরণ, আনন্দ-উৎসব, ললিতকলা, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণ বিধি শামিল রয়েছে। এসবের মাধ্যমে এক একটা জাতি অপরাপর জাতি থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট রূপে পরিচিতি লাভ করে থাকে।

প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Duran এক নিবন্ধে Culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ 'সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্তঃস্থল থেকে আপনা থেকেই উপচে ওঠে, যেমন ফুলবনে ফুল আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে।' তাঁর মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলেনা। জাতীয় সভ্যতার প্রভাবে যে সব আদত-অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র আপনা থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তা-ই সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোন জিনিসকে জোর করে চালু করা যায়না। তা পয়দা

www.amarboi.org

করা হয় না, বরং আপনা থেকেই পয়দা হয়ে ওঠে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ চিন্তা-বিশ্বাসের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন আসা সম্ভব। প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T.S. Eliot Culture বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন ঃ 'সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক'। তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংস্কৃতিরই উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র-শাসন-পদ্ধতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে। Oswald Spengler-এর মতে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে সভ্যতা, যা তার প্রাথমিক ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনা, তা ছড়িয়ে পড়ে ও সম্প্রসারিত হয়ে অপরাপর দেশগুলোর ওপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে। কিন্তু ডুরান্টের মতে, প্রথমে রাজ্য ও রাষ্ট্র এবং পরে সভ্যতা গড়ে ওঠে আর এরই দৃঢ় ব্যবস্থাধীনে সংস্কৃতি আপনা থেকে ফুটে ওঠে। আর রুচিগত, মানসিক ও সৃজনশীল প্রকাশনার অবাধ বিকাশের মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটা রূপ গড়ে ওঠে। তাতে গোটা জাতির ওপর প্রভাবশালী ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যমানের একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ পর্যায়ে আরবী শব্দ সাক্বাফাতের ব্যাখ্যাও আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, ইংরেজীতে তা-ই কালচার এবং আরবীতে তাই হল সাক্বাফাত (ثقافت)। আরবী তাহযীব (تهذيب) শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাক্বাফাত (ثقافت) এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হল ঃ চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ-সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবী 'সাক্বাফ' অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া। আর আস-সাক্বাফ বলতে বুঝায় তাকে যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবী হায্যাবা (هذب) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'গাছের শাখা–প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজী Cultue মানে কৃষিকাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন-পালন করা (Oxford Dictionary)। এর আর একটি অর্থ লেখা হয়েছে ঃ Intellectual Development, Improvement by (mental or physical) Traininge: অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) ট্রেনিং-এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।

এ তিনটি শব্দেই ঠিকঠাক করা ও সংশোধন করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেও এই অর্থটি পুরাপুরি রক্ষিত হয়েছে।

রাগেব আলী বৈরুতী তাঁর আস-সাক্বাফাহ্ (الثقافة) নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

www.amarboi.org

الثقافه هل هى الاصلاح النفس الصحيح اكامل بحيث يكون صاحبمامراة اكهال والفضائل الصلاح الفاسد وتقويم العوج –

'সাক্বাফাহ্' মানে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে।......খারাবীর সংশোধন এবং বক্রতাকে সোজা করাই হল 'সাক্বাফাত' বা সংস্কৃতি।

ইংরেজী 'কালচার' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি সুনির্ধারিত হতে পারে নি। বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সংজ্ঞাগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেমন, তেমনি পরস্পর-বিরোধীও।

Philip Baghy তাঁর Culture and History নামক গ্রন্থে Concept of culture শীর্ষক এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম ফরাসী লেখক ভলটেয়ার ও ভ্যানভেনার্গাস (Voltair and Vanvenargues) এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এদের মতে, মানসিক লালন ও পরিশুদ্ধকরণেরই নাম হচ্ছে কালচার। অনতিবিলম্বে উন্নত সমাজের চাল-চলন, রীতি-নীতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদিও এ শব্দের আওতায় গণ্য হতে লাগল। অক্সফোর্ড ডিক্শনারীর সংজ্ঞা মতে বলা যায়, ১৮০৫ সন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় এ শব্দটির কোন ব্যবহার দেখা যায় না। সম্ভবত ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে 'কালচার' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। ......সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত এ শব্দটি অস্পষ্টই রয়ে গেছে। এর অনেকগুলো সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থকার A.L Krochs and Kluck Halm-এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর একশত একষট্টিটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।[১]

এই গ্রন্থকারের মতে এ শব্দটির এমন সংজ্ঞা হওয়া উচিত, যা মানব জীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হবে। ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিদ্যা, ভাষা, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিকে এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে; বরং মানবীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তো মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষমতা এবং এধরনের অন্যান্য জিনিসকেও এর মধ্যে শামিল মনে করেছেন। টি. এস. ইলিয়ট কালচার শব্দটির তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'চালচলন ও আদব-কায়দার পরিশুদ্ধতাকেই 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি' বলে'

একটু পরে তিনি বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ করেছেন এ ভাষায় ঃ

---

১. Culture, Critical Review of concept and defination.

www.amarboi.org

'কালচার (সংস্কৃতি) বলতে আমি সর্বপ্রথম তা-ই বুঝি যা ভাষা-বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন; অর্থাৎ এক বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবনধারা ও পদ্ধতি। [১]

ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে শব্দটির অর্থ লিখেছেন এভাবে ঃ

কালচার হল মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। অন্যকথায় কালচার হল পূর্ণত্ব অর্জন।

কালচার শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এগুলোকে ভালো ভালো ও চমৎকার শব্দ তো বলা যায়; কিন্তু এগুলো কালচার বা সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তবে তিনি Montesqueu এবং B. Wilson-এর দেয়া সংজ্ঞাকে অতীব উত্তম বলে মনে করেন আর তা হল ঃ এক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সচেতন বানানো এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্যে অব্যাহত চেষ্টা করা। কিন্তু তাঁর মতে কালচারের এ সংজ্ঞা সঠিক নয়। তিনি মনে করেন, কালচার ধর্ম হতেও ব্যাপক অর্থবোধক। তাঁর গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা লেখক মুহসিন মেহদী 'কালচার' শব্দের উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

এ কালচার মানুষের সাধারণ জীবনধারা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কালচারের অর্থ হল মানবীয় আত্মার সাধারণ জমিনকে পরিচ্ছন্ন করা, তাকে কর্ষণের যোগ্য করে তোলা।[২]

মুহসিন মেহদী কালচার শব্দ সম্পর্কে এমনিতর আরো বলেছেন ঃ

সংস্কৃতি না যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে বলা যায়, না মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনাকে; বরং সত্যি কথা এই যে, তাহল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বৈষয়িক সৃজনশীলতার অভ্যস্ত ও প্রচলিত রূপ।[৩]

চিন্তাবিদ ফায়জী কালচার শব্দের দুটো সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ একটি সমাজকেন্দ্রিক, অপরটি মানবিক। একটি সংজ্ঞার দৃষ্টিতে কালচার 'তামাদ্দুন' শব্দ থেকেও ব্যাপকতর আর অপরটির দৃষ্টিতে কালচার হচ্ছে মানবীয় আত্মার পূর্ণতা বিধান।

তিনি লিখেছেন ঃ

কালচার-এর দুটি অর্থ ঃ সমাজতাত্ত্বিক ও মানবিক।

---

১. T. S. Eliot, Notes Towards the Defination of Culture. P 13

২. Mohsin Mehdi: Ibne Khaldun`s Philosophy of History p. 181.

৩. পূর্বোক্ত

www.amarboi.org

১. কালচার হচ্ছে এমন একটা পূর্ণরূপ—যাতে জ্ঞান-বিশ্বাস, শিল্প-কলা, নৈতিক আইন-বিধান, রসম-রেওয়াজ এবং আরো অনেক যোগ্যতা ও অভ্যাস—যা মানুষ সমাজের একজন হিসেবে অর্জন করেছে—শামিল রয়েছে।

২. 'মানবীয় কালচার' হচ্ছে মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন।

কালচার শব্দের এ নানা সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, ফিলিপ বেগবী (Philip Bagby) প্রদত্ত সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি 'কালচার'-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

আসুন আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে, 'কালচার' বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীত-পদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিককেও পরিব্যাপ্ত করে।[১]

গ্রন্থকার সমাজ জীবন, মনস্তত্ত্ব ও তামাদ্দুনকে সামনে রেখে 'কালচার' শব্দের খুবই ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

সমাজ সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির নিয়মানুবর্তিতা ও নিরচ্ছিন্নতাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সুস্পষ্ট বংশানুক্রমের ভিত্তিতে যে ধারাবাহিকতা, তা-ও এর মধ্যে শামিল।[২]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

কোন বিশেষ কাল বা দেশের সাধারণ জ্ঞান-উপযোগী মানকেই বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি।

কালচার শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করায় সবচাইতে বেশী অসুবিধে দেখা দেয় এই যে, তার পূর্ণ চিত্রটা উদ্‌ঘাটিত করার জন্যে মন ঐকান্তিক বাসনা বোধ করে বটে। কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বিশেষজ্ঞরা খুব বেশী ডিগবাজি খেয়েছেন। এ কারণে অনেক স্থানেই সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে নাম দেয়া হয়েছে 'কালচার' বা সংস্কৃতি। টি. এস. এলিয়ট যথার্থ বলেছেন ঃ

লোকেরা শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কালচার মনে করে, অথচ এ জিনিসগুলো কালচার নয়; বরং তা এমন জিনিস যা থেকে কালচার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় মাত্র।[৩]

---

১. Philip Bagby: Culture and History, P 80

২. পূর্বোক্ত

৩. T.S. Eliot, Notes Towards the defination of culture, p 120

www.amarboi.org

সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন

সংস্কৃতির অর্থ ও তাৎপর্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এজন্যে যে, তাকে অপর কয়েকটি শব্দের সাথে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হয়েছে। যেমন তামাদ্দুন, civilization বা সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা সংস্থা (Social Structure) ও ধর্মমত (Religion)। এ তিনটির প্রতিটিই যেহেতু মানুষের জীবন ও সত্তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, এ জন্যে অনেক সময় সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণে সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা ধর্মের প্রভাব, ফলাফল ও কর্মনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সবচাইতে বেশী গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে 'তামাদ্দুন' (تمدن) শব্দ। কেননা সাধারণত তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি—এ দুটি শব্দকে একই অর্থবোধক মনে করা হয়। আর একটি বলে অপরটিকে মনে করে নেয়া হয়—একটির প্রভাবকে অপরটির ফলাফল গণ্য করা হয়। এ জন্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পৃথক করে প্রতিটির স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দান করার জন্যে প্রতিটির সীমা নির্ধারণ করা লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি. এস. এলিয়ট এ দুঃখই প্রকাশ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের সূচনায় স্বীয় অক্ষমতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন।

চিন্তাবিদ ফায়জী তামাদ্দুন-এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও সংস্কৃতি বা কালচার-এর সংজ্ঞা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন :

> তামাদ্দুন' বলতে দুটির একটি বুঝাবে : একটি হল সুসভ্য হওয়ার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ।

আন্তর্জাতিক ইসলামিক কলোকিয়ম-এর নিবন্ধকারদের মধ্যে কেবলমাত্র এম. জেড. সিদ্দিকী কালচার-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি কালচার-এর কেবল সংজ্ঞাই দেন নি, সেই সঙ্গে তামাদ্দুন-এর সাথে তার তুলনাও করেছেন। এ তুলনা নির্ভুল এবং এতে করে উভয়েরই সত্যিকার রূপ নির্ধারিত হতে পারে। তিনি বলেছেন :

> 'সাক্বাফাত' বা সংস্কৃতি পরিভাষাটি দ্বারা চিন্তার বিকাশ ও উন্নয়ন বুঝায় আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা সামাজিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায়কে প্রকাশ করে। কাজেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে আর সভ্যতা বা তামাদ্দুন তারই সমান প্রকাশ ক্ষেত্রকে তুলে ধরে। প্রথমটির সম্পর্ক চিন্তাগত কর্মের সাথে আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক বৈষয়িক ও বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। প্রথমটি একটি আভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাহ্যিক জগতে তার কার্যকারিতার নাম।[১]

ফায়জী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও নির্ভুল। তিনি বলেছেন :

১. M.Z.Siddiqui, International Colloquium, p-26

www.amarboi.org

'সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবধারার নাম আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা হল বাহ্য প্রকাশ'।[১]

এ পর্যায়ে মওলানা মওদূদী যা কিছু লিখেছেন তার সারকথা হল ঃ

'সংস্কৃতি কাকে বলে তা-ই সর্বপ্রথম বিচার্য। লোকেরা মনে করে, জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিয়ম-নীতি, শিল্প-কলা, ভাস্কর্য ও আবিস্কার-উদ্ভাবনী, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতার ধরন-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র-নীতিই হল সংস্কৃতি। কিন্তু আসলে এসব সংস্কৃতি নয়, এসব হচ্ছে সংস্কৃতির ফল ও প্রকাশ। এসব সংস্কৃতির মূল নয়, সংস্কৃতি-বৃক্ষের পত্র-পল্লব মাত্র। এ সব বাহ্যিক রূপ ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক দেখে কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে বটে; কিন্তু আসল জিনিস হল এ সবের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারা। তার ভিত্তি ও মৌলনীতির সন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য।[২]

টি. এস. ইলিয়ট, এম. জেড, সিদ্দীকী এবং মওলানা মওদূদীর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে ওঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে যে পার্থক্য, তা-ও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।

গিস্‌বার্ট (Gisbert) সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নিরূপণ করেছেন, যথা ঃ

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন—হাতেবোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে কোন ভাল চিত্র কারোর দৃষ্টিতে সুন্দর, কারোর চোখে তা অসুন্দর—নিন্দনীয়।

(খ) সভ্যতার অবদানগুলোকে সহজেই বোঝা যায়—উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অতো সহজে উপলব্ধি করতে পারেনা। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার-পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে; কিন্তু কোন লোককে কবিতা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে ঐ বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি

১. Faizee, Islamic Culture

২. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

www.amarboi.org

অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা যায়। কখনো-বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির বদলে কাজটা হল বড়—সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে—বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে আত্মনিমগ্ন হতে পারে; কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।

বস্তুত ব্যক্তির সুস্থতা, সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের পারস্পরিক উন্নতিশীল হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপুরি সংরক্ষণ একান্তই জরুরী সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্যে। বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন বা প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে তার জন্যে দেহতুল্য।

মানব জীবনের দুটি দিক। একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক বা প্রাণগত। এ দুটি দিকেরই নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে—দেহেরও দাবি আছে, মনেরও দাবি আছে। মানুষ এ উভয় ধরনের দাবি-দাওয়া পূরণের কাজে সব সময়ই মশগুল হয়ে থাকে। কোথাও আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজন তাকে নিরন্তর টানছে; জীবিকার সন্ধানে তাকে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কোথাও রয়েছে আত্মার দাবি—আধ্যাত্মিকতার আকুল আবেদন। সে দাবির পরিতৃপ্তির জন্যে তার মন ও মগজকে সব সময় চিন্তা-ভারাক্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে আর ধর্ম, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মিটায়। বস্তুত যেসব উপায়-উপকরণ একটি জাতির ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন ও আত্মার দাবি পূরণ করে, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। নৃত্য ও সঙ্গীত, কাব্য ও কবিতা, ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ-মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই এসব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এগুলো থেকে তৃপ্তি-আনন্দ-স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে। দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা, কবির রচিত কাব্য ও গান, সুরকারের সঙ্গীত—এসবই মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই প্রকাশ করে। এসব থেকে মানুষের মন তৃপ্তি পায়, আত্মার সন্তোষ ঘটে আর এই মূল্যমান, অনুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসই জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ করে।

এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যমান, অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ এমন, যা এক-একটি জাতিকে সাংস্কৃতিক প্রকাশ-মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই-বাছাই চালানের কাজে

www.amarboi.org

উদ্বুদ্ধ করে। যা মূল্যমান ও মানদণ্ডের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়, তা-ই সে গ্রহণ করে আর যা তাতে উত্তীর্ণ হতে পারেনা তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে—এড়িয়ে চলে। এ কারণেই দেখতে পাই, পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেনা। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে—তাকে নির্মূল করতে চায়। ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকট এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ধর্মকে যতই অস্বীকার করা হোকনা কেন, ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারা মানুষের রক্ত-মাংসের সাথে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে—গভীরভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। এ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান-গবেষণা এবং চিন্তা ও কল্পনার চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও তাকে এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, যখন ধর্মের প্রভাব অকপটে স্বীকার না করে কোনই উপায় থাকেনা। এমনকি, কট্টর নাস্তিকও এমন সব অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারাকেই একমাত্র আশ্রয় রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা কয়েক বছর পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল এইরূপ ঃ একটি রুশ সামুদ্রিক জাহাজ আমেরিকার দূর-প্রাচ্যের সমুদ্র-বক্ষে ঝড়ের দাপটে টালমাটাল। এক্ষুণি বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। কোথাও আশার আলো চোখে পড়ছেনা। এই দূরপ্রাচ্যের সমুদ্র উপকূলের কোথাও যে কোন উপসাগরের অস্তিত্ব আছে, তারও কোন প্রমাণ ছিলনা। সহসা মাতাল ঝড়ে নাস্তানাবুদ জাহাজখানি বাত্যাতাড়িত হয়ে এক শান্ত পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়ল। সমুদ্র-বক্ষের দুরন্ত বাতাস ও উন্মত্ত গর্জন যেন কোন জাদুমন্ত্রবলে এখানে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। ধড়ে ফিরে-পাওয়া-প্রাণ নাবিকরা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল ঃ 'না-খোদা' (রুশ ভাষায় এ শব্দটির মানে দাঁড়ায় খোদা-প্রেরিত।)

এ ঘটনাটি যেন কুরআনেরই প্রতিধ্বনি—

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ –

'উত্তাল তরঙ্গমালা যখন চারদিক থেকে তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলে সমাচ্ছন্ন মেঘের মত তখন তারা অতীব আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্কে ডাকে, তাঁরই জন্যে আনুগত্য একান্ত করে দেয়। তার পরে যখন তারা মুক্তি পেয়ে সমুদ্র কিনারে পৌছায়, তখন তারা ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে। (সূরা লুকমান ঃ ৩২)

www.amarboi.org

মানুষ সমুদ্র সফরের জন্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করে মহাসাগরে অথৈ পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাকে চালাবার ও থামিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ শক্তিমান। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মুখে মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। তাকে সকল শক্তি-ক্ষমতার অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্যভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। যুদ্ধ-সংগ্রামে মানুষ পূর্ণ সজ্জিত ও সশস্ত্র হয়ে ময়দানে উপস্থিত হয়। সেখানে সে তার অতুলনীয় সাহস ও বিক্রমের ওপর নির্ভর করে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গী-সাথী সৈনিকদের সংখ্যাও প্রতিপক্ষের তুলনায় হয় অনেক বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। .... কিন্তু কেন? এর জবাব তালাশ করেও সে ব্যর্থ হয়। কোন সত্যিকার জবাবই সে খুঁজে পায়না। মানুষ ক্ষেতে-খামারে ও ফলের বাগানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রক্তকে পানি করে দেয়। সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবুজ-শ্যামলে ও রস-টলমল ফলের গুচ্ছে একাকার হয়ে যায়। তা দেখে তার চোখ জুড়ায়, ধড়ে পানি আসে, সোনালী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় বুক ভরে উঠে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে সমস্ত ক্ষেত-খামার আর বাগ-বাগিচা হয় জ্বলে-পুড়ে শূণ্য মাঠে পরিণত হয় কিংবা বন্যার পানিতে সব ডুবে পচে নষ্ট হয়ে যায়; ফলে তার সব আশা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু কেন ঘটল এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, এমন অভাবিতপূর্ব দুরবস্থা? মানুষ নিজ থেকে এর কোন জবাবই পেতে পারেনা। বাহ্যিক কার্যকারণ যা-ই থাকনা কেন এ দুরবস্থার মূলে, অন্তর্নিহিত আসল কারণ—মনের সেই আসল প্রশ্নের জবাব—মানুষ ধর্মের কাছ থেকেই জানতে পারে। তাই ধর্ম মানুষের প্রকৃত আশ্রয়; জীবনের তিক্ত বাস্তবতা এবং তার রঙীন স্বপ্নের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে; তখন ধর্ম এসে তাকে দেয় সান্ত্বনা, অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়ায় এই ধর্মবিশ্বাস। বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সব আবেগ-অনুভূতি, ব্যথা-বেদনা ও দাবি-দাওয়ার সত্যিকার জবাব হচ্ছে এই ধর্ম। জীবনের গতিধারাকে ধর্ম ও নৈতিকতার নিয়ম-বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষ বাধ্য হয়। মানুষের সমস্ত চাল-চলনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে ধর্ম একটি সক্রিয় উদ্বোধক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ উদ্বোধক শক্তিই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলে আর এভাবেই সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনকে সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে, তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক গভীর ও সূক্ষ্ম আবেগ। এ হৃদয়াবেগই হল সংস্কৃতির উৎসমূল আর এ কারণেই মানব জীবনে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে; বরং ধর্মের প্রেরণায় যে সংস্কৃতি পরিপুষ্ট, তা যেমন হয় সুদৃঢ়ভিত্তিক, তেমনি হয় স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও মলিনতাহীন—জঘন্যতা, অশ্লীলতা ও বীভৎসতামুক্ত। তার শিকড় হয় মানুষের মন-মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচরণের গভীরে বিস্তৃত ও প্রসারিত।

www.amarboi.org

ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের মতে, সংস্কৃতি ধর্ম হতেও ব্যাপকতর অর্থবোধক; বরং তাঁর মতে, ধর্ম সংস্কৃতিরই একটা অংশ। অধিকাংশ মনীষীর মতে, সংস্কৃতি ও ধর্ম পর্যায়ে এ-ই হল একমাত্র কথা। ফায়জী 'ইসলামিক কালচার' গ্রন্থে এ মতটি প্রকাশ করেছেন এ ভাষায় ঃ

'ধর্ম, ভাষা, বংশ, দেশ এসবের ভিত্তিতে সংস্কৃতির রকমারি আঙ্গিকতা গড়ে ওঠে'।

আর এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠতে পারে, যদি সংস্কৃতির সংজ্ঞার সাথে সাথে ধর্মের সংজ্ঞাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ দুয়ের প্রভাব-সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু তবু সংস্কৃতি ও ধর্মের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে থেকে যাবে। কেননা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া একটা কঠিন ও জটিল ব্যাপার, এ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। ইন্সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ান এ্যান্ড এথিক্স'-এর প্রবন্ধকার ধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বিবিধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করবো। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত প্রবন্ধকারের একটা কথা পেশ করা আবশ্যক। সি. সি. জে. ওয়েব (C.C.J. Webb) ধর্মের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করিনে। তা সত্ত্বেও ধর্মের অনেক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

১. Religion is a belief in super-natural being (E.B. Tylor)

'ধর্ম হল অতি-প্রাকৃতিক সত্তাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা—(ই. বি. টেলর)

২. A Religion is a unified system of belief and practices relatives to sacred things that is to say, things set apart, and forbidden-believes and practices while unite into one single moral community called a church. (Durkhem)

ধর্ম আকীদা ও আমলের এমন এক সমন্বিত ব্যবস্থা, যার সম্পর্ক হচ্ছে পবিত্র জিনিসগুলোর সঙ্গে—সেসব জিনিস, যেসবকে বিশিষ্ট গণ্য করা হয়েছে আর যা নিষিদ্ধ। আকীদা ও আমল, যা নৈতিক দিক দিয়ে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করতে পারে—যাকে 'উপাসনালয়' বলা হয়। (ডুরখেম)

৩. Religion is man's faith in a power beyond himself whereby he seeks to satisfy his emotional needs and gains stability of life and which he expresses in acts of worship and service.[১]

'ধর্ম অর্থ ব্যক্তির আলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এমন শক্তি যার কাছ থেকে সে তার আবেগ-কেন্দ্রিক মুখাপেক্ষিতা ও ফায়দা লাভের প্রয়োজন পূরণ করতে চায় আর জীবনের স্থায়িত্ব, যাকে সে পূজা-উপাসনা ও সেবামূলক কাজ রূপে প্রকাশ করে।'

---

১. Encyclopedia of Religion and Ethics VXP 622, Article Religion

www.amarboi.org

W.D. Gundry তার Religion নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধর্মকে সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ধর্ম যেহেতু মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এ কারণে প্রতিটি মানুষ স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছে। যেমন ঃ ধর্ম হল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভালোভাবে জীবন যাপন করাই ধর্ম, আভ্যন্তরীণ গভীর অভিজ্ঞতারই একটা বিভাগ হল ধর্ম' ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হবে, ধর্ম হচ্ছে ঃ

১. বিশ্বলোক সম্পর্কে একটা চিন্তা-পদ্ধতি, মানুষও তার মধ্যে গণ্য

২. ধর্ম হচ্ছে একটা কর্ম-পদ্ধতি

৩. ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির একটা পন্থা

'আমরা বলতে পারি, ধর্মে একটা চিন্তা, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতার দিক রয়েছে; বরং বিষয়গতভাবে বলতে গেলে প্রতিটি ধর্মেরই একটা আকীদা, একটা নৈতিক বিধান ও একটা নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে'। (উক্ত বইয়ের ৬পৃ.)

ধর্মীয় ভাবধারার বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

ধর্মে সাধারণত এ তিনটি বিষয় আলোচিত হয় ঃ

১. দুনিয়ার অস্তিত্ব কেমন করে হল, কোথায় এর পরিণতি? এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায়, তার মর্যাদা কি? এবং মৃত্যুর পর কি হবে?

২. কথাবার্তা ও কর্মনীতি সম্পর্কে সেসব জরুরী আইন-বিধান, যা না হলে কোন সমাজই মজবুত ও সুদৃঢ় হতে পারেনা।

৩. আরাধনা-উপাসনা, যা ছাড়া আল্লাহ ও বান্দাহ্‌র মাঝে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে ও রক্ষা পেতে পারেনা।

গ্রন্থকারের মতে, অনেক সময় এ তিনটির সমন্বিত নামই ধর্ম আবার অনেক সময় এর একটিমাত্র দিককেই ধর্ম বলা যায়। এতে একথা সুস্পষ্ট যে, গ্রন্থকারের মতে ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে এটা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ধর্ম মানব জীবনের একটা বিভাগমাত্র নয়; বরং তা সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে।[১]

---

১. W.D. Gundry—Religion, p 7.

www.amarboi.org

ধর্মের এ বিভিন্ন সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর সংজ্ঞাদান পর্যায়ে কোন স্থায়ী ও চূড়ান্ত কথা বলা যেতে পারেনা। কেউ কেউ একে জীবনের সমগ্র দিকব্যাপী বিস্তৃত মনে করে, আবার কেউ মনে করে জীবনের একটা দিক মাত্র।

(ক) ধর্ম জীবনের একটা দিকমাত্র হলে তা সংস্কৃতির সমার্থবোধক হয়ে যায় আর তার একটা অংশও।

(ক) ধর্ম যদি মানুষের সমগ্র জীবনকে শামিল করে, তাহলে সংস্কৃতি ধর্মের একটা অংশ হবে। কেননা ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয় দিকব্যাপী বিস্তৃত হয়ে থাকে আর সংস্কৃতির আওতা হচ্ছে শুধু চিন্তাগত বিকাশ ও উৎকর্ষ। ধর্মের এ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে সত্য হোক আর না-ই হোক, ইসলাম সম্পর্কে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এজন্যে কুরআন মজীদে ইসলামকে 'দ্বীন' বলা হয়েছে আর 'দ্বীন' হচ্ছে সমগ্র জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিধান। মানব জীবনের সবকিছুই তার মধ্যে শামিল রয়েছে; জীবনের কোন একটি দিকও—কোন একটি ব্যাপারও—তার বাইরে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –

আল্লাহ্র নিকট সত্য ও গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

তা এক মজবুত ও সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা—ইব্রাহীমের অনুসৃত জীবন আদর্শ। তাতে একবিন্দু বক্রতা নেই আর ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

(সূরা আন'আম ঃ ১৬১)

বস্তুত ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের এ বিশাল ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শনের জন্যে চিন্তার দিক হল সংস্কৃতি। ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি—তাহ্জীব ও তামাদ্দুন—উভয় দিকেরই সমন্বয়। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা—এ দুটি পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন; কেননা এ দুটি দিকই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম ও শিল্পকলা

সংস্কৃতি পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পকলার প্রশ্নটিও সামনে ভেসে ওঠে। মানুষ দুনিয়ার জীবনে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য হয়। প্রতিমা, প্রতিকৃতি, কারুকার্যখচিত চিত্রকলা, আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানাদি, জন্ম-মৃত্যু, কুরবানী ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি মানুষকে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির অতি নিকটে পৌঁছে দেয়; তার

www.amarboi.org

হৃদয়াবেগকে সঞ্জীবিত ও প্রাণচঞ্চল করে তোলে। মৃত্যুর শেষ ক্রিয়াদিতে মাতম করা, গীত গাওয়া, মর্সীয়া, কবিতা ও শোক-গাঁথা পাঠ করা প্রভৃতির মাধ্যমে মৃতকে পরকাল যাত্রায় প্রস্তুত করে দেয়া হয়। প্রাচীন মিশরে লাশগুলোকে মমি বানিয়ে রাখা এবং লাশের চারপাশে নানা চিত্র অংকন করা হতো আর এভাবে সম্পন্ন করা হতো এক জগত থেকে অন্য জগতের মহাযাত্রা। অনুরূপভাবে বড় বড় সমাবেশে নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করা হতো। বর্তমানে খৃস্টান গীর্জায় সঙ্গীত গেয়ে এবং হিন্দু ও শিখ ধর্মে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এভাবে নানারূপ শৈল্পিক প্রকাশনার মাধ্যমে বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়; মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে এসবের প্রভাবে। কাজেই সংস্কৃতির সাথে শিল্পের যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, তা মানতেই হবে। তবু তাতেও ধর্মের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়ের ছাঁটাই-বাছাই চলা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চায় সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। শিল্পদৃষ্টি মানুষের মাঝে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশ অধ্যয়নের উদ্বোধন জাগায়। বৈজ্ঞানিক চেতনার রূপায়নে শিল্পের সাহায্য প্রত্যক্ষ। এমনিভাবে বিজ্ঞানের উৎকর্ষে পরোক্ষভাবে শিল্পের উন্নতির পথও সুগম হয়। যে কোন জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির মূল্যায়ন

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানব জীবনের পরম কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্যে যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর গুণের অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য, মহান ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি যদি দীন ও নিঃস্বও হন, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল বৈভবের অধিকারী।

বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবশ্য পালনীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি ও মূল্যাবধারণের

www.amarboi.org

প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলোর সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব হয়। অবশ্য সমাজ ও সমাজ-আদর্শ ভেদে এই মূল্যেরও যে পার্থক্য ঘটে, সংস্কৃতির মূল্যায়নে একথা স্পষ্টভাবেই মনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির সামাজিক মূল্যায়নে মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মানুষের তুলনায় সমাজকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু এ সত্য কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া চলেনা যে, মানুষ নিয়েই সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করাই সমাজের লক্ষ্য। ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) Culture বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে। ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা-ই হল সংস্কৃতি। ম্যাকেঞ্জী বলেন ঃ সংকীর্ণ অর্থে এ হল জন-সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা আর ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র।[১]

বস্তুত সংস্কৃতি এমন একটা কর্মোপযোগী সত্য যা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষকে এক আপেক্ষিক দৈহিক প্রশস্ততা দান করে। তার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগে। ব্যক্তিত্বের একটা সাম্প্রসারণতা—যাতে রয়েছে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা—মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে, যখন নিছক একটা রক্ত-মাংসের দেহ কোন কাজেই আসেনা।

সংস্কৃতি সমাজবদ্ধ মানুষের ফসল। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও কর্মশক্তিকে তা ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত করে দেয়। তা চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দেয় গাম্ভীর্য, শালীনতা ও সুসংবদ্ধতা; দৃষ্টিকে বানিয়ে দেয় উদার, বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য জীবজন্তু এ গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভার সামাজিক ও সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই হয় এসব অবস্থার উৎসমূল।

সংস্কৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলে আর সে সমাজগুলোকে এক অন্তহীন জীবন-ধারাবাহিকতা প্রদান করে। সংগঠন ও সুসংবদ্ধ সমাজ-কর্ম হচ্ছে ক্রমিক ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ফসল আর তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। তা মানুষের প্রতি কেবল দয়াই করেনা, সেই সঙ্গে তার ওপর অনেক বড় বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিকে তার নিজের অনেক স্বাধীনতাও কুরবানী দিতে হয়; সে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজের ভিতর থেকে পাওয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর তারই ফলে সম্পাদিত হতে পারে সামগ্রিক কল্যাণ।

---

১. Outlines of Social Phlilosophy : p 228

www.amarboi.org

মানুষকে নিয়ম-শৃংখলা, আইন-কানুন ও ঐতিহ্যের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়; নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কথাবার্তার ধরন-ধারণ এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে হয়। তাকে এমন অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয় যা থেকে সে নিজে নয়—পুরোপুরি অন্যরাই ফায়দা লাভ করে আর তাকে তার নিজের প্রয়োজনের জন্যে হতে হয় অন্যের দারস্থ।

মানুষের দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি তার মনের মাঝে অনেক প্রকার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা তাকে করে প্রশমিত—পরিতৃপ্ত।

সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানব আত্মারই পরিতৃপ্তির উপকরণ আর তারই দরুন মানুষ পশুর স্তর থেকে অনেক উর্ধে ওঠে এক উন্নত মানের বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

মানবীয় ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো দিক। একদিকে সে এক ব্যক্তি, একটা সমাজের অঙ্গ বা অংশ আর সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের পারস্পরিক মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনের ফলে। এরূপ একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে দায়ী হয়, অতীতের স্মৃতি তার মনে-মগজে ও হাড়ে-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে। সে স্মৃতির প্রতি তার হৃদয়ে থাকে অটুট মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারেনা। ভবিষ্যতের উজ্জল আলোই তার মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচ্ছুরণ ঘটায়। শ্রমের বন্টন ও ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনা তার সামনে এমন সব সুযোগ এনে দেয়, যার দরুন সে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, সুর ও ধ্বনি থেকে আনন্দ লাভ করতে ও পরিতৃপ্ত হতে পারে।

মোটকথা, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায়না আর ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটিই জীবন-কেন্দ্রিক। জীবন-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি অচিন্তনীয়। অন্যদিকে সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে নিয়েই ঘটে সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর। তাই সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হলে সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

সংস্কৃতির মৌল উপাদান

সংস্কৃতির সংজ্ঞাদান যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার মৌল উপাদান নির্ধারণ। কেননা কোন জিনিসের মৌল উপাদান নির্ধারণ তার মৌলিক ধারণা ও তাৎপর্যের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি বলতে যদি মানব জীবনের যাবতীয় কাজ বুঝায়, তা হলে শিল্প-কলা, সমাজ-সংস্থা, আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মচর্চা প্রভৃতি সবই তার মৌল উপাদানের মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। আর তার অর্থ যদি হয় বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং তার লালন ও বিকাশদান, তাহলে তার মৌল

www.amarboi.org

উপাদান হবে মতাদর্শিক ও চিন্তামূলক। ওপরে সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এই শেষোক্ত দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়েছি। একারণে আমাদের মতে সংস্কৃতির মৌল উপাদান হবে মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত। এক কথায় বলা যায়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোই সংস্কৃতির মৌল উপাদান হতে পারে ঃ

১. মানুষের জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধারণা—দুনিয়া কি, মানুষ কি এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক কি? দুনিয়ার জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে

২. মানব জীবনের লক্ষ্য কি, কোন্ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ চেষ্টা-সাধনা করবে, কি তার কর্তব্য?

৩. মানুষের জীবন ও চরিত্র কোন্ সব বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠবে? মানুষের মানসিকতাকে কোন্ ছাচে ঢেলে গড়তে হবে? উদ্দেশ্য লাভের জন্যে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করবে কোন্ কারণে, কে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে?

৪. মানুষকে কোন্ সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে? মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা কিরূপ হওয়া উচিত?

৫. মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ হবে? পারস্পরিক এ সম্পর্ককে বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে রক্ষা করতে হবে?

এ ক'টি মৌল উপাদানের দৃষ্টিতে আমরা এক-একটি সংস্কৃতির ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি—বুঝতে পারি তা সুসংবদ্ধ, না অবক্ষয়মান।

আর এ ক'টি মৌল উপাদানই হচ্ছে সংস্কৃতির চিন্তাগত ভিত্তি, মৌল নীতি-ভঙ্গি এবং চিন্তার উপকরণ। এ ক'টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেই সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এ ক'টির ভিত্তিতে যে বাস্তব রূপ গড়ে ওঠে, তা-ই হল সভ্যতা বা তামাদ্দুন (Civilization)। মানুষের জীবনের দুটি দিক প্রধান। একটি চিন্তা, অপরটি বাস্তব কাজ। চিন্তা হল তার সংস্কৃতি আর তার বাস্তব প্রকাশ হল তার তামাদ্দুন। পরন্তু চিন্তা যেমন ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, তেমনি সংস্কৃতিও হতে পারে ভালো এবং মন্দ; বরং আরেকটু স্পষ্টভাবে বলতে পারি, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেমন স্থূল হতে পারে, তেমনি হতে পারে গভীরতাপূর্ণ। অনুরূপভাবে সংস্কৃতিও হতে পারে স্থূল ও গভীরতাপূর্ণ। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের ভাষায় বলা যায়, মানুষের প্রকৃতির সাথে মানবীয় সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক, যা মানুষের আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ ও সৃজনশীল গুণপনার রয়েছে মানুষের প্রকৃতির সাথে। এ কারণে সংস্কৃতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ হতে পারে, তেমনি হতে পারে কৃত্রিম।[১]

১. Mohsin Mehdi, Ibn- Khaldun`s Philosophy, p 181

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতি কি?

সংস্কৃতি সম্পর্কে এ তত্ত্বমূলক আলোচনার পর আমার বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামেরও কি কোন সংস্কৃতি আছে? থাকলে কি তার দৃষ্টিকোণ? কি তার রূপরেখা?

ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে কিনা কিংবা সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলাম কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেয় কি-না, সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী 'ইসলামী সংস্কৃতি' বলতে কোন জিনিসকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি আবার কি? কেউ কেউ বলেন, ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে না-কি? থাকলেও গ্রীক, রোমান, প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক বা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে 'ইসলামী সংস্কৃতি' কথাটির ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি এ পর্যায়ের আলোচনায় উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'মুসলিম সংস্কৃতি'কে বুঝতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, উত্তর ভারতের মধ্যম শ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দু ফারসী ভাষা ও কিংবদন্তীতে খুবই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানতে পারা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পাজামা—না লম্বা না খাটো—বিশেষ ধরনে গোঁফ মুণ্ডন করা, দাড়ি রাখা এবং এক বিশেষ ধরনের লোটা—যার বিশেষ ধরনের থুথনি হবে, এগুলোই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি'। মুসলিম সংস্কৃতি তথা ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে মিঃ নেহেরুর এ উক্তি শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ঠিক করা যাচ্ছেনা।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরাও (Orientalists) মিঃ নেহেরুর চাইতে কোন অংশে কম যান না। জার্মান পণ্ডিত ভন ক্রেমার ও লেবাননী পণ্ডিত ফিলিপ হিট্টিও ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে মুসলমানরা যখন পারস্য ও মিশর জয় করে, তখন তারা প্রাচীন সভ্যতার ধারক লোকদের সম্মুখীন হয় এবং তারা সবকিছু এদের কাছ থেকে শিখে নেয়। আরো বলা হয়, আরব মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিলনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য-শাসন এ সবের কিছুই জানতনা মুসলমানরা। তবে এসব কিছু জানবার ও শেখবার বড় অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলমানদের মাঝে ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা বলেন ঃ গ্রীক, পারসিক ও আর্মেনিয়ান শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুনর্জীবন দান করেন প্রথমে আরব মুসলমানরা এবং পরে দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গার মুসলমানরা।

পণ্ডিত নেহেরুই হোন আর প্রাচ্যবিদ এসব বড় বড় পণ্ডিতরা, এরা কেউ-ই যে

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। আর ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে না পারার মূল কারণ যে ইসলামের প্রকৃত ভাবধারাকে বুঝতে না পারা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অথবা বলা যায়, তারা জেনে-শুনেই ইসলামী সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ করেছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন কিংবা এ-ও হতে পারে যে, তারা একটি ছিদ্র দিয়ে ইসলামকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলেই তাদের ধারণা এতদূর বাঁকা ও অর্থহীন হয়ে গেছে যে, তাঁরা তা টেরই পাননি।

কেবল প্রাচ্যবিদরাই নন—নয় কেবল প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা, ইসলামী সংস্কৃতিকে অস্বীকৃতি জানাতে কসুর করেননি এ যুগের এবং এ দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিও। শুধু তা-ই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং তথাকথিত মুসলিম নামধারী লেখকরাও ইসলামী সংস্কৃতিকে—সংস্কৃতির ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে তথা ইসলামী রূপরেখাকে বুঝতে পারেন নি; হয়ত-বা বুঝতে চেষ্টাই করেননি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা বলা যায় বুঝতে পেরেও তাকে অস্বীকারই করতে চেয়েছেন। কেননা অস্বীকার না করলে কিংবা তাকে সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিলে সংস্কৃতির নামে চলমান বর্তমানের আবর্জনা, অশ্লীলতা ও জঘন্যতাকে পরিহার করতে হয় আর তাকে পরিহার করলে জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির উৎসই যে বন্ধ হয়ে যাবে—মৌচাক যাবে শুকিয়ে। তখন জীবন যে যাবে মরু আরবের মত ঊষর-ধূসর-রুক্ষ-নিরস হয়ে। তখন বেঁচে থাকার স্বাদটুকুও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের জীবন-স্রোতে ভাসতে হবে, জীবনের গতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, বইতে হবে ভিন্ন স্রোত-বেগে আর তা তাদের পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। অতএব তাদের বলতে হয়েছে ঃ

> ‘স্থূলভাবে যারা ধর্মাচরণ এবং ধর্মভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বা তামাদ্দুন মনে করেন অথবা আরব-পারস্যের জ্ঞান-চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই সারা মুসলিম জাহানের সংস্কৃতি বলতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক দুঃসাধ্য। (দৈনিক সংবাদ)

হ্যাঁ, দুঃসাধ্যই বটে! দুনিয়ার মনীষীদের মত অনুযায়ী ‘ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস’ রূপে স্বীকার করে নিলে যে ধর্মকে মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মীয় অনুশাসন, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয় বর্তমানে সংস্কৃতির নামে চলমান অনেক অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার আবর্জনাকে। আর এক শ্রেণীর পোকা যে ময়লার স্তূপ ত্যাগ করলে মরে যায়, তাতো সকলেরই জানা কথা।

সংস্কৃতি ও ইসলাম

ইসলাম দুনিয়ার সকল জনগোষ্ঠীর সকল মৌল সত্যের সমষ্টি। তার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বজনীন ও সুদূরপ্রসারী। দুনিয়ার অন্য যেসব সংস্কৃতি বা

www.amarboi.org

সাংস্কৃতিক উপাদান তার মৌল ভাবধারার অনুকূল, তা সবই সে গ্রহণ করে নেয়। বস্তুত যে সংস্কৃতিতে ইসলাম-বিরোধী উপাদান ও উপকরণ রয়েছে, তা-ই সুস্পষ্টভাবে মানবতা বিরোধী; তার সাথে ইসলামের রয়েছে চিরন্তন সংঘর্ষ। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ দান কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ নয়। তাতে বরং সমগ্র মানব কল্যাণকর সংস্কৃতিই সংরক্ষিত হয় এবং তাতে করেই সমস্ত তামাদ্দুনিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি নয়—নয় তা পারসিক সংস্কৃতি। কাজেই গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। আল্লাহ্র কালাম কুরআন মজীদেই এ মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে এবং নবী করীম (স)-এর মহান জীবন ও শিক্ষায় তা পুরোপরি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায় ঃ

১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।

৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।[১]

অপর এক চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ ঃ একটি তার চিন্তার দিক আর অপরটি হল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ-সংস্থা। কিন্তু আমরা প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি বলে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে; যেমন আল্লাহ্র একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।[২]

মানুষের চিন্তাগত জীবন এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই আলোক-উদ্ভাসিত হয় এবং গোটা মানববংশ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এ আলোকচ্ছটায়। আসলে ইসলামী সংস্কৃতি আলোর এক সুউচ্চ মীনার; এ থেকেই ইসলামী সভ্যতা রূপায়িত হয়। এ মীনারই সমগ্র জগতের সংস্কৃতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে, আপনও বানিয়ে নিয়েছে।

১. Islamic Culture. p. 6

২. International colloqium p. 26

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

দুনিয়ার সব জিনিষের মতো সংস্কৃতিরও একটা লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যহীন সংস্কৃতি আদপেই সংস্কৃতি নামের যোগ্য নয়; তা নিতান্ত তামাসা মাত্র—তা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও উদ্দেশ্যহীনতাই বর্তমান সভ্যতার মৌল ভাবধারা; সর্ব-প্রযত্নে উদ্দেশ্যবাদকে (Objectivity) পরিহার করে চলাই এখনকার সমাজের একটা ফ্যাশান। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলবার মতো সময় এখন উপস্থিত যে, উদ্দেশ্যহীনতা নেহাত পশুকুলের বিশেষত্ব; পক্ষান্তরে মানুষের বৈশিষ্ট্যই হল তার উদ্দেশ্যবাদিতা। তাই উদ্দেশ্যবাদকে হারালে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকেনা। উদ্দেশ্যবাদ তথা উদ্দেশ্যের বিচারে ভুল-নির্ভুল নির্ধারণ এবং ভুল-কে বাদ দিয়ে নির্ভুল-কে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

তাহলে মানবীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? সংস্কৃতি শব্দটিই উদ্দেশ্যের প্রবণতা ব্যক্ত করে। বাংলা সংস্কৃতি, ইংরেজী কালচার (Culture) এবং উর্দু-আরবী তাহযীব কিংবা সাক্বাফাত—এ শব্দ তিনটির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতির একটা-না-একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতেই হবে। অন্যথায় তার কোন অর্থ হয় না—হতে পারেনা তার কোন বাস্তব রূপ এবং মানব জীবনেও তার কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পরিচ্ছন্নতা বিধান। আর কালচার বলতে বুঝায় কৃষিকাজ। তাহযীবও পরিচ্ছন্নকরণ ও উন্নয়নকে বুঝায় আর সাক্বাফাতের অর্থ হল তীক্ষ্ণ, শানিত ও তেজস্বী করে তোলা। এর প্রতিটি অর্থেই উদ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা বিধৃত। 'সংশোধন' শব্দ শোনামাত্রই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভুলগুলোকে বাদ-সাদ দিয়ে তদস্থলে সঠিক ও নির্ভুল জিনিস সংস্থাপন। পরিশুদ্ধকরণ তখনি বলা চলে, যখন অপবিত্র ও অশুদ্ধ জিনিস দূর করে দেয়া হবে। আর কৃষিকাজ হল জমির আগাছা-পরগাছা ও ঝাড়-জঙ্গল কেটে ফেলে, অবাঞ্ছিত তৃণ-লতা উপড়ে ফেলে লাঙ্গল দিয়ে হাল চালিয়ে জমিকে নরম-মসৃন করে সেখানে বীজ বপন করা। এসব ক্ষেত্রেই ভাঙা-গড়ার ন্যায় নেতিবাচক কাজের পর ইতিবাচক কাজের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট। একদিকে ছাঁটাই-বাছাই ও বর্জন এবং অপরদিকে মনন, আহরণ ও গ্রহণ। বস্তুত এসব কাজের নির্ভুল, যৌক্তিক ও বিচক্ষণ সম্পাদনেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক।

www.amarboi.org

সংস্কৃতির উদ্দেশ্যমুখীনতা অনুধাবনের জন্যে কৃষিকাজের কথাটা অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। জমিতে যেসব আবর্জনা, ঝাড়-জঙ্গল, ঘাসের শিকড় ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে, চাষী সেগুলোকে লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে উপড়ে ফেলে মাটির সাথে গুড়িয়ে মিশিয়ে দেয়। আর যেগুলো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে রাজী নয়, সেগুলোকে সে নিড়িয়ে আলাদা করে রাখে, যেন তা ফসলের চারা গজাতে ও তাতে ফসল ফলতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে।

এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এপর্যায়ে মাটিকে অত্যন্ত নরম তুলতুলে করে তোলা তুলে তার ওপর বীজ বপন করা হয়, যেন মাটি সহজেই বীজকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার শিকড় গজাতে ও অংকুর বের হতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা না দেয়; বরং একাজে মাটি পুরোমাত্রায় অনুকূল ও সহায়ক হয়।

এখানেই চাষীর কাজ শেষ হয়ে যায়না। জমিতে বপন করা বীজ যাতে করে পচে যেতে না পারে, উড়ো পাখী বা পোকা-মাকড় তা খেয়ে না ফেলে এবং লোনা পানি বা কচুরীপানা এসে গোটা ক্ষেতকে ধ্বংস করে না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তার জন্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চাষীর এ গোটা কর্মধারারই অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।

সংস্কৃতির ক্ষেত হল মানুষের মন-মগজ, রুচিবোধ, আচার-অনষ্ঠান এবং জীবন ও চরিত্র। এ সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী মানুষের একক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতির সাধনা। চাষীর শ্রম-মেহনত, চেষ্টা-সাধনা ও সতর্কতা যেমন উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, তেমনি সংস্কৃতির সাধনাও কোন পর্যায়েই উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া কাম্য নয়।

চাষীর লক্ষ্য যেমন ক্ষেত-ভরা সোনার ফসল ফলানো, তেমনি সংস্কৃতি-সাধনারও লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, মার্জিত, ভদ্র এবং আদর্শবান, রুচিশীল ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা।

জমিতে কিছু একটা ফলাতে হলে চাষ করা অপরিহার্য। অবশ্য ফসলের তারতম্যের কারণে চাষের ধরন ও মাত্রায় পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যে-ধরনের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, সেই ধরনের সংস্কৃতি-চর্চা করা ছাড়া উপায় নেই। আর মানুষ সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন হওয়ার কারণে সংস্কৃতির ধারণা, তার অনুশীলন ও অন্তর্নিহিত ভাবধারায়ও আকাশ-পাতালের পার্থক্য হওয়া অবধারিত। চাষী যে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক তাকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জমিতে অনুরূপ চাষই দিতে হবে, তারই বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে এবং তার পক্ষে যা যা ক্ষতিকর তার প্রতিরোধও করতে হবে। অন্যথায় তার সব শ্রম-মেহনত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সংস্কৃতি মানুষ গড়ার প্রধান হাতিয়ার। তাই যে ধরনের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, তারই অনুরূপ ধারণা-বিশ্বাস,

www.amarboi.org

মূল্যমান, রুচিবোধ ও ভাবধারার বীজ মানুষের হৃদয়ে বপন করতে হবে; তার লালন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আর তার পক্ষে ক্ষতিকর যেসব মূল্যবোধ ও আকীদা-বিশ্বাস, তাকে রোধ করার ও তার হামলা থেকে জন-সমাজকে রক্ষা করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চিন্তা-বিশ্বাস, শিক্ষা প্রচার এবং শাসন ও জন-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে। এরূপ করা সম্ভব হলেই আশা করা যেতে পারে যে, বাঞ্ছিত মানুষ গড়ে ওঠবে।

এভাবে যেসব মানুষ গড়ে ওঠে কিংবা বলা যায়, যাদের জীবনে ও চরিত্রে এভাবে সংস্কৃতির রূপায়ন ঘটে—প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির স্বচ্ছ ও পূর্ণ-পরিণত ভাবধারা, তারাই হল সংস্কৃতিবান মানুষ (Cultured man)।

বস্তুত সংস্কৃতির লক্ষ্য যেমন মানুষের অভ্যন্তরে বিশেষ গুণাবলী সৃষ্টি করা, তেমনি মানুষের বাহ্যিক জীবনকে—তার আচার-আচরণকে একটি বিশেষ আদর্শে রূপায়িত করে তোলাও তার লক্ষ্যের মধ্যে শামিল। যেসব জ্ঞান, চিন্তা, বিশ্বাস, রুচি ও ভাবধারা মানুষের মনোলোককে বিশেষ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে এবং যে সব বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান মানুষের অন্তরে সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে, যেসব কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষের বাহ্যিক জীবনকে—ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবনকে—বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে প্রোজ্জ্বল করা সম্ভব, তা-ই হল সংস্কৃতির বাহন।

প্রচলিত ধরনের শিক্ষা, জ্ঞানানুসন্ধান, শিক্ষণীয় বিষয়াদির অনুশীলন এবং বিশেষভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নির্মাণ, চিত্র-শিল্প, কাব্য-সাহিত্য চর্চা, নৃত্য-সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং এ-পর্যায়ের অন্যান্য ললিতকলা হচ্ছে সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান। একটা নাচ-গানের অনুষ্ঠানকে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলা হয়, তেমনি ডিবেট, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফ্যাশান শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, মীনা বাজার ইত্যাদি অনুষ্ঠানকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। এসব বাহ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদন, মনের তৃপ্তি-স্বস্তি এবং সুখ ও আনন্দ লাভই হচ্ছে এর মূলে নিহিত আসল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, আধুনিক ধারণামতে সংস্কৃতির এই হল লক্ষ্য এবং কম-বেশি এ ক'টি জিনিসকেই সংস্কৃতির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার হল, সংস্কৃতি কেবলমাত্র এ ক'টি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—নয় কেবলমাত্র এ ক'টিই তার নির্দিষ্ট মাধ্যম। বস্তুত সংস্কৃতির পরিধি অতীব ব্যাপক। তার মাধ্যম হল মানুষের সমগ্র জীবন, জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ—সমস্ত কাজ, ব্যস্ততা ও তৎপরতা। শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন ও আনন্দ-সুখ লাভ করাকেই সংস্কৃতির লক্ষ্য মনে করা এবং কেবলমাত্র উপরোক্ত অনুষ্ঠান ক'টিকেই সংস্কৃতির মাধ্যম বলে ধরে নেয়া সংস্কৃতিরই অপমান।

www.amarboi.org

ফিলিপ বাগবীর কথায় এরই পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছেন ঃ

কালচার বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি এবং চরিত্রের সবগুলো দিককে পরিব্যাপ্ত করে।

বাগবীর এ উদ্ধৃতিতে সংস্কৃতির একটা ব্যাপক ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সংস্কৃতির এ ব্যাপক সংজ্ঞাতেই তার তাৎপর্য নির্ভুলভাবে বিধৃত। ইসলামের সংস্কৃতি চেতনা এমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক। তা বিশেষ কয়েকটি কিংবা নির্দিষ্ট কতকগুলো উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই নয় তার একমাত্র অভিব্যক্তি।

কিন্তু সংস্কৃতির মৌল উদ্দেশ্য কি? সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যে মানুষ গড়তে হবে, সে মানুষ কেমন হবে—কি হবে তার নৈতিক মূল্যমান? তার ভালো কি মন্দ কি—কি গ্রহণীয় এবং কি বর্জনীয়? তার উচিত বা অনুচিত বোধের ভিত্তি কি হবে? কোন্ জিনিসে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হওয়া উচিত এবং কোন্‌টায় দুঃখ ও ব্যথা?.......এ সবের জবাব এক-একটা আদর্শের দিক দিয়ে এক এক রকম। এ বিষয়ে ইসলামী ধারণা ও আধুনিক চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা রাজপথ। যে কোন দিকে যেতে হলে এ পথ দিয়েই যেতে হবে সবাইকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাওয়া হবে কোন্ দিকে, কিভাবে এবং কেন? এই কোন্ দিকে, কিভাবে এবং কেন'র প্রশ্ন নিয়েই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যত বিরোধ ও সংঘাত। এ কথাটি খুবই বিস্তারিতভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

সংস্কৃতিকে মনে করা যেতে পারে একটা প্রবহমান নদী। নদীতে যেমন স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হয়, তেমনি প্রবাহিত হয় কাদা পানি—ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি।

যে লোক এ নদী থেকে স্বচ্ছ পানি গ্রহণ করতে চায়, তাকে অন্ধের মত নদীর যে কোন স্থান থেকে পানি তুলে নিলে চলবে না। তাকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে হবে, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি কোন্‌খানে প্রবাহিত হচ্ছে। মাঝ নদী কিংবা গভীর তলদেশ—যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তাকে পানি তুলে নিতে হবে। এ স্বচ্ছ পানি তুলে নেয়ার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে, তার সাথে যেন কোন ময়লা, আবর্জনা কিংবা সাপ-বিচ্ছু চলে না আসে। তা না হলে শুধু কাদা পানি কিংবা ময়লা-আবর্জনাযুক্ত পানিই তাকে পান করতে হবে অথবা স্বচ্ছ পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে সাপ-বিচ্ছুর দংশনেও জর্জরিত হতে হবে।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতির ব্যাপারে মূল লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব সব চাইতে বেশী। আসলে এটাই হল খাঁটি স্বর্ণ ও কৃত্রিম স্বর্ণ যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

www.amarboi.org

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ছাঁটাই-বাছাই-এর প্রশ্নটির গুরুত্ব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কেননা সংস্কৃতি-অনুরাগী মানুষ সংস্কৃতি নামের প্রচলিত আবর্জনাকে গ্রহণ করতে কখনো রাজী হতে পারে না। সে তো যাচাই-বাছাই করে এক ধরনের সংস্কৃতিকে বর্জন করবে আর অপর এক ধরনের সংস্কৃতিকে মন-প্রাণ-হৃদয় ও জীবন দিয়ে গ্রহণ করবে। সত্যিকার সংস্কৃতিবান মানুষের এইতো পরিচয়। সংস্কৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্জন-গ্রহণের এ মানদণ্ড হচ্ছে প্রত্যেকের জীবন দর্শন। যার জীবন দর্শন যেরূপ তার সংস্কৃতি তারই অনুরূপ—তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেননা জীবন-দর্শনের উৎস থেকেই সংস্কৃতি উৎসারিত।

দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই একটা জীবন দর্শন রয়েছে। আর জীবন-দর্শনে যেহেতু পার্থক্য রয়েছে সেই কারণে সংস্কৃতি-বিষয়ক ধারণা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও মৌলিক পার্থক্য হওয়া অবধারিত। এখানে স্মর্তব্য যে, জীবন-দর্শন উদ্ভূত হয় জীবনাদর্শ থেকে। জীবনাদর্শ যা, জীবন-দর্শনও তাই। আর দুনিয়ার মানুষের জীবনাদর্শ যেহেতু বিভিন্ন, তাই জীবন-দর্শনেও বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জীবন-দর্শনের এই বিভিন্নতার কারণে সংস্কৃতিরও বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য একান্তই অনিবার্য।

তাই তো দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদ যাদের জীবনাদর্শ, তাদের সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত; আন্তর্জাতিকতা সেখানে সযত্নে পরিত্যক্ত। আবার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিও বিভিন্ন রূপ। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার সংস্কৃতিতে অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষ তীব্রভাবে বর্তমান; আঞ্চলিক জাতীয়তায় অপর অঞ্চলের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার অবস্থাও অনুরূপ। সর্বোপরি জাতীয়তাবাদ একটা বস্তু-নির্ভর ব্যাপার বলে সেখানে বস্তুর প্রাধান্য সর্বত্র। নির্বস্তুক (Abstract) আদর্শমূলক সংস্কৃতির সেখানে কোন স্থান নেই।

কেবল জাতীয়তাবাদেই নয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান। একটি অপরটির মূলোচ্ছেদে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকটও তাই সংস্কৃতির একটা ইসলামী ধারণা নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে ছাঁটাই-বাছাই তথা বর্জন ও গ্রহণের নীতি অবলম্বন অতীব স্বাভাবিক। সংস্কৃতি নামে চলমান যে কোন জিনিসকেই ইসলামী জনতা সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না।

বস্তুত প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থাই তার নিজস্ব মানে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করে। তাই যে ধরনের মানুষ ও সমাজ গঠন তার লক্ষ্য সেরূপ মানুষ ও সমাজ গড়ে ওঠতে পারে যে

www.amarboi.org

সংস্কৃতির সাহায্যে, তা-ই সে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করে তোলে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে এবং তার বিপরীত সংস্কৃতিকে প্রতিহত করে কার্যকর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে।

ইসলামও একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ—একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। তাই তার ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মান (Standard) সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে এবং তার পরিকল্পিত মানুষ ও সমাজ গঠনের উপযোগী সংস্কৃতি তাকে অবশ্যই গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে পশুর উত্তরাধিকারী এক বিশেষ জীবমাত্র মনে করে; তা বিশ্বলোককে মনে করে খোদাহীন, স্বয়ম্ভু। তাই এই দর্শনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্কে মেনে চলার এবং আল্লাহ্র দেয়া কোন বিধান তথা ধর্মমত মেনে নেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের নেই। আর মানুষ নিতান্ত পশু বলে তার কোন মূল্যবোধ (Sence of Value) ও মূল্যমান থাকারও প্রয়োজন নেই।

এই মৌলিক কারণেই সংস্কৃতি নিছক চিত্ত-বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে পাশ্চাত্য সমাজে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এই চিত্ত-বিনোদন পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্য গ্রহণীয়। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে তো প্রতি মুহূর্ত 'আরো চাই, আরো দাও'-এর দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্য-নতুন ধরনে ও অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় অবিশ্রান্তভাবে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাথমিক উপকরণ হল গান-বাজনা ও নৃত্য। আসলে এগুলো প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পূজা-অর্চনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বহুকাল থেকে চলে এসেছে। দেবতার সামনে সুন্দরী যুবতী রমণীর আরতি দান দেব-পূজারই এক বিশেষ অনুষ্ঠান। হাতে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মিষ্টি মধুর-কণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে দেবতার পদতলে অর্ঘ্যের ডালি সঁপে দেয়া হিন্দু সমাজের এক বিশেষ ধরনের পূজা অনুষ্ঠান। উত্তরকালে সংস্কৃতি-পূজারীরা এ পূজা অনুষ্ঠানকেই মন্দিরের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে একে বিশাল হল ঘরের সুসজ্জিত ও সুউচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। যা ছিল দেবতার সম্মুখে নিজকে পূর্ণমাত্রায় নিবেদিত করার একটা বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান, উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে তাকেই বানানো হল চিত্তবিনোদন তথা রস-পিপাসু মানুষের সম্মুখে উপভোগ্য রূপে নিজেকে নিবেদন করার প্রধান মাধ্যম। অতঃপর নাচ-গান ও বাজনার এ অনুষ্ঠান মঞ্চের ওপর এসে ক্রমশ বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে করতে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। একক নৃত্য, যুগলনৃত্য, বল নাচ, কোরাস-নাচ ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যময় নাচ-গানের সঙ্গে এসে মিশেছে অভিনয় এবং তা অবশ্যই প্রেমাভিনয়। এ সব দ্বারা চিত্তবিনোদন হয় বলে এখন এটা পাশ্চাত্য ও

www.amarboi.org

বস্তুবাদী জীবন-দর্শনপ্রসূত সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত। প্রথম দিকে ছিল একক গান, এখন তা যুগ্ম ও সমবেত। এর সাথে শুরু হল নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর সহ-অভিনয়—প্রেমাভিনয়; কিন্তু তাতেও চিত্তবিনোদনের কাজ সম্পূর্ণতা পেল না। ফলে শুরু হল অর্ধ নগ্ন ও প্রায়-উলঙ্গ নৃত্য-সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। নারী-পুরুষের প্রকাশ্য চুম্বন, আলিঙ্গন ও যৌন মিলনের অনুষ্ঠানও মঞ্চের ওপরই দেখানো শুরু হল শত-সহস্র নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর বিস্ফারিত ও বিস্মিত চোখের সামনে। কেননা এটা না দেখানো পর্যন্ত চিত্তবিনোদনের অন্তত ক্ষুধা নিবৃত্ত হতে পারেনা—চরিতার্থ হতে পারেনা মনের অসীম-উদগ্র কামনা।

পূর্বেই বলেছি, আলোচ্য সংস্কৃতি দর্শনে মানুষ পশু শ্রেণীরই একটি জীবমাত্র এবং সে কারণেই তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের কোন প্রশ্ন ওঠতে পারেনা বলে মানুষের লজ্জা ও শরমেরও কোন বালাই থাকার কথা নয়। তাই সংস্কৃতি-মঞ্চে বেশী বেশী নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌকর্যেরই পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াল। আর যে তা যত বেশী দেখাতে পারবে, সে সকলের নিকট বরিত হবে তত বেশী সার্থক শিল্পী রূপে। সংস্কৃতি জগতের সে হবে একজন বিরাট 'হীরো'।

পশ্চিমা সমাজে যে যুবক-যুবতীরা যুগ্ম ও সমবেতভাবে প্রায়-নগ্ন কিংবা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রস্নান এবং সমুদ্র-সৈকতে সমুদ্র-স্নানের উৎসব পালন করছে, তারা তো চিত্তবিনোদনেরই নানা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। এতে কোন লজ্জা নেই—নেই কারোর একবিন্দু আপত্তি; বরং সমগ্র শিক্ষা ও পরিবেশ থেকেই তা নিত্য বাহ্‌বা পাচ্ছে। কেননা এসব নিতান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বই তো কিছু নয়!

এভাবে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন—যার একটি শাখায় রয়েছে পুঁজিবাদ এবং অপর দিকে রয়েছে সমাজতন্ত্র—আর সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পাওয়া গেছে হাজার বছরের পৌত্তলিক সাংস্কৃতি; এই সব মিলে আজকের মানুষকে ঠিক পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। কেননা এ দর্শন মানুষকে নিতান্ত পশু বা পশুর বংশধর ছাড়া কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টি মনে করে না। আর পশুকে অধিক পাশবিকতা শিক্ষা না দিলে তাকে যেমন সত্যিকার পশু বানানো যায় না, তেমনি পাশবিকতার কাজে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ লাভও সম্ভবপর হয়না। তাই বর্তমান কালের সংস্কৃতিতে এ পর্যন্ত যতটা উৎকর্ষ লাভ করা গিয়েছে, তা সবই পাশবিকতারই উন্নতি সাধন করেছে। এ 'পশু'কে মনুষত্বে রূপান্তরিত করার কোন চিন্তাই এখানে করা হয়নি—মনুষ্যত্বের দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন খেয়ালই জাগেনি এই 'পশুত্ববাদী'দের সংস্কৃতি চর্চায়।

কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আগাগোড়াই তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা পথে অগ্রসরমান এক আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু একটি সৃষ্টিমাত্র নয়—যেমন অন্যান্য হাজারো সৃষ্টি; বরং মানুষ হল আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি—বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক

www.amarboi.org

ও দায়িত্বশীল সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম প্রজাতি—আশরাফুল মখলুকাত। অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করাই মানুষের এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্য এ দুনিয়ায়ই অর্জিত হতে হবে—সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যেই। কিন্তু তার সবটাই এখানে শেষ হবে না, তার পূর্ণ পরিণতি ও প্রতিফলন ঘটবে এই জীবনের অবসান ঘটার পর অপর এক জগতে। সেজন্যে এই জগতের জীবনকে মানুষ পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একান্তভাবে উৎসর্গ করে দেবে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় মানুষের বসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের রচিত জীবন বিধান (ইসলাম) নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিদের মারফতে।

ইসলামের লক্ষ্য হল মানুষকে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাহ রূপে গড়ে তোলা। আর আল্লাহ্‌র মনোপুত কাজের মাধ্যমে তাঁর সন্তোষ লাভের অধিকারী হওয়াই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। তাই নিজেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র উপযুক্ত বান্দাহ রূপে গড়ে তোলাই হল ইসলামের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কুরআন মজীদে এ কথাই বলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় ঃ

> যে 'তায্‌কিয়া' লাভ করল এবং তার আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করল সেই সঙ্গে নামাযও পড়ল, সে-ই সত্যিকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করল। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিচ্ছ, যদিও পরকালই হচ্ছে অধিক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

এ আয়াতে যে 'তায্‌কীয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে হল পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি লাভ—চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা, মন-মানস, আকীদা-বিশ্বাস দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমান তথা মন ও দেহের পরিশুদ্ধতা আর ইসলামী সংস্কৃতিও এটাই।

অতএব যে সব কাজে সে পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তা-ই ইসলামী সাংস্কৃতি। যাতে তা হয় না, বরং যাতে মন-মানস তথা জীবন ও চরিত্র হয় কলুষিত তা ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা, তাঁকে কখনো কোন অবস্থায়ই ভুলে না যাওয়া, তাঁর বন্দেগীর প্রবল তাগিদে রীতিমত নামায পড়া—এগুলোই হল ইসলামী সংস্কৃতির বাছাই করা অনুষ্ঠান। এ সবের মাধ্যমে নরনারীর আত্মা, মন-মানস ও জীবনের যে পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধান হয়, তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

অতএব এ বৈষয়িক জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া, বস্তুসর্বস্ব আয়েশ-আরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং পরকালীন জীবনের অনিবার্য সত্যকে

www.amarboi.org

বেমালুম ভুলে যাওয়া কিংবা তা উপেক্ষা করে চলা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী ভাবধারা। পক্ষান্তরে পরকালকে সম্মুখে রেখে—পরকালের কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আদর্শবাদী জীবন যাপন করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদনই হল ইসলামী সংস্কৃতির অনুকূল জীবনাচরণ।

অন্যকথায়, আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ও তৃপ্তির পরিবর্তে দেহের ক্ষণস্থায়ী আরাম ও তৃপ্তি লাভ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। তা হল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য। একে এক কথায় বলা যায় ভোগবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈষয়িক ও দৈহিক পরিতৃপ্তির কোন স্থান নেই, এটা মনে করাও ভুল। কেননা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সর্ব প্রকারের করণীয় কাজ সুসম্পন্ন করা, আল্লাহ্র দেয়া যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করা এবং তার শোকর আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতিরই ঐকান্তিক দাবি। কিন্তু যে ধরনের দৈহিক ও বস্তুগত ভোগ-বিলাস ও আচার-আচরণে আল্লাহ্র বিধান লংঘিত হয়—আল্লাহ্র অসন্তোষ উৎক্ষিপ্ত হয়, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বৈষয়িকতা-রূপ দানবের পদতলে দলিত-মথিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইসলামী সংস্কৃতির সব সুকোমল কুসুম-কলি।

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি কোন সংকীর্ণ জিনিস নয়—নয় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন যত ব্যাপক, ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রও ততই বিস্তীর্ণ। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই প্রতি মূহূর্ত ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে, ধ্বনি-মর্মরিত হয়ে ওঠে প্রতিটি পদক্ষেপে। বালবের (Bulb) স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎছটা যেমন করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে সব কিছু, ইসলামী সংস্কৃতির তেমনি প্রতিফলন ঘটে সমগ্র জীবনে। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও সে জীবন-দর্শনের অনুসারী লোকদের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে থাকে। ফলে প্রতিটি মানুষের কথাবার্তা, কাজকর্ম, চলাফিরা, ওঠা-বসা এবং এই সবের ধরন, পদ্ধতি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমেই জানতে পারা যায় সে কোন্ সংস্কৃতির ধারক।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাবার খাওয়া। খায় সবাই—মানুষ মাত্রই খাদ্য গ্রহণে বাধ্য। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবে, ডান হাত দিয়ে খাবে, খাওয়ার সময় সে আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করবে ও তাঁর শোকরের ভাবধারায় তার অন্তর ভরপুর হয়ে থাকবে। বাহ্যত সে হাতে ও মুখে খাবে; কিন্তু তার মন তাকে বলতে থাকবে, এ খাবার একান্তভাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহেই পাওয়া গেছে। তিনি না দিলে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাই সে খাবারের প্রতি কোন অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করবেনা, অহঙ্কারীর মত বসে খাবেনা এবং

www.amarboi.org

খেয়ে মনে কোন অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা জাগতে দেবেনা; বরং খাওয়া শেষ করে সে আন্তরিকভাবে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

সমস্ত শোকর ও তারীফ-প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

খাওয়া মানুষের জীবন ধারনের এক অপরিহার্য কাজ। না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারেনা। মানুষকেও খেতে হয়—খেতে হয় জন্তু-জানোয়ারকেও। কিন্তু মানুষের খাওয়া ও গরুর খাওয়া কি একই ধরনের, একই ভাবধারার ও অভিন্ন পরিণতির হবে? তা হলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য থাকল কোথায়? তাই মানুষের মতো খাওয়া এবং খেয়ে মানবোচিত পরিণতি লাভই হল খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে গরুর মতো জাবর কাটা এবং কোনরূপ আত্মিক সম্পর্কহীনভাবে খাদ্য গ্রহণ হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিশেষত্ব।

ইসলামী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিও পথ চলে, যেমন চলে দুনিয়ার হাজারো মানুষ। কিন্তু তার পথ চলা নিরুদ্দেশ, দিশেহারা ও লক্ষ্যহীন নয়; পথ চলার সময় তার মনে জাগেনা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার অস্বাভাবিক ভাবধারা। পথ চলতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাকে সে কখনো লংঘন করেনা। প্রতিটি পদক্ষেপে পথি-পার্শের দৃশ্য অবলোকনে, লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সহযাত্রীদের সাথে আচার-আচরণে কোথাও সে মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে হারায় না। হারাম পথে তার পা বাড়ায় না, অন্যায় কাজে সে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয় না। পথ চলা কালে সে কোন মুহূর্তে ভুলে যায় না আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ ঃ

'দুনিয়ায় অহঙ্কারী হয়ে পথ চলোনা। কেননা যত অহঙ্কারই তুমি করো না কেন, না তুমি ভূপৃষ্ঠকে দীর্ণ ও চূর্ণ করতে পারবে, না পারবে পর্বতের ন্যায় উচ্চতায় পৌছতে।' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)

এ কারণে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক যখন পথে বের হয়, তখন তার দ্বারা কারোর কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। সে নিজেকে হাজারো মানুষের সমান কাতারে একাকার করে দেয়, নিজের বড়ত্ব দেখাবার মতো কোন কথাও সে বলেনা—কোন কাজও করে না ; তেমন কোন আচার-অনুষ্ঠানকেও সে হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারেনা। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-বিশ্বাসী লোকের আচার-আচরণ, কথা-কাজ, ভাবধারা ও অনুষ্ঠানাদি হয় এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার চলার ভঙ্গি দেখে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জাগে, কোন দৈত্য-দানব যেন ছুটেছে সব কিছু দলিত-মথিত করে—সকলের জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তার এ পথ চলায় সাধারণ মানুষের মনে জাগে ভীতি ও আতঙ্ক। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা ও ব্যক্তিগত বড়াইসূচক জয়ধ্বনি সে পায় প্রচুর; কিন্তু তাতে আন্তরিকতার খুশবু থাকে না একবিন্দুও।

www.amarboi.org

ইসলামী সংস্কৃতির ধারকও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করবে—শিখবে ও চর্চা করবে। কিন্তু গর্দভের বোঝা বহনের মতো হবেনা তা। তার মাধ্যমে বস্তুর পুতুলনাচে মুগ্ধ হয়ে পুতুল-পূজায় মেতে উঠবেনা সে। বস্তুর বিশ্লেষণে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে সে বিস্মিত হবে এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরাতের সামনে নিজেকে করে দেবে বিনয়াবনত। তার কণ্ঠে স্বতঃই উচ্চারিত হবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ঃ

'কত পবিত্র মহান তুমি হে খোদা কত সুন্দর উত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি! 'হে খোদা! তুমি কোন একটি বস্তুও অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করো নি!'

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে এর বিপরীত ভাবধারার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একটা গরুর চোখের পাতায়ও প্রতিফলিত হয় এ পৃথিবীর মনোরম দৃশ্যাবলী, একজন মানুষের চোখেও তাই। কিন্তু মানুষের চোখের প্রতিফলন ও গরুর চোখের প্রতিফলন কি কোন দিক দিয়েই এক হতে পারে? এখানে যে পার্থক্য ধরা পড়ে বস্তু-বিজ্ঞান বিশ্লেষণে, ঠিক সেই পার্থক্যই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতির মাঝে।

জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রম-মেহনত সবাইকে করতে হয়। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলে নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে—ঈমানের তাগিদে। এ সবের মাধ্যমে সে যা কিছু অর্জন করে, তাকে আল্লাহ্‌র দান মনে করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা দিয়ে সে একদিকে যেমন নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করে, সেই সঙ্গে তাতে সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মানুষেরও প্রাপ্য রয়েছে বলে সে মনে করে। ফলে তার অর্থব্যয়ে এক অনুপম ভারসাম্য স্থাপিত হয়। সে না নিজেকে বঞ্চিত রাখে, না অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে; বরং সে নিজ থেকেই পৌঁছে দেয় যার হক্ তার কাছে।

সেজন্যে সে কারোর ওপর না স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহাদুরী দেখায়, না তার বিনিময়ে কাউকে নিজের গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। তার মনোভাব হয় এই যে, তার একার শ্রম-শক্তিই তা অর্জন করেনি; বরং তাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও শামিল রয়েছে। (এ শ্রম-শক্তিও তো তার নিজস্ব কিছু নয়, তাও তো আল্লাহ্‌রই প্রদত্ত) তাহলে তার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ তার একার ভোগাধিকারের বস্তু হবে কেন? তাতে কেন স্বীকৃত হবেনা আল্লাহ্‌র এমন সব বান্দাহ্‌দের অধিকার, যারা তার সমান কিংবা প্রয়োজন অনুরূপ উপার্জন করতে পারেনি?.....তাই সে নিজের একারই ভোগ-বিলাস, আয়েশ-আরাম ও সুখ-সজ্জায় তার যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে পারে না; বরং নিজের মধ্যম মানের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে,

www.amarboi.org

তা সে তুলে দেবে তারই মত সমাজের হাজারো বঞ্চিত মানুষের হাতে তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের মাঝে সৃষ্টি হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা ও অবস্থা। সেখানে মানুষ অর্থোপার্জনেও ন্যায়-অন্যায় ও হক-না-হকের তারতম্য করে না, বাছ-বিচার করেনা ব্যয় করার বেলায়ও। অর্জিত সম্পদ—পরিমাণ তার যা-ই হোকনা কেন—একান্তভাবে মালিকেরই ভোগ্য; তাতে স্বীকৃত হয়না অন্য কারোর একবিন্দু অধিকার। শোষণ, বঞ্চনা ও ব্যয়-বাহুল্যই সে সংস্কৃতির অনিবার্য প্রতিফল। এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বদিকে। হিংসা ও বিদ্বেষের প্রচণ্ড আগুন জ্বলে ওঠে বঞ্চিত লোকদের মন-মগজে। তখন তাদের বিরুদ্ধে ধূর্ত শোষকরা আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 'সর্বহারাদের রাজত্বের' দোহাই দিয়ে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যেখানে এ বঞ্চিত ও সর্বহারাদের চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তখন তারা না পারে তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে, না পারে বিদ্রোহ করে সে সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করতে। ফলে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটেনা, তার রূপটা বদলে যায় মাত্র। পরিবর্তিত অবস্থায় তার তীব্রতা হয় আরো নির্মম, আরো মারাত্মক এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অবমাননাকর।

যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বিবাহ-সম্পর্ককে একমাত্র মাধ্যম বা উপায়রূপে গ্রহণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এর বাইরে কোথাও বিচরণকে সে সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যজ্য মনে করে। তাই হাজারো সম্মুখবর্তী সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে—পবিত্র রাখে। কোনক্রমেই সে এ হারাম কাজে নিজেকে কলঙ্কিত ও পথভ্রষ্ট হতে দেয়না। তার মন তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা স্বামীতেই পরিতৃপ্ত। ভিন্ন মেয়ে বা পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানোকেও সে ঘৃণা করে। সব মেয়ের ইজ্জত-আব্রুই তার নিকট সম্মানার্হ ও সংরক্ষিতব্য। স্বামী ছাড়া সব পুরুষই তার নিকট হারাম ও পরিত্যজ্য।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের নিকট বিবাহের বিশেষ কোন দাম, গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নিজের স্ত্রী বা স্বামী কিংবা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন শর্ত নেই। পরস্ত্রী,পরপুরুষ, রক্ষিতা, বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু অথবা স্ত্রীর বান্ধবী ও পুরুষ বন্ধু এসবকে নিজ স্ত্রী বা স্বামীর মত বিবেচনা করতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা-শরমের অবকাশ নেই।

এজন্যেই পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অবিবাহিত যুবকদের মেয়ে-বন্ধু ও অবিবাহিতা মেয়েদের পুরুষ-বন্ধু একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে

www.amarboi.org

অবৈধ সন্তানের সংখ্যা যেন ক্রমশ অংকের হিসাবকেও হার মানতে বাধ্য করেছে[১]। এ সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের যৌন ক্ষুধা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে এবং তা যেকোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানার অধিকার রাখে; উভয়পক্ষের রাজী হওয়াটাই কেবল সেখানে একমাত্র শর্ত। এ ক্ষুধা এতো ব্যাপক ও প্রবল যে, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাই যেন তার নির্বাধ পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজনে নিয়োজিত। তাই যুবক-যুবতী বা নারী-পুরুষের একক ও যুগল সঙ্গীত-নৃত্য সে সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ।

ইসলামী সংস্কৃতি সার্বিকভাবে এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ভাবধারার উদ্বোধক। কেননা পরিচ্ছন্ন ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। তাই যেসব কাজ, অনুষ্ঠান ও ভাবধারা এরূপ মানুষ গড়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। ইসলাম মানুষকে সংস্কৃতির প্রবহমান নদী থেকে স্বচ্ছ পানি সন্ধান করে তুলে নিতে বলছে, অন্ধের ন্যায় ময়লা, আবর্জনা ও কাদাযুক্ত বা বিষাক্ত পানি খেতে বলেনি।

পূর্বেই বলেছি, সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং সেজন্যে রীতিমত নামায পড়া, কেবল পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সব কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং নিছক বৈষয়িক আনন্দ বা তৃপ্তি-সুখ লাভের জন্যে কোন কাজ না করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা। একারণে ইসলামী সমাজে মসজিদ হল প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্র—রঙ্গালয় বা নৈশ ক্লাব নয়। ইসলামী সংস্কৃতির ধারকরা দিন-রাত পাঁচবার এখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে দাঁড়ায়, কুরআন পাঠ করে এবং রুকূ ও সিজদায় সম্পূর্ণরূপে অবনমিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিরই এক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। বছরের এক মাসকাল রোযা পালন ও দুটি ঈদের নামায ও উৎসব পালন মুসলিম সমাজের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বস্তুত আল্লাহ্‌র সামনে সমষ্টিগতভাবে অবনমিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক রূপ।

বিয়ে-শাদীর উৎসব, সন্তানের নামকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, খাদ্য-পানীয় বাছাই, পরীক্ষিত বন্ধু ও আত্মীয় গ্রহণ, রুজি-রোজগারের জন্যে পেশা গ্রহণ, দিন-রাত্রির জীবন অতিবাহন—এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক; কেননা তার ব্যাপক প্রভাব থেকে এর একটিও মুক্ত থাকতে পারে না। এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ভাস্বর হয় ওঠে। আর এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই এ বিশাল মানব-সমুদ্রের মাঝে এক বিশিষ্ট মানব সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সূর্যের মতই দেদীপ্যমান এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

---

১. পাশ্চাত্যের কোন কোন 'উন্নত' ও 'সুসভ্য' দেশে প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে তিনটিই অবৈধভাবে জন্মলাভ করছে। আর এটাও ঘটছে জন্মনিরোধের জন্যে সর্বপ্রকার নিরাপদ(?) ব্যবস্থা গ্রহণের পর।—সম্পাদক

www.amarboi.org

তবে কি ইসলামী সংস্কৃতি কেবল নিরস ও শুষ্ক উপকরণ দিয়ে গড়া? অথচ সংস্কৃতিতে রসের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। রসই যদি না থাকল তা হলে আর সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতি হলেও তা দিয়ে আমাদের কি লাভ?

সংস্কৃতি 'রস-ঘন' হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু রসের তো বিশেষ কোন রূপ নেই। রস আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি যেখানে রসের সন্ধান পাবে, অন্যের কাছেও তা-ই যে রসের আকর হবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় কি? এক জনের কাছে যা রস, অন্যের নিকট তা বিরসও তো হতে পারে। আসল জিনিস হল মনের তৃপ্তি। যেখানে যার তৃপ্তি, তা-ই তাকে অফুরন্ত রসের যোগান দেয়। এক ব্যক্তি যে সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাতেই সে তৃপ্তি পায়, স্বাদ পায়—পায় আনন্দ ও অমৃত-রসের সন্ধান। ইসলামী সংস্কৃতিতে এ তৃপ্তি, এ স্বাদ, আনন্দ ও রস সৃষ্টি করে আল্লাহ্র যিক্র। তাই কুরআন মজীদ বলেছে:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –

জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণই মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তিময় করে তোলে। (সূরা রা'দ : ২৮)

মনের তৃপ্তিই যদি কাম্য হয়, লক্ষ্য হয় যদি চিত্তবিনোদন, তা হলে ইসলামী সংস্কৃতিতে রয়েছে তার অপূর্ব সমাবেশ। তবে পার্থক্য হল এই যে, কেউ কাঁচা গোশত খেতে পসন্দ করে, কেউ ভালবাসে প্রচুর মসলা সহযোগে পরিপাটী রূপে রান্না করা গোশত খেতে। আবার এমন খাদকেরও অভাব নেই এ দুনিয়ায়, যারা পচা-গলা ও পূঁতিগন্ধময় গোশতকেও পরম তৃপ্তিদায়ক ও রুচিকর খাদ্য বলে মনে করে এবং তা খাওয়ার সময় স্ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাতেও লজ্জাবোধ করে না।

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাতে যেমন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের অবকাশ নেই, তেমনি নেই সংকোচন ও মাত্রা হ্রাসকরণের সুযোগ। শরী'আতের দৃষ্টিতে যা বৈধ, তাকে অবৈধ কিংবা কোন অবৈধকে বৈধ করার ক্ষমতা বা অধিকার কাউকেই দেয়া হয়নি। ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ভারসাম্যপূর্ণ। কোন দিকের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন দ্বারা সে ভারসাম্য বিনষ্ট করা সম্ভব নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সুনির্দিষ্ট আইন-বিধি ও ব্যবস্থাধীন লক্ষ্যানুগ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে জীবনের লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ, ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই সফল জীবন। সে জীবনে খোদার নাফরমানী বা সীমালংঘনের একবিন্দু স্থান নেই। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন স্থবির, নিষ্ক্রিয় বা অথর্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জীবনই সক্রিয়, গতিশীল ও কর্ম-কোলাহলে মুখরিত। এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়। এরূপ জীবন যাপন যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। এ জীবন বৈরাগ্যবাদী নয়; কেননা দুনিয়াত্যাগী জীবন কোন মাপকাঠিতেই মানবীয় নয়; দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী ও উপাদান-উপকরণ যথাযথভাবে ভোগ-ব্যবহার এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সব কিছু কুরবানী করাই ইসলামের লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক জীবনের স্বল্প ও সীমিত মুহূর্তগুলোকে অর্থহীন আরাম-আয়েস বা প্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করা জীবনের চরম অবমাননা এবং এটাই হচ্ছে জীবনের চরম ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। ইসলামে হালাল খাদ্য গ্রহণে, হালাল পানীয় পান করায় এবং হালাল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়নি। এখানে নিষিদ্ধ হল মাত্রাতিরিক্ততা, অপব্যয়-অপচয়, অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ। কেননা এর ফলে মানব মনে অসুস্থ ভাবধারা ছাড়াও পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এক কথায়, ইসলাম মানুষের বৈষয়িক জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন উত্তম পন্থায় ও যথার্থ ভারসাম্য সহকারে পরিপূরণে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবনে একবিন্দু বিপর্যয় সূচিত হোক তা বরদাশত করতে ইসলাম প্রস্তুত নয়।

মানুষ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জীবিত থাকুক, ইসলাম এটাই দেখতে চায়। তার জীবনের একটা মুহূর্তও উদ্দেশ্যহীন কাজে অপচয় হোক, তা ইসলামের কাম্য নয় আদৌ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে, নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা

www.amarboi.org

মানুষের জীবনের সব রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে সেখানে সৃষ্টি করে রুঢ়তা ও রুক্ষতা। তাই চিত্তবিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অপরিহার্য। কাজের মাঝে চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে জীবনটাই একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবেই। তখন জীবনের সব মাধুর্য, হাস্য-রস, আনন্দ-স্ফূর্তি তেলহীন প্রদীপের মতই নিঃশেষ হয়ে যায় অনিবার্য পরিণতিতে। তাছাড়া কর্মের গভীর চিন্তায় নিরন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে কর্মশক্তির অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাই বাস্তব জীবনের দুর্বহ বোঝা সঠিকভাবে বহন করে চলার জন্যে মনকে সব সময় সতেজ, সক্রিয় ও উদ্যমশীল রাখা আবশ্যক। আর তার জন্যে আনন্দ স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নানা উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। আনন্দ-স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার দরুন মানব মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর। এর ফলে জীবনের প্রতি জাগে অপরিসীম কৌতূহল, মমত্ববোধ এবং তদ্দরুন মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে বিশেষ উদ্যমশীল হয়ে উঠতে পারে কিংবা অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও জীবনের নানাবিধ দুঃখ চিন্তা ও মর্মবেদনা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে, মনের দুঃসহ বেদনা অনেকখানি হালকা করতেও সক্ষম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, মানব জীবন নানা দুঃখ-বেদনা ও আনন্দের সমষ্টি মাত্র। ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে কখনো দেয় দুঃখ আর কখনো দেয় আনন্দ। এই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা। একারণে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা যদি মানুষের মনের ওপর বেশীক্ষণ চেপে বসে থাকে, তাহলে তা মনস্তত্ত্ব নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারে। পক্ষান্তরে আনন্দের এক পশলা হালকা বারিপাত লোকদের মানস-প্রান্তরে রচনা করতে পারে ফুল ও ফল-ভরা গুল-বাগিচা। বস্তুত হর্ষোৎফুল্ল মনের পক্ষে অধিক কর্মক্ষম হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আর তারই জন্যে মানুষের জীবনে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অতএব চিত্তবিনোদনও সংস্কৃতিরই এক অপরিহার্য দিক।

ইসলাম মূলগতভাবে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে নি; বরং নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-স্ফূর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যকে উপেক্ষা করতে ইসলাম রাজী হয়নি। মানুষ কেবল আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পসন্দ করেনি। কেননা তার ফলে মানুষ আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটা বহুলাংশেই আপেক্ষিক। কার চিত্ত কিসে বিনোদন করবে আর কিসে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে ব্যাপারে কোন স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসল লক্ষ্য

www.amarboi.org

হল চিত্তের বিনোদন। এখানে আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব আছে; কিন্তু তা মুখ্য নয়, গৌণ। চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু তার জন্যে ইদানিং যে সব অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণভাবে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়। কেননা চিত্তের বিনোদনের জন্যে তা-ই নয় একমাত্র উপায়। এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও চিত্তের বিনোদন সম্ভব। ইসলাম এ দৃষ্টিতেই চিত্তবিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান হিসেবে কেবল তা-ই সমর্থন করেছে যা নির্দোষ—যার পরিণাম ভাল ছাড়া মন্দ নয়, যাতে করে মানুষের নৈতিকতার পতন ঘটার পরিবর্তে উন্নতি সাধিত হয়, যার দ্বারা মনুষ্যত্বের সুমহান মর্যাদা রক্ষা পায়, যার ফলে মানুষ তার উন্নত মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে যায় না। এ ধরনের যা কিছু অনুষ্ঠান ও উপকরণ হতে পারে, তা-ই ইসলামে সমর্থিত এবং মানুষের পক্ষেও তা-ই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যা কিছু এর বিপরীত তাকে বর্জন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় এবং মানুষের পক্ষেও তা বর্জন করা কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে বর্তমানে চিত্তবিনোদন সামগ্রী বা মাধ্যম হিসেবে গৃহীত কতিপয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে।

সিনেমা, টেলিভিশন ও নাট্যাভিনয়

বর্তমান কালে সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে এক সস্তা চিত্তবিনোদন মাধ্যম রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সিনেমার মূল উপকরণ হল ফিল্ম। ফিল্ম বিদ্যুতের ন্যায়ই এক প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তি। কিন্তু এ নৈসর্গিক শক্তিকে বর্তমানে যে অন্যায় ও অশোভন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একটা শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম হিসেবে সিনেমা সম্পর্কে কিছু না বললেও ইদানিং সিনেমায় যা কিছু দেখানো হয় সে সম্পর্কে একথা পুরাপুরি প্রযোজ্য। ফিল্মকে বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা-বিবর্জিত দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে যে কাহিনী বা গল্প চিত্রায়িত হয়, তা অবৈধ ভালবাসা ও প্রণয়াসক্তির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি ও রোমান্টিক ঘটনা-পরম্পরার আবর্তনে উদ্বেলিত। তা দর্শকদের, বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের ওপর অত্যন্ত খারাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রূপালী পর্দায় আলো-ছায়ার বিচিত্র ও রহস্যময় খেলায় যা কিছু দেখানো হয়, হুবহু তারই প্রতিফলন ঘটে দর্শকদের চরিত্রে। যা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকেই ধরতে ছুঁতে ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে পাগল-পারা হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। এটা যে একান্তই স্বাভাবিক তাতে কারোর এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং কেউ এর বিপরীত মতও প্রকাশ করতে পারে বলে ধারণা করা যায় না[১]। এ ধরনের

---

১. আধুনিক টিভি নাটক, টেলিফিল্ম ও ভিডিও ক্যাসেট সম্পর্কেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার এসব অনুষ্ঠান বহুতর ক্ষেত্রে সিনেমার চেয়েও মারাত্মকভাবে দর্শক চিত্তের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। বিশেষত স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আকাশ-সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি এবং ইন্টারনেট প্রোগ্রামের দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এখন মানবীয় চরিত্র ও নৈতিকতার পক্ষে এক ভয়ংকর ঘাতকে পরিণত হয়েছে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করায় দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক যৌন উন্মাদনা ও দুর্দমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কাহিনীকে চিত্রায়িত করার জন্যে প্রথমেই নারী-পুরুষ তথা উদ্ভিন্ন-যৌবন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, নগ্নতা-উচ্ছৃংখলতা, অমুহাররম নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যায় ও অসভ্য সম্পর্ক স্থাপন, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গি এবং তার পরিণামে পাশবিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া অবধারিত। কেননা এসব উপাদান ছাড়া কোন 'রোমান্টিক' কাহিনীই চিত্রায়িত হতে পারেনা। শুধু তা-ই নয় এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করার দাবি তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর দাবি এদাবি পূরণ নাহলে সিনেমার দর্শকদের সংখ্যাও কমে যায়। যে সিনেমায় এদাবি পূরণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তাকে যে কোন অজুহাতে উপেক্ষা করা হয়। তাছাড়া দর্শকদের যৌন পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সিনেমায় নায়ক-নায়িকার আবেগ উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন ও চুম্বন—এমনকি (বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে) যৌন মিলনের বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করাও আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এসব অশ্লীল, গর্হিত ক্রিয়া কর্ম ইসলাম আদৌ সমর্থন করেনা; শুধু তা-ই নয়, কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিশীল মানুষই তা বরদাশত করতে পারেনা। এগুলো যে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা, তা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?

সিনেমা ও নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বারে বারে ও ঘনঘন নিজেদের ভূমিকা বদলাতে হয়। বহু রূপে রূপান্তরিত করতে হয় নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে—ব্যক্তি-চরিত্রকে আর তার ফলে তাদের চরিত্র নিজস্ব স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে। অতঃপর কেউ আর নিজস্ব কোন চারিত্রিক রূপ আছে বলে দাবি করতে পারেনা। এর ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্র পুরোপুরি বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যখন প্রতিটি মানুষকে তার আয়ুষ্কালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে দায়ী করেছেন এবং কোন মানুষকে তার ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে কুরবান করার নির্দেশ দেননি, তখন এ ধরনের কোন কাজ যে তাঁর নিকট পসন্দনীয় হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। অনেক ক্ষেত্রে সৎ লোককে অসৎ লোকের ভূমিকায় ও অসৎ লোককে সৎ লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় এবং নিজেকে অনুরূপ সাজসজ্জায় ভূষিত করে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। এর ফলে তাদের চরিত্রে এক ধরনের কৃত্রিম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে। এটা মানবতার পক্ষে খুবই মারাত্মক। কেননা এতে মহান স্রষ্টার স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও উপহাস করা হয়। একারণে ফিল্মের বর্তমান অন্যায় ব্যবহার বন্ধ করা ছাড়া মানবতার মর্যাদা রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

মূলত সিনেমা ও ফটোগ্রাফী গৃহীত হয় নিষ্প্রাণ প্লাষ্টিক ফিতার (Negative Film) ওপর। একে যদি ইতিবাচক শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সেটা করা হলে চলচ্চিত্র এমন একটা

www.amarboi.org

শক্তি হয়ে ওঠতে পারে, যার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষকে শুধু অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নই নয়, অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদেরকেও উচ্চতর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। বহু মানুষকে দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge) এবং নিত্য-নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি দিয়ে ধন্য করা যেতে পারে[১]। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে অন্যায় কিছু থাকেনা। এতেও হয়ত প্রাণীর ছবি পর্দায় ভেসে ওঠবে; কিন্তু তা দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর দর্পনে প্রতিফলিত ছবি যে নিষিদ্ধ নয় তা সকলেরই জানা কথা। তা সেই ছবি নয়, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ।

ছবি অঙ্কন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ

প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা প্রতিকৃতি (Statue) নির্মাণ ইসলামে নিষিদ্ধ । রাসূলের হাদীসে এসম্পর্কে কঠিন নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নিছক চিত্তবিনোদনের খাতিরে এ ধরনের কাজ করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি তোলা বা তার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ নয়[২]। তাতে দোষেরও কিছু নেই। এরূপ কাজে বরং ড্রয়িং ও প্রকৌশল বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। ইসলামে প্রতিমূর্তি নির্মাণ—বর্তমানে যাকে বলা হয় ভাস্কর্য—শুরু থেকেই নিষিদ্ধ এবং অন্যায় বলে চিহ্নিত। নবী ও রাসূলগণ এরূপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। মুসলিম জাতি প্রথম দিন থেকেই মূর্তিভাঙা জাতি নামে পরিচিত। কাজেই প্রতিমূর্তি নির্মাণ কোন মুসলমানের কাজ হতে পারেনা, আধুনিক শিল্পকলার দৃষ্টিতে তার যত বেশী মর্যাদাই স্বীকার করা হোক না-কেন। একটি মূর্তি-পূজক জাতির পক্ষেই এটা শোভা পায়। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ এজন্যে যে, এটা শিরকের উৎস আর শিরক ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ। যে সমাজে শিরক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামক ব্যধির মতোই এই রোগ সংক্রমিত হয় এবং সকলকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। এই কারণ অল্প সময়ের তরে বা শিল্প-কলার খাতিরেও এই কাজকে বরদাশত করা যেতে পারেনা। ইসলামী সমাজের আদর্শ পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির মূর্তি খামারের সব ক'টি মূর্তিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

---

১. সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে যে কত চমৎকারভাবে সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়, ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানী চলচ্চিত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমান। আল্লাহ্‌র দেয়া স্বভাবনিয়মকে কিছুমাত্র বিকৃত না করে এবং ইসলামী শরী'আতের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকেই ইসলামী ইরান তার চলচ্চিত্র শিল্পেও এক ইতিবাচক বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখছে।—সম্পাদক

২. অবশ্য আধুনিক কালের আলোক চিত্র ও ছবি অঙ্কনের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। ছবি অঙ্কনটা কৃত্রিম ও কাল্পনিক; কিন্তু আলোকচিত্র হচ্ছে একটি বস্তুর হুবহু স্থিরচিত্র। একালের পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াও বহুতরো নিরাপত্তামূলক কাজে আলোকচিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।—সম্পাদক

www.amarboi.org

আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরে অবস্থিত তিনশ' ষাটটি মূর্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করে ঘোষণা করেছিলেন ঃ جَـاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ।—সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অসত্য নির্মূল ও বিলীন হয়ে গেছে।

তাই মূর্তি নির্মাণের কাজ তওহীদ বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনরূপ গৌরবজনক কাজ হতে পারে না, কাল বিবর্তনে তার নাম যাই হোক-না কেন। প্রকৃতপক্ষে একাজ মানবতার ললাটে কলঙ্ক টিকামাত্র। আধুনিক Finearts (ললিতকলা)ও Sculpture (ভাস্কর্যবিদ্যা)-এ এইসব পঙ্কিল ভাবধারা পুরোমাত্রায় স্থান পেয়েছে। আসলে মূর্তি-পূজার প্রাচীনতম ভাবধারা আধুনিক যুগে ভাস্কর্য শিল্পের ছদ্মাবরণে শিরককেই সংস্থাপিত করতে চাচ্ছে। শিল্পকে এই শিরকী ভাবধারা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা ইসলামী সংস্কৃতিবানদের কর্তব্য।—

তাস, দাবাখেলা ও জুয়া

বর্তমানকালে তাস, দাবা খেলা ও জুয়ায় মত্ত হয়েও বহু মানুষ অবসর বিনোদন করে এবং এসব খেলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে। অনেকে এসব খেলায় মেতে গিয়ে আল্লাহ্র স্মরণ, পরকালের চেতনা ও শরী'আতের অনুসরণ, ঘর-সংসার ও যাবতীয় দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে থাকতে চাইছে। তাদের সামনে জীবনের কোন বৃহত্তর বা মহত্তর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। কোন প্রকার আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে জীবনের মহামূল্য মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেয়ার এই প্রয়াস মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। তাস ও দাবা খেলায় চিন্তাশক্তি সূক্ষ্মতা লাভ করে বলে দাবি করা হয়; কিন্তু একথা কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব। এতে বরং জীবনের মহামূল্য সময়ের অকারণ অপচয় ঘটে। যে জাতির বেশীরভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত সে জাতি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-সংকুল এই জগতে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। প্রতিযোগিতায় পরাজিত হওয়া ও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-পটভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণই হয় সে জাতির ললাট-লিখন। ইদানীং লটারীসহ নানা ধরনের জুয়াকে এদেশে সরকারীভাবেই উৎসাহিত করা হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুয়া খেলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে অর্থলুণ্ঠন কিংবা অসতর্কতার মধ্যে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে সর্বহারা হওয়ার একটা কার্যকর মাধ্যম। ইসলামে এ কারণেই সর্বপ্রকার জুয়া নিষিদ্ধ। বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ও অযোধ্যার মুসলিম রাজত্বের নির্মম পতন ঘটার মূলে এই জুয়া খেলা যে প্রধান কারণ তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য।

নাচ-গান ও বাদ্য-যন্ত্র

নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্য-যন্ত্রের সুর মূর্ছনা বর্তমান সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীরাই

www.amarboi.org

সাধারণত নাচ-গানের আসরে নামে। নৃত্যহীন সঙ্গীত অথবা নিঃশব্দ নৃত্য দুটিই বর্তমান কালের সংস্কৃতিচর্চার বিশেষ মাধ্যম। নৃত্য-সঙ্গীত মূলত ত্রয়ার্থবোধক। তাতে রয়েছে গীত, বাদ্য ও নৃত্য। এ তিনটির সমন্বয়েই নৃত্য-সঙ্গীত। স্বতন্ত্রভাবে নাচ ও গানের বিশ্লেষণ করা হলে এর আসল রূপটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গান মিষ্টি কণ্ঠের সুমার্জিত সুর-ঝঙ্কার। তার স্বভাবিক আকর্ষণ তার সুরের ও তালের মধ্যে নিহিত। বিশেষ মানে ও ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনির উত্থান-পতন লয় তথা ছন্দই হচ্ছে গান। শ্রোতৃবৃন্দ এ সুর-মূর্ছনায় মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যায়। তাদের কর্ণকুহরে যেন মধুবর্ষণ হয়। গানের এ সুর-তরঙ্গে থাকে এক প্রকারের মাদকতা। শ্রোতাকে তা মাতাল করে দেয়। অনেকে আবার গানের সুরেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত নয়। গান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—গলে গলে নিঃসৃত হচ্ছে যার কণ্ঠনালি দিয়ে এ মধুর সুর-ঝঙ্কার তার প্রতি—তার অবয়বের প্রতিই শ্রোতাদের আকর্ষণ সর্বাধিক[১]। কণ্ঠস্বর ও অবয়ব উভয়ই যদি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহলেই সোনায় সোহাগা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুটিই মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য বিষের মতো সংহারক। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায় আর নাচ মনুষ্যত্বকে করে পর্যুদস্ত। কেননা শুধু হাত-পা নাড়ানোই নৃত্য নয়। নাচের মুদ্রা প্রয়োগের সাথে সাথে দেহ যখন কথা কয়, তখনই নাচ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর নৃত্যের তালে তালে দেহ কথা বলে ওঠে তখন যখন অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে ক্ষুধাতুর দর্শকবৃন্দ তা ধরবার ও মন্থন করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে আর এই অবস্থাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয়। কেননা এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে যৌন মিলন পিয়াসার আস্বাদন। এতে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সে সংস্কৃতি পশুপালের, মানুষকুলের নয়। যুবক-যুবতীর যুগল বা দলবদ্ধ নৃত্য যৌন-কাতর চিত্তেরই বিনোদন করে। যে চিত্তে খোদার যিক্‌র নিহিত, তার কাছে এ বিনোদন শুধু বিরক্তিকরই নয়, অসহ্যও।

নৃত্য ও সঙ্গীতের এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি পৌত্তলিকদের দেব-মন্দিরে পূজার আরতি দানের আত্মনিবেদনে। তা যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়, তখন শ্রোতৃবৃন্দই হয় তার দেবতা এবং গান ও নৃত্যের মাধ্যমে যুবতী নারী শিল্পী তাদের নিকট করে আত্মনিবেদন। বিদেশী ও বিধর্মীদের প্রায় দু'শ বছরের গোলামীর যুগে এসব জিনিস মুসলিম সমাজে—বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেননা সেকালের শিক্ষা, সমাজ ও পরিবেশ থেকেই এর সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোক জন্মেছে যারা মনে করে সঙ্গীত, যুগল নৃত্য ও সহ-অভিনয়ে কোন দোষ নেই। ব্যক্তি চরিত্র ও আদর্শবাদের চরম বিপর্যয়ই যে এর একমাত্র কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

---

১. সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের ন্যায় তার রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি শ্রোতাদের এই আকর্ষণ সম্পর্কে খোদ শিল্পীও থাকে সচেতন। তাই সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সাথে নিজের দেহ প্রদর্শনের ব্যাপারেও শিল্পীকে অত্যন্ত সচেষ্ট দেখা যায়।—সম্পাদক

www.amarboi.org

নারী কণ্ঠের সুরেলা ঝংকার ভিন পুরুষের মাঝে যৌন স্পৃহার উদ্বেলিত তরঙ্গ মালার সৃষ্টি করে, সে কথা সবাই জানে—সবাই বুঝে। এ জন্যই নবী করীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

اَلْغِنَاءُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا –

'সঙ্গীত ব্যভিচারের তুলনায় অধিক মারাত্মক'।

কেননা গান-বাদ্য-নৃত্যের মাদকতা মানুষের মন-মগজকে সহজেই বিভ্রান্ত করে। তাতে জাগিয়ে দেয় এক ধরনের আবেশ-আসক্তি। যার অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক বন্ধনের শিথিলতা আর তারই পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি।[1]

কুরআন মজীদে সঙ্গীত—গান-বাজনা-নৃত্যকে لَهْوَ الْحَدِيْثِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হল এমন কথা, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফিল ও অসর্তক বানিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যারা এ জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন তারাই কুরআনের এ ঘোষণার যথার্থতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। সুসজ্জিত ও মনোরম দৃশ্য সমন্বিত রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় ডুবে রঙ-বেরঙের তরঙ্গের তালে তালে সুন্দরী যুবতী তথা উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী ও পুরুষ যখন কণ্ঠে কণ্ঠ ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও হাতে হাত ধরে এবং প্রয়োজনে বুকে বুক মিলিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে, তখন দর্শককুল যে সম্পূর্ণরূপে বিভোর, আত্মহারা ও দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলোপ ঘটে, সুস্থ অনুভূতিসম্পন্ন কোন মানুষই তা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ঘোষণাবলীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আসলে এগুলো হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, রুচিবোধ ও নৈতিকতা ধ্বংস করার এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। সত্যিকার ঈমান ও বলিষ্ঠ ইসলামী চরিত্র দিয়েই এ ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন করা যেতে পারে, অন্য কিছু দিয়ে নয়।

মনে রাখা আবশ্যক, এখানে যা কিছু বলা হল, তা আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য উন্মুক্ত মঞ্চস্থ নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে, ... একান্তভাবে মেয়েদের পরিবেশে কেবল মেয়েরাই এবং পুরুষদের মজলিসে কেবল পুরুষরাই কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই যদি ভাল অর্থপূর্ণ গান গায় এবং তাতে নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তাতে উপরোক্ত দোষত্রুটি থাকেনা বলেই তা নিষিদ্ধ নয়—দোষণীয় নয় যদি ছোট ছোট মেয়েরা শৈশবকালীন খেলা-তামাশায় মেতে গিয়ে

১. অনেক ক্ষেত্রেই এ 'পরিতৃপ্তি' সহজে অর্জিত হয় না বলে তা লোকদেরকে নারী ধর্ষনসহ নানা গুরুত্বর অপরাধের জন্যে প্ররোচিত করে। এমনকি, অনেক হত্যাকাণ্ডেরও পিছনে কাজ করে এই অতৃপ্ত আকাংক্ষা।—সম্পাদক

www.amarboi.org

নিজস্বভাবে তেমন কিছু করে। নবী করীম (স) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এ ধরনের জাঁক-জমকহীন অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেন নি—নিষেধ করেননি উষ্ট্র চালকের একক মরু সঙ্গীতকে। তাই নিষিদ্ধ নয় মাঝির নিরহঙ্কার ও বাদ্যযন্ত্রহীন ভাটিয়ালী সুরের গান, চাষীর আবেগ-বিধুর কণ্ঠের চৈতালী সুর।

পূর্বেই বলেছি, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খোঁজ করলে জানতে পারা যাবে যে, নৃত্য-সঙ্গীত—তথা গান ও নাচ সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আদিম কালের দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় ও তাদের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের অনুষ্ঠানে। ভজন নৃত্যের তালে তালে দেবতার সামনে আত্মসমর্পন হিন্দুদের পূজা-অর্চনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। খৃষ্টানদের অর্কেস্ট্রা (Orchestra) তাদের শিরক-পঙ্কিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামান্তর। ইসলামে তা অনিবার্য কারণেই নিষিদ্ধ। যদিও মিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে কুরআন মজীদ পাঠ শুধু জায়েজই নয়, প্রশংসনীয়ও; কিন্তু তার সাথে সঙ্গীতের তাল-লয় ও সমবেত সুরের সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হারাম।

সুরাপান

সুরাপান কুরআনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট হারাম এবং তা মারাত্মক অপরাধ—কবীরা গুনাহ। কিন্তু চরিত্রহীন লোকেরা নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সুরা পান করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন-মগজে গুনাহর অনুভূতিটুকুও জাগেনা। বস্তুত সুরা হল সব রকমের অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতা ও অপরাধপ্রবণতার মৌল উৎস। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পান করা, পান করানো, তৈরী করা এবং বিক্রয় ও পরিবেশন করা অকাট্যভাবে হারাম। কেননা সূরা পানের ফলে পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। তার কাছে মা-বোন, ঔরসজাত কন্যা ও স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্যবোধ অবশিষ্ট থাকেনা। স্নায়ুবিক দিক দিয়ে উচ্ছ্বাস-বিজিত হয়ে যায়। ফলে জাতির চরিত্র, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়[১]। অনেকে সুরাকে একটা সাধারণ পানীয়ই মনে করে। এজন্যে এব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। এর মারাত্মক পরিণতির কথা তারা চিন্তা ও বিবেচনা করতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুরা একটা পানীয় বা নিছক চিত্তবিনোদন উপকরণ মাত্রই নয়। আসলে সুরা একটা সংস্কৃতি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ভিত্তি। এমন কি, তা একটা জীবন পদ্ধতিও এবং তা কোনক্রমেই ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেনা। সুরা পানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়

১. সুরা বা মদ হচ্ছে মাদক জাতীয় দ্রব্যের একটি প্রকরণ মাত্র। একালে বিভিন্ন নামে এর আরো অনেক প্রকরণ চালু হয়েছে, তার মধ্যে গাঁজা, চরস, হিরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানব জীবনে এগুলোর প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ। পবিত্র কুরআন 'খাম্‌র' শব্দ দ্বারা এর সবগুলো প্রকরণকে একত্রে 'শয়তানের কাজ' আখ্যায়িত করে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

বোধের বিলুপ্তি, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং সঙ্গে জড়িত থাকবে অপরাধপ্রবণতা, বিশেষত নরহত্যা বা রক্তপাত। তার ফলে গোটা সমাজ ও জাতিই চরম ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য।

বস্তুত মনের স্বস্তি-প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদভিত্তিক ও তদনুকূল অনুষ্ঠানাদিই তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যম। ইসলামী অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে খোদাভীতি, পরকালের জবাবদিহি এবং জীবনের প্রতিপদে, প্রতি ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।

www.amarboi.org

সংস্কৃতি ও নৈতিকতা

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবেও নৈতিকতার এই গুরুত্ব সর্বকালে ও সর্ব সমাজে স্বীকৃত। সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকই নৈতিকতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর দুনিয়ার তাবৎ ধর্মসমূহের ভিত্তিই রচিত হয়েছে এই নৈতিকতার ওপর এবং সে কারণে প্রত্যেক ধর্মই তার অনুসারীদের জন্যে অলংঘনীয় নৈতিক নিয়ম-বিধান পেশ করেছে। কেননা ধর্মের দৃষ্টিতে মানবজীবনের সাফল্য এই নৈতিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। উপরন্তু দুনিয়ার শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও সাচ্ছন্দ্য, প্রগতি ইত্যাদি নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও নৈতিকতা ছাড়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এটা অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। যে ব্যক্তি বা জাতি উত্তম ও নির্মল চরিত্রগুণে গুণান্বিত সে-ই সর্বপ্রকার কল্যাণ ও খোদায়ী রহমত ও বরকত লাভের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি তা থেকে বঞ্চিত তার পক্ষে কল্যাণ লাভ তো দূরের কথা, কালের ঘাত-প্রতিঘাতে টিকে থাকাই অসম্ভব; কেননা সামাজিক ও তামাদ্দুনিক শৃংখলা কেবলমাত্র উত্তম নৈতিকতার দরুনই সংরক্ষিত হতে পারে আর তা না থাকলে সে শৃংখলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে গোটা সমাজের উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের মূলে নিহিত আসল নিয়ামক হচ্ছে এই নৈতিকতা । তিনি লিখেছেন ঃ

> 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতি, বংশ-গোষ্ঠী বা দলকে দেশ-নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব দিয়ে মহিমান্বিত করতে চান, তখন সর্বপ্রথম তার নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেন আর তারপরই এই মর্যাদা তাকে দান করেন। অনুরূপভাবে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা দলের হাত থেকে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যদি কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত করেন, তাহলে পূর্বেই তাকে চরিত্রহীনতা ও দুরাচারে উদ্বুদ্ধ করে দেন। তার মধ্যে এনে দেন সব রকমের দুষ্কৃতি, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা আর অন্যায় ও খারাপের পথে তাকে বানিয়ে দেন দ্রুত অগ্রসরমান। এরই ফলে সে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার শাসন-দণ্ড শক্তিহীন হয়ে ক্রমশ তার হস্তচ্যুত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আসল শাসন ক্ষমতাই তার হাত থেকে চলে যায় আর তার স্থানে অন্যরা ক্ষমতাসীন হয়ে বসে (মুকাদ্দমা)।'

www.amarboi.org

দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনে সাফল্য লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষ কেবল মাত্র দুটি জিনিসের সাহায্যেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। একটি হল আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান আর দ্বিতীয়টি হল সদাচার ও শুভ কর্ম। অন্যকথায়, জীবন ও জগত সংক্রান্ত মৌলনীতি ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি অবিচল প্রত্যয়েরই অপর নাম ঈমান আর তদনুযায়ী বাস্তব কাজই হল শুভ কর্ম, সদাচার বা নেক আমল। জীবনের সাফল্যের জন্যে এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। ইসলাম মানুষের মুক্তি এ দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল করে দিয়ে এ তত্ত্বেরই বাস্তবায়ন চেয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি অবিচ্ছেদ্য—ওতপ্রোত জড়িত। তবে ঈমান হল ভিত্তি আর নেক আমল হল তার ওপর গড়ে ওঠা প্রাসাদ। ঈমান হল বীজ আর নেক আমল হল সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বিরাট মহীরুহ। 'নেক আমল' এক বিরাট ও বিশাল তাৎপর্যমণ্ডিত বিশেষ পরিভাষা। মানব জীবনের সব রকমের কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও একে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। একটি ভাগের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর অপর ভাগটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে। প্রথমটির প্রচলিত নাম 'ইবাদত' আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় 'মুআমিলাত'। দ্বিতীয়টিকেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার কতকগুলো হচ্ছে মানবীয় কর্তব্য বিশেষ, যাকে বলা হয় আখলাক বা নৈতিকতা আর অন্যগুলো আইনগত দায়িত্ব পর্যায়ের। সাধারণত একেই বলা হয় মু'আমিলাত।

এই ইবাদাত ও নৈতিকতার সমন্বয়েই ইসলামী জীবন বিধান গঠিত। এ দুটি বিষয় ইসলামী জীবন বিধানের দুটি বাহু বিশেষ। তাই এর কোনটিরই গুরুত্বকে কিছুমাত্র হাল্‌কা করে দেখা যেতে পারে না। নিছক ইবাদত মানুষকে পূর্ণ মুসলমান বানাতে পারে না যেমন, তেমনি এককভাবে শুধু নৈতিকতাও তা সম্পাদন করতে অক্ষম। কুরআন মজীদ এ সত্যকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাতে যেখানেই ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে শুভ কর্ম ও সদাচার তথা নৈতিকতা অবলম্বনের কথা—বলা হয়েছে সমান গুরুত্ব সহকারে। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি লক্ষ্যনীয়

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমান আন, রুকূ দাও, সিজদা করো এবং তোমাদের রব্ব-এর দাসত্ব ও বন্দেগী করো আর যাবতীয় ভালো ভালো কাজ সুসম্পন্ন কর; তা হলেই তোমাদের কল্যাণ লাভ সম্ভব। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৭)

বিশ্বনবীর এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে নৈতিক বিধান, কর্মনীতি ও আদর্শবাদিতা শিক্ষা দেয়া এবং এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরী করা, চরিত্রবান মানুষকে খোদানুগত—খোদার বন্ধু বানিয়ে দেয়া। নবী

www.amarboi.org

করীম (স)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ -

সেই মহান আল্লাহ্ই নিরক্ষর লোকদের ভেতর তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন। সে রাসূল তাদের সামনে আল্লাহ্র নিদর্শন ও বাণীসমূহ তুলে ধরবে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা দিবে। (সূরা জুম'আ : ২)

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এখানে 'হিকমত' শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা নৈতিকতা। ইসলামে চরিত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াত থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

সূরা আহযাবে বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। (আয়াত : ২১)

সূরা ক্বালামে বলা হয়েছে :

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

নিশ্চয় তুমি চরিত্রের অতীব উচ্চ মানে অভিষিক্ত। (৪ আয়াত)

এ আয়াতে খোদ রাসূলে করীম (স)-কে বিশ্ব-মানবের জন্যে আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তিরূপে পেশ করা হয়েছে।

স্বয়ং রাসূলে করীম (স)ও ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ

অতীব সুন্দর ও নির্মল চরিত্রকে পূর্ণ পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

উত্তম গুণাবলীকে পূর্ণত্ব দানের উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।

রাসূলে করীম (স)-এর এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে ইসলাম আর দ্বীন-ইসলামের সমগ্র বিষয়ই হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উৎস।

www.amarboi.org

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর আরও কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

১. তোমাদের মাঝে ঈমানের বিচারে পূর্ণ মুমিন সে, চরিত্রের বিচারে তোমাদের মাঝে যে উত্তম ব্যক্তি।

২. তোমাদের মাঝে সৎ সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের সকলের তুলনায় ভাল।

৩. কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাহর পাল্লায় উত্তম ও ভাল চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছু হবে না।

৪. জান্নাতের উচ্চ পর্যায়ে একখানি ঘর তাকে দেয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, যে নিজের চরিত্রকে উত্তম ও নিষ্কলুষ বানাবে।

৫. কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে আমার প্রিয়তর ও নিকটতর হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। আর আমার অপসন্দনীয় ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে অনেক দূরবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে খারাপ চরিত্রের অধিকারী।

৬. একবার নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ জান্নাতে কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রবেশ করবে? জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।

৭. আমানত রক্ষাকারী ও সত্যনিষ্ঠ মুসলমান কিয়ামতের দিন শহীদদের সঙ্গী হবে।

৮. মানুষ উত্তম চরিত্রগুণে এমন মর্যাদা লাভ করতে পারে যা সারাদিন রোযা রেখে ও সারা রাত ইবাদত করেই লাভ করতে পারে।

৯. উত্তম চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে দ্বীন।

১০. শুভ চরিত্র ইবাদতের অপূর্ণতা ও অপর্যাপ্ততার ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতার ক্ষতি ইবাদত দ্বারা পূরণ হয় না। মানুষ তার শুভ চরিত্রের বলে জান্নাতের উচ্চতর ও উন্নততম মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে, যদিও সে একজন 'আবেদ' নামে পরিচিত হয় না। আর নিজের চরিত্রহীনতার কারণে দোজখের সর্বনিম্ন অংশে পৌছে যায়, যদিও সে একজন ইবাদতকারী ব্যক্তি রূপে পরিচিত।

১১. প্রতিটি জিনিসেরই একটা ভিত্তি থাকে আর ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে শুভ চরিত্র। [ইবনে আব্বাস (রা)]

১২. লোকদের সাথে ভাল চরিত্র নিয়ে মেলামেশা কর এবং (খারাপ) কাজের দরুনই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হও। [হযরত উমার (রা)]

www.amarboi.org

১৩. চরিত্রের বিশালতা ও উদারতায়ই নিহিত রয়েছে জীবিকার সম্ভার।

১৪. চারটি জিনিস মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দেয়—যদিও তার আমল ও জ্ঞান-বিদ্যা কম আর তা হল ঃ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, বিনয়, দানশীলতা ও শুভ চরিত্র। (হযরত জুনাইদ বাগদাদী)

১৫. চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য মানুষের স্বভাবগত গুণাবলীকে পূর্ণ মাত্রায় উৎকর্ষ দান করে, লোকদের অন্তরে মমতা ও ভালবাসার বীজ বপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটতর করে দেয়। (ইমাম গাজ্জালী)

চরিত্র ও ঈমান

মুসলমান হওয়ার প্রথম ও মৌল শর্ত হল ঈমান। কিন্তু ঈমান মন-মানস ও হৃদয়-মনের একটা বিশেষ অবস্থা ও ভাবধারা এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত ব্যাপার। আল্লাহ্ ছাড়া তার অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে কেউই অবহিত হতে পারেনা। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা সৎ ও নিষ্কলংক চরিত্রকে মুমিনের ঈমানের মানদণ্ড রূপে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর মতে ইসলামে ঈমানের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়। মানব-মনে হীন, নীচ ও অসৎ ভাবধারা লালিত-পালিত হয় বিধায় তার ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়, যখন মানুষ দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে বসে। তখন সে কার্যত নিজেকে লোকদের মানসে উলঙ্গ করে দেয়। এরূপ অবস্থায় তার ঈমানের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সূরা 'আল-মুমিনূন'-এ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে ঈমানদার লোকদের জরুরী গুণপনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ দুটির ওপরই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ -
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِمُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ
-وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ -اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ
هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সেসব মুমিনরাই প্রকৃত সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হয়, যারা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন

www.amarboi.org

কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যারা নিরন্তর নিজেদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ প্রচেষ্টায় নিরত থাকে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে (হারাম ব্যবহার থেকে) রক্ষা করে, যারা তাদের আমানতসমূহ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে আর যারা নিজেদের নামাযসমূহকে সংরক্ষণ করতে থাকে.......। (সূরা মুমিনূন ঃ ১ থেকে ৯)

স্বয়ং নবী করীম (স) বহু সংখ্যক হাদীসে বহু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ঈমানদার লোকদের অপরিহার্য বিশেষত্ব রূপে গণ্য করেছেন। সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, ঈমানের অবস্থায়ও সেই অনুপাতে তারতম্য ঘটবে। তার অর্থ এই যে, আমাদের বাহ্যিক চরিত্র ও আচার-আচরণ আমাদের অন্তর্নিহিত ঈমানী অবস্থার মাপকাঠি বা পরিমাপ যন্ত্র। কোন লোকের ঈমানী অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কি তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

১. ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে লজ্জা।

২. ঈমানের বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তওহীদের ঘোষণা আর সবচাইতে কম গরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোকচলাচলের পথ থেকে পীড়াদায়ক জিনিসের অপসারণ।

৩. তিনটি কথা ঈমানের অংশ। দরিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারতা বিধান এবং স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

৪. মুসলমান সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে আর মুমিন সে যার ওপর এতটা বিশ্বাস ও আস্থা হবে যে তার নিকট নিজের জান ও মালও আমানত রূপে অক্ষুণ্ন থাকবে।

৫. মুমিন সে, যে অন্যকে ভালবাসে। যে লোক অন্যকে ভালবাসেনা এবং তাকেও কেউ ভালবাসে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

৬. মুমিন কারোর ওপর অভিশম্পাত করেনা, কাউকে বদদো'আ দেয় না, কাউকে গালাগাল করেনা এবং কারোর সাথে মুখ খারাপও করেনা।

৭. মুমিন সে, যাকে লোকেরা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসভাজন মনে করবে। মুসলিম সে যার মুখ ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকবে।

৮. তিনটি জিনিস দ্বারাই বেঈমান ও মুনাফিকের পরিচিতি পাওয়া যায়। তাহল, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা বিনষ্ট করবে।

৯. নকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যাকে লোকেরা তার খারাপ মুখের দরুন পরিত্যাগ করেছে।

১০. মানুষকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে, তাতে উত্তম জিনিস হল সৎ বা শুভ চরিত্র।

www.amarboi.org

১১. ইসলামে অশ্লীল কথাবার্তা বলার কোন স্থান নেই। উত্তম মুসলমান সে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে অতীব উচ্চ মর্যাদাবান।

চরিত্র ও আল্লাহ্ প্রেম

ভালবাসা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার একটি মূল্যবান অবদান। বিশেষ করে আল্লাহ্র ভালবাসা একটি অতিবড় সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মহামূল্য সম্পদ অর্জনের উপায় কি?

যে সব উপায়ে এই মহামূল্য সম্পদ লাভ করা যেতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল শুভ চরিত্র। আর যেসব কারণে এই মহামূল্য সম্পদ অপহৃত হয় তন্মধ্যে চরিত্রহীনতা ও অসদাচরণ অন্যতম।

কুরআনের দৃষ্টিতে নিম্নোদ্ধৃত নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রেম ও ভালবাসা অর্জিত হতে পারে ঃ

১. দয়া ও অনুগ্রহ। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقره، المائده)

দয়া-অনুগ্রহকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন।

২. সুবিচার ও ন্যায়পরতা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (المائده، الحجرات)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার ও ইনসাফকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

৩. নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ (التوبه)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্রতা রক্ষাকারী ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে ঃ

১. আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন ঃ

اَنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (المائده)

আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

২। বিশ্বাসঘাতকতা ও আমানতে খিয়ানত করা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ (الانفال)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদেরকে ভালবাসেন না।

www.amarboi.org

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا (النساء)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না, যে বেশী খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ।

৩. বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করা ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (القصص)

অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

৪. উচ্ছৃংখলতা, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি করা ঃ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الانعام)

আল্লাহ বাড়াবাড়ি উচ্ছৃংখলতা ও অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।

৫. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ঃ

اَنَّ اللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (القمان)

কোন অহংকারী ও দাম্ভিক লোককে আল্লাহ ভালবাসেন না।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও চরিত্র

বস্তুত ইসলাম উত্তম ও শুভ চরিত্রের একটি অতীব উন্নত মান ও চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছে আর তাহল উত্তম শুভ চরিত্র। এটি মূলত খোদায়ী গুণাবলীর ছায়া এবং তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

حُسْنُ الْخُلْقِ خُلْقُ اللّٰهِ الْأَعْظَمَ

শুভ চরিত্র আসলে আল্লাহ তা'আলার মহান ও সুউচ্চ চরিত্রেরই প্রতিফলন মাত্র।

আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র তা-ই যা আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর প্রতিবিম্ব আর খারাপ চরিত্র বলতে আমরা বুঝি সেই সবকে, যা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিপন্থী। ইসলাম মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপায় রূপে নির্দিষ্ট করেছে চরিত্রকে। তার কারণ হল, চরিত্র খোদায়ী গুণাবলীর জ্যোতিমালা থেকে গৃহীত ও নিঃসৃত। এই গ্রহণ ও অর্জনে আমরা যতটা অগ্রগতি লাভ করব, আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই বেশী নিশ্চিত হবে এবং তার ধারাবাহিকতা থাকবে অব্যাহত।

www.amarboi.org

চরিত্র ও ইবাদত

ইসলামী আদর্শে গুরুত্বের দিক দিয়ে চরিত্রের স্থান যদিও তৃতীয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে জানতে পারা যাবে যে, ইবাদতসমূহ মূলত মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান বানাবারই উপায় মাত্র। মানুষ সত্যনিষ্ঠ, সততাবাদী ও নিষ্কলুষ চরিত্রগুণের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠুক, এক মহান নৈতিক গুণাবলী আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করুক, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দিক—ইবাদতসমূহের এই তো পরম ও চরম উদ্দেশ্য আর এরই অপর নাম হল চরিত্র।

বস্তুত মানব-মনের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটা কার্যকর মাধ্যম রূপেই ইবাদতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরই সহায়তায় মানুষ নিজের হৃদয়াবেগ ও কামনা-বাসনা সংযত করতে সক্ষম হতে পারে। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ও তাঁর সামনে মস্তক অবনত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে মন-মানস ও কামনা-বাসনার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছি। ইবাদতের সময় এই অনুভূতি না জাগলে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিমুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী মনে করলে ইবাদতের কোন সুভফল অর্জিত হতে পারে না। কেননা ইবাদতের মর্মই হল, মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মা'বুদ এবং আমরা একান্তভাবে তাঁরই দাসানুদাস। তাই তাঁর মুকাবিলায় আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে না। আমাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাংক্ষা ও প্রয়োজনাবলী আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক লক্ষ্যানুগ ও তারই অধীন। কুরআনের একটি আয়াতে নামায তরক করা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করার কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামনা-বাসনা-লালসার আনুগত্য ও অনুসরণ সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে ইবাদত ত্যাগ করলে। ইবাদত যথাযথ পালন করা হলে তা হতে পারে না।

সাধারণত লোকদের ধারণা হল, ঈমানের পরই নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ এই চারটি স্তম্ভের ওপরই ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত। নৈতিক চরিত্রের কোন গুরুত্ব এতে আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বকে কিছুমাত্র উপেক্ষা করেন নি। তাই যেখানেই কোন ইবাদত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উত্তম ও উন্নত চরিত্র গড়ে তোলা ও তার পূর্ণত্ব বিধানই মানুষের চরমতম লক্ষ্য। নামায ফরয হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায়, পাপাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে। রোযা ফরয করেই বলে দেয়া হয়েছে, তা মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতির সৃষ্টি করে। যাকাত বিত্তবানদেরকে মহানুভবতা ও সহৃদয়তার শিক্ষা দেয় এবং হজ্জও বিভিন্নভাবে মানুষের নৈতিক সংশোধন ও উৎকর্ষ বিধানের কাজ করে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

নামায সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ যার নামায তাকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামায তাকে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরও দূরে নিয়ে যায়।

রোযা সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রোযা রেখেও যে লোক মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করেনি, নিজের পানাহার সে বন্ধ রাখুক—তাতে খোদার কোন প্রয়োজনই নেই।

একটি হাদীসের কথা হল, মুমিন তার উত্তম ও শুভ চরিত্রের বলে (নফল) রোযাদার ও (নফল) নামাযীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।

যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, নিজের বংশ ও পরিবার-পরিজনের মৌল অধিকার যথাযথ আদায় না হওয়া পর্যন্ত কারোর ওপর তা ফরযই হয় না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্‌র ওপর নিজের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব করেন না, যতক্ষণ সে বান্দাহ্‌দের অধিকারসমূহ আদায় না করছে।

আল্লাহ হক্ব ও বান্দাহর হক্ব

ইবাদত ও চরিত্রকে যথাক্রমে আল্লাহ্‌র হক্ব ও বান্দাহর হক্ব বলে চিহ্নিত করা যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, লেনদেন ও আদান-প্রদানেরই অপর নাম চরিত্র। আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ফরয রূপে ধার্য কর্তব্য। একটু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, চরিত্রের গুরুত্ব ইবাদতের তুলনায়ও অনেক বেশী। শিরক ও কুফর একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপার। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র অধিকারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু মানুষের অধিকার অনাদায় থাকলে তা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ্ নিজে তা ক্ষমা করে দেবেন না; তা ক্ষমা করার অধিকার ঠিক সেই মানুষের হাতেই রাখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে দয়া-অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করা যায়, তাতো আর মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায় না। তাই নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ওপর (যে তার ভাই) জুলুম করেছে সেই জালিম (ভাই)-র কর্তব্য হল, এই দুনিয়ায়ই সেই মজলুম ভাইর নিকট থেকে জুলুমের ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অন্যথায় কিয়ামতে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে কারোর নিকট কোন টাকা-পয়সা (দিরহাম ও দীনার) থাকবে না—থাকবে শুধু আমল। জালিমের নেক আমলসমূহ মজলুম পেয়ে যাবে। নেক আমল না থাকলে মজলুমের পাপসমূহ জালিমের আমল-নামায় লিখে দেয়া হবে।

নৈতিক চরিত্র ও আইন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই তাকে বাস করতে হয়। সমাজ ছাড়া

www.amarboi.org

মানুষের জীবন অচল। বহু সংখ্যক মানুষ যখন একত্রে জীবন যাপন করে তখন তাদের মধ্যে কোন-না-কোন বিষয়ে মত-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়—নয় কিছুমাত্র অস্বাভাবিক। এই সমাজে একজনের অধিকার অপরজন কর্তৃক অপহৃত হওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। শক্তিশালী এখানে দুর্বলের ওপর অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করতে পারে—পারে তাকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করতে। ধনী নির্ধনের ওপর অন্যায় আচরণ ও শোষণ চালাতে পারে। এই সব কিছুর মুকাবিলা করে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের নিরাপত্তা দিয়ে শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণ সমাজ গঠন করা মানুষের সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য। এ জন্যে যে আইন ও বিধান রচিত হয়েছে, তার একটা অংশ নৈতিক এবং তা অনুসরণ করা বা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল; সেজন্য কাউকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যেতে পারে না। অবশ্য এমন কিছু নিয়ম-বিধি রচিত হয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য। এই নিয়ম-বিধিকেই পরিভাষায় বলা হয় আইন। এই আইন ও নৈতিকতার মূল লক্ষ্য যদিও এক ও অভিন্ন; কিন্তু তা লাভ করার পথ ভিন্ন ভিন্ন। এককভাবে এর কোনটিই প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়—সব ক'টি দিককে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। তাই এর একটির অসম্পূর্ণতা অন্যটির দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ করে। আইন অন্যায় ও পাপ কাজকে বন্ধ করতে পারে বটে; কিন্তু মানব মনে তার প্রতি ঘৃণা জাগাতে পারে না। ফলে আইনের বাঁধন যখনই শিথিল হবে বা আইন রক্ষাকারীরা চোখের আড়াল হবে, তখনই পাপ ও অন্যায় সংঘটিত হবে; তখন তা ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের সাহায্যে যে পাপ ও অন্যায় দূর হয়, তা স্থায়িত্ব লাভ করে। তার পুনরাবৃত্তি হয় না বললেই চলে। কেননা চরিত্র ও নৈতিকতা মানব মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রথমটির পাহারাদারী কখনো সার্বক্ষণিক হতে পারে না। সার্বক্ষণিক পাহারাদারী হতে পারে দ্বিতীয়টির; কেননা তা মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং তা-ই হতে পারে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী, প্রতিরোধকারী। উপরন্তু আইন শুধু মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের মন-মানস ও চিন্তা-বিশ্বাসের মর্মমূলে তার কোন ছায়াপাত ঘটেনা। কিন্তু চারিত্রিক প্রতিরোধের অবস্থান মানুষের অন্তরে। মানুষের মন-মানস ও হৃদয়-বৃত্তির সাথে তার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; বরং তার উৎসই হচ্ছে এই মান-মানস ও হৃদয়-বৃত্তি। তাই মানুষের হৃদয়-মন যতক্ষণ জাগ্রত ও সচেতন থাকে ততক্ষণ তার দ্বারা পাপ ও অন্যায় কাজ সম্ভব হতে পারে না।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, আইনের তুলনায় নৈতিকতাই অধিক গুরুত্বের অধিকারী। চরিত্র আসলে আইনেরই সংরক্ষক; বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আইনের ভিত্তিই হচ্ছে চরিত্র। একটি জাতির ও একটি সমাজের নৈতিক অবস্থারই দর্পন হচ্ছে আইন। যে জাতির চরিত্র উত্তম, তার আইন-কানুনও নমনীয়।

২০—

www.amarboi.org

আর জাতীয় চরিত্র যদি হয় খারাপ, তাহলে তার জন্যে কঠোর আইন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জনগণ যদি স্বতঃই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়, তাহলে রাষ্ট্র-সরকারকে কঠোর ও উৎপীড়ক আইন রচনা করতে কখনো বাধ্য হতে হবে না।

ইসলাম মানব প্রকৃতি ও মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে চরিত্র ও আইন উভয়কেই প্রয়োগ করেছে। যে সব অন্যায় ও পাপের প্রতিক্রিয়া অন্যদের প্রভাবিত করে কিংবা বলা যায়, যে সব অন্যায় ও পাপ সমগ্র সমাজ ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে আইনের অধীন নিয়ে নেয়া হয়েছে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও অন্যায় কাজের দোষারোপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে গণ্য। আর যে সব বিষয় ও ব্যাপার ব্যক্তির আত্মার সাথে সম্পর্কিত—যেমন মিথ্যা না বলা, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন, গরীবদের সাহায্য প্রভৃতি—এগুলোকে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপার বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা অতি সহজেই বলতে পারি যে, দ্বীন-ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রবর্তিত শরী'আত হচ্ছে আইন ও নৈতিক চরিত্রের সমন্বয়।

ইসলাম নৈতিকতাকে প্রতিটি ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছে—যদিও তার একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে—আর আইনকে অর্পণ করেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতে। আইনের ভিত্তির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তাকে সরিয়ে দিলে রাষ্ট্র-সংস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকবেনা, বরং থাকার সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যাবে। তাই সংস্কৃতির দোহাই পেড়ে বা সংস্কৃতির নামে চরিত্র বিনষ্টকারী কোন অনুষ্ঠানকেই বরদাশ্ত করা যেতে পারেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি মানব চরিত্রকে উন্নত ও নির্মল করবে। পক্ষান্তরে যে সংস্কৃতিই মানব চরিত্রকে বরবাদ করে তা সংস্কৃতি নয়—দুষ্কৃতি মাত্র।

www.amarboi.org

॥ বিমূর্ত শিল্প ও জাতীয় চরিত্র ॥

বর্তমান দুনিয়ায় এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট (Abstract art) বা বিমূর্ত শিল্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচলন লক্ষ্যণীয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এই শিল্পের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে একটি প্রশ্ন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে, এই এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট কি বাস্তবিকই আমাদের জনগণের রুচিসম্মত, আমাদের দ্বীনী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? তা কি বাস্তবিকই এখানকার জনগণের শিল্প? অথবা তা মূলত বাইরের জিনিস, আমাদের জনগণের ওপর তা বিশেষ উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং একটি মারাত্মক ধরনের ষড়যন্ত্র হিসেবেই এটিকে আমাদের সমাজে প্রচলিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে?

পরন্তু, তা যদি বিদেশ ও ভিন্নতর সমাজ থেকে নিয়ে এসে আমাদের সমাজে চালু করার একটা অপচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কারা-- কোন্ শ্রেণীর ও কোন্ মতাদর্শের লোকেরা তা করছে? এই বিষয়গুলো একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট অনুধাবনের জন্যে অবশ্য ওয়াসিলি কাণ্ডিনিস্কির সময়ের অধ্যয়ণ আবশ্যক। কেননা এই কাণ্ডিনিস্কিই আমেরিকায় আর্টের এই নবতর আন্দোলনকে সুপরিচিত ও সুসংগঠিত করেছেন। নিউইয়র্কে তিনিই একটি আর্ট মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন, যার নাম হচ্ছে 'দি মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্ট'। যারা মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতি (Psyco-politics)-এর ইতিহাসে অভিজ্ঞ, তারা ভালো করেই জানেন যে, এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর এই আন্দোলন সর্বপ্রথম রাশিয়ায় 'অক্টোবর বিপ্লবের' পর শুরু হয়েছিল। যান্ত্রিক মানুষের স্রষ্টা এ, কে, গুস্তাফ এবং তার অনুসারীরা এক ধরনের এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' উদ্ভাবন করেছিলেন, যাকে বলা হয় 'কনস্ট্রাকটিভ সিমবলিক রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট বা গঠনমূলক প্রতীকধর্মী প্রতিনিধিত্বশীল শিল্প। এ শিল্পকলা সম্পর্কে যাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে, তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, আজকের এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট মূলত রাশিয়ার প্রাথমিক বিপ্লবকালীন সময়ের আর্টের ফসল হিসেবেই অস্তিত্বলাভ করেছে। এ আর্টের মূলে যে তত্ত্ব নিহিত তা হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সিস্টেমের অভিন্নতা ও সংহতি চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্যে তাতে বিছিন্নতাবাদী ও সংহতি বিরোধী ভাবধারা ও উপকরণাদি প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে হবে। এই তথাকথিত গঠনমূলক নীতির অনুসারী আর্টের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রাচীন ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যমান ও সাংস্কৃতিক জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

www.amarboi.org

রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক কালে বলশেভিকবাদের দর্শন কয়েকটি দিক দিয়ে ব্যাপক হয়ে ওঠেছিল—যেমন মেকানিক, কাব্য ও সঙ্গীত, যান্ত্রিক থিয়েটার, যান্ত্রিক প্রতিমূর্তি নির্মাণ এবং সবশেষে যান্ত্রিক মানুষ। আর্টের এই বিভিন্ন মাধ্যমের (Media) লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। কান্ডিনিস্কী 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা'র সদস্য ছিলেন। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব দিয়ে তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। কান্ডিনিস্কী নিউইয়র্ক শহরে আধুনিক শিল্পের যাদুঘর 'মিউজিয়াম অফ মর্ডাণ আর্ট' স্থাপন করতে সাফল্য অর্জন করেন। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর সৌভাগ্যই বলতে হবে, হিটলার এই শিল্পের শিল্পীদেরকে এই সময় জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। এ বহিষ্কৃত শিল্পীরাই আমেরিকায় গিয়ে বসবাস গ্রহণ করলেন। ফলে আমেরিকা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লীলাভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। এভাবে এ আর্টের সাহয্যে আমেরিকান জনগণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় (Personality Fragmentation) সৃষ্টির বীজ বপনে সাফল্য লাভ করার পর স্বয়ং রাশিয়া এক্ষণে বাস্তববাদী শিল্পে (Realistic art) প্রত্যাবর্তন করেছে।

পূর্বেই বলেছি, এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ভাঙন ও বিপর্যস্তকরণ। যে সব উপায়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে বিশ্লিষ্টতা ও আকৃতিসমূহের বিকৃতি (Distortion), চিন্তার বিশৃঙ্খলা, নির্বীর্যতা। আর মূলত পরাজিত আত্মা ও ব্যর্থকাম মন-মানসিকতার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই চৈন্তিক অরাজকতা। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর পক্ষে যেসব সাহিত্যিক লেখনী চালনা করেছেন, তারাও এই চৈন্তিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতায় চরমভাবে আক্রান্ত। তাঁরা তাদের রচনাবলীতে এই বিপর্যয় ও বিশ্লিষ্টতাময় শব্দাবলী বাছাই (Fragmental Fregiology) ও ব্যবহার করে পাঠকদের মনে-মগজেও অনুরূপ বিপর্যয় ও বিশ্লিষ্টতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর একজন পূজারী জনৈক এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট সম্পর্কে লিখেছেন ঃ যে জিনিসটির ঝুলন্ত বা সাঁতার কাটা অবস্থায় থাকা আবশ্যক, তাকে কাঁচা হাতে ও কঠোরতার সাথে অবিকল রূপ দান করা এই এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট রীতিমত ঘৃণা করে। জিনিসগুলিকে তার আসল ও স্বাভাবিক রূপে উপস্থাপনকে সে অর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই সত্য অনুধাবনে অক্ষম হওয়ার কারণে বেশ কিছু লোক পলায়নী আচরণ অবলম্বন করেছে। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ঘৃণার। সে বড়জোর এই প্রতিক্রিয়াকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে; কিন্তু রুচিহীনতা বা বিকৃতরুচি লুকোতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হয়। নগরস্থ প্রখ্যাত ড্রয়িং-রুমসমূহের সাজ-সজ্জা-সামগ্রী পর্যায়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর উল্লেখ হলেই কোন কোন লোক ঘৃণায় নাক সিঁটকাতে শুরু করে এবং তাদের বিশ্বাসঘাতক ওষ্ঠে একটি কৃত্রিম বক্র হাসি খেলে যায়। কেউ কেউ আবার প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ লোকদের ন্যায় পূর্ণমাত্রার আস্থা সহকারে কথা বলে।

www.amarboi.org

এটা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ভক্তদের চিন্তার বৈসাদৃশ্য ও বিশ্লিষ্টতার একটা ক্ষুদ্র নিদর্শন মাত্র।

একটা বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন সব জনসংস্থা গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক—অনেক সময় তা অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে থাকে। কিছু লোক মানসিক পূর্ণতা ও সামাজিক পরিপক্কতা লাভ করতে পা না, এমনটা হয়ে থাকে। তার প্রমাণ হচ্ছে, যেসব লোকের কারণে তারা ক্ষুদ্রত্বের অ ভূতি বা হীনম্মন্যতা রোগে (Inferiority Complex) ভোগে তাদের প্রতি বিদ্রূপবান নি ক্ষপ করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লোকদের যখন দেখা যায়, বাইরের লোকদের সাফল্যের প্রশংসা করছে, কিন্তু নিজেদের সমাজের লোকদের স্মরণযোগ্য অবদানের মূল্যও স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে, তখন মনে দুঃখানুভূতি জেগে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।

একটি জাতি বা জনসমষ্টিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করার অনেকগুলো পন্থা থাকতে পারে। অনুরূপভাবে মানবীয় মন ও মগজকে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করার পন্থাও হতে পারে বহুবিধ। তবে মানব-মনকে পরাভূত করার আধুনিকতম পন্থা হচ্ছে, তাদের সম্মুখে এমন সব নিদর্শন পেশ করতে এবং তাদের চতুঃস্পার্শ্বে এমন পরিবেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে তারা বন্দী থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের গৌরব বোধ করতে পারে। বিগত শতাব্দীতে দেশবিজয়ী জাতিগুলো তাদের বিজিত জনগোষ্ঠীর ওপর যে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এ পন্থায় অবশ্য সে সবের আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না; বরং বর্তমান কালের বিজয়ীরা বিজিতদের সম্মুখে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ও দুর্বোধ্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের নিদর্শন পেশ করা ও তাতে তাদের মুগ্ধবিমোহিত করে তুলতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত কোন একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে নৈরাশ্য ও হতাশাগ্রস্থ করে দেয়ার জন্যে অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন ক্রিয়াকাণ্ডে মশগুল করে দেয়া একটা অত্যন্ত শানিত ও কার্যকর হাতিয়ার। অস্পষ্টতা ও লক্ষ্যহীনতাই এই কাজকে সার্থক ও সচল করে দিতে পারে। একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে মানসিক অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব বিশারদরা যে ক'টি সাংস্কৃতিক উপায়-উপাদান প্রয়োগ করে থাকে 'এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' তন্মধ্যে অন্যতম।

বঞ্চনার অনুভূতির তীব্রতা অনেক সময় ব্যক্তিত্বের বিশ্লিষ্টতায় প্রকট হয়ে ওঠে। অনুভূতির এ তীব্রতা অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও উদ্দেশ্যহীনতাকে খুঁজে নেয় আর এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর ভক্তদের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব এটাই। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট মানবীয় আচরণের এমন পন্থা ও বঞ্চনানুভূতি ও বিশ্লিষ্টতার এমন সব নিদর্শন উপস্থাপন করে, যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগ ও উচ্ছাস সব সুস্থতা ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লক্ষ্য কি? শিল্পী তার মাধ্যমে কি পয়গাম তুলে ধরে দর্শকদের

www.amarboi.org

নিকট? প্রভাব বিস্তারকারী শিল্পী (Impressionest) নানা রঙের ওপর আলোর বিচ্ছুরণ দেখায়। প্রকাশপন্থী (Expressionist) চেষ্টা চালায় বস্তু নিচয়ে অন্তর্নিহিত সত্যকে যতটা সম্ভব ব্যক্ত করে দিতে। আর ইঙ্গিতধর্মী চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির অনুসারী (কিউবিস্ট) বস্তুসমূহে জ্যামিতির মৌল রূপরেখার সন্ধান করে—মহাজাগতিক (সিওরিলিষ্ট) অবচেতনকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। একজন সমালোচক তো বলেই ফেলেছেন যে, এ্যাবস্ট্রাক্ট রেখাসমূহ আসলে অত্যন্ত পবিত্র এবং খোদায়ী গুণাবলীকে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করে। কেননা তা বস্তুগত খোলস, দেহের ভার ও মুখাবয়বের স্পষ্টতা ছাড়াই অস্তিত্ববান হয়েছে। আর বস্তুগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে অভিব্যক্ত না করেই সে সবের অন্তর্নিহিত ও অর্ধোস্ফুট কলিসমূহের দ্বারা বিশ্বপ্রাণ পর্যন্ত পৌঁছাবার চেষ্টার পরিণতি হচ্ছে সেই আর্ট, যাকে আমরা অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিকোণে ধর্মীয় বলতে পারি।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে আর্ট

ইসলামের দৃষ্টিতে আর্টের লক্ষ্য বুঝবার জন্যে দেখতে হবে তার নিকট জীবনের লক্ষ্য কি? কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা বিধান, যা সৃষ্টিধর্মী পথে মানবতার জন্যে কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণত্ব বিধানের একটি দিক হচ্ছে, সে লক্ষ্যে মানবীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসকে সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলীতে নিয়োগ করা।

বস্তুত সৃষ্টিধর্মী ও সৃজনশীল গুণাবলী বা যোগতাসমূহ মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ্‌র এক বিরাট নিয়ামত। আসলে তা মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ছায়া বিশেষ। সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলী চিরস্থায়িত্বের ধারক। আর প্রতিটি সৃষ্টিধর্মী কাজ মানবীয় ব্যক্তিত্ব নির্মাণ ও পুনর্গঠনের মৌল উপকরণ বিশেষ।

মানুষের স্বভাবগত সৃজনশীলতার গুণ স্বতঃই প্রমাণ করে যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের জন্যে সহমর্মিতার প্রবল ভাবধারার অধিকারী—একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও কল্পনার মালিক। বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার করা ও তার শান্তি ও স্থিতির ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য মানুষকে কল্যাণময় জ্ঞানের আলো দ্বারা সমুদ্ভাসিত করাই তার নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনা। এখানে 'কল্যাণময় জ্ঞান' এর কথাটি সচেতনভাবেই বলা হয়েছে; কেননা নবী করীম (স) দো'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমাকে 'অকল্যাণকর জ্ঞান' থেকে রক্ষা করো। আর 'অকল্যাণকর জ্ঞান' হচ্ছে তা-ই যা মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করে।

মানব প্রকৃতিতে নিহিত সৃষ্টিধর্মী গুণাবলী হারিয়ে ফেললে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মানুষ স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসার ধারক হয়ে বসেছে; ফলে কোন মানুষই অপর মানুষের একবিন্দু কল্যাণ সাধনেও কিছুমাত্র সক্ষম হবেনা। অথচ মানবতার কল্যাণ সাধনই

www.amarboi.org

হচ্ছে এমন একটা লক্ষ্য যা মানব মনে সুখানুভূতি লাভের বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ মানুষকে ব্যর্থতা ও বঞ্চনার দিকে পরিচালিত করে।

জীবন-লক্ষ্য সম্পর্কিত এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা দানকেই শিল্পের লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত করেছে ইসলাম। অতীব উত্তম মানের রূপরেখা তৈরী করে কলাশিল্প শিল্পব্যবসায়ের অনেক উৎকর্ষ সাধন করতে পারে এবং দেশের জনকল্যাণমূলক শিল্পায়ণে বিরাট অবদান রাখতেও সক্ষম। রেখাঙ্কনের মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, জীব-জন্তু, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট খেদমত করা যেতে পারে। কেননা এই পর্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দ ও ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে মূল বিষয়ের তত্ত্ব যতনা উদ্‌ঘাটন করা যায়, ছবি বা চিত্রের সাহায্যে তার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। নির্মাণশিল্প, বস্ত্রশিল্প, মৎসশিল্প, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শৈল্পিক উপকরণ, শিল্পসম্মত উপায়ে কাঁচা মাল থেকে নানা দ্রব্য উৎপাদন, কাপড়ের চিত্তাকর্ষক, উন্নত ও সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্য বিশিষ্ট রূপরেখা তৈরী করা—এই সব কাজ ভাষা বা শব্দের পরিবর্তে রেখাঙ্কনের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।[১]

বস্তুত শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাহ্যিক ও বাস্তব শিক্ষাদান। রৈখিক অভিব্যক্তির যতগুলো উপায় রয়েছে, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য. কাব্য-কবিতা, ধ্বনি-বাদ্য, প্রতিকৃতি নির্মাণ ও সঙ্গীত—এই সবই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতিরই প্রকাশ মাধ্যম। আর এ সবই শিল্পের আওতাভুক্ত। তা চেতনা, মেধা-প্রতিভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তির কার্যকরতার ওপর নির্ভরশীল। এ শিক্ষাকে বাদ দিলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার আশংকা প্রবল। সৌভাগ্যবশত এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে বেঁচে গেলেও চিন্তা ও কর্মের বিচারে অপরিপক্ক ও অপরিণত থেকে যাওয়া অবধারিত। ফলে একটা যান্ত্রিক জীবন প্রণালীর নির্বিকার অধীনতা ও দাসত্ব করে যাওয়া তার সারা জীবনের ভাগ্যলিপি হয়ে পড়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

শিল্প একটা আত্মিক সত্য; আত্মার সাথে তার সম্পর্ক নিবিড়, গভীর। তা ধর্মবিশ্বাসের রসে সিক্ত হয়ে বিশ্বমানবতাকে সেই সব যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে, যা আমাদের বর্তমান জীবনকে দুঃখজনকভাবে বেঁধে রেখেছে। শিল্প মানবাত্মার মুক্তির নিয়ামত হতে পারে যদি তাকে ইসলাম নির্ধারিত জীবন-লক্ষ্যের অনুকূলে প্রয়োগ করা হয়। আর তাহলেই এ শিল্প একটি কল্যাণকর মাধ্যম হতে পারে—পরিগণিত হতে

---

১. এ পর্যায়ে চারুকলার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। অধুনা আমাদের দেশে এই শিল্প-মাধ্যমটির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। একে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত না করে ব্যবহার করা হচ্ছে পৌত্তলিক সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে। ফলে এর পিছনে জাতীয় মেধা ও অর্থের ব্যবহার একটি বিরাট অপচয় রূপে প্রতিভাত হচ্ছে।—সম্পাদক

www.amarboi.org

পারে জনগণের শিল্পে। অন্যথায় তা-ই আবার মানব আত্মাকে নতুন করে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধতে পারে, যা থেকে মুক্তি লাভ চিরকালই অসম্ভব থেকে যাবে।

যাকিছু বাইরের তা-ই পরিত্যজ্য বা অগ্রহণযোগ্য, এই মনোভাব ছাড়াও একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মনের প্রশ্ন হচ্ছে, বাইরে থেকে যা আমদানী করা হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে তা আমাদের সমাজ-মানসের অনুকূল বা কল্যাণকর কিনা? বস্তুত শিল্প বাইরে থেকে আমদানী করা হোক কিংবা ঘরেই নির্মিত হোক, তা যদি আমাদের সুস্থ মানসিকতায় বিকৃতির বাহন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অত্যাধুনিকতার দোহাই পেড়ে তার প্রচলন করার অধিকার কারোরই থাকতে পারেনা। উদারতার নামে উদরে নিশ্চয়ই পচা আবর্জনা ভর্তি করা কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবেনা।

www.amarboi.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সূদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন)

খায়রুন প্রকাশনী ©